বাংলা গদ্যে বিনয় সরকারের অবদান

পরমা আঢ্য
এম.এ, বি.এড

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ
এম. এ, পি - এইচ. ডি

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি-এইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত
১৯৯৭

ST - VERF

Ref.
80.01
M4/3K.N

126684

10 AUG 1999

নিবেদন

জগদ্বিখ্যাত পন্ডিত, বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, অনন্য পরিব্রাজক, মালদহের ভূমিপুত্র আচার্য বিনয়কুমার সরকারের জন্মশতবর্ষে 'শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি' গঠন করা হয় মালদায়। মালদার শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রভাতফেরী আলোচনা চক্র, সভা-সমিতি, আবক্ষমূর্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মালদার টাউন হলে ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ, প্রফেসর অম্লান দত্ত, ডঃ স্বপন ভট্টাচার্য, শিবেন্দুশেখর রায়, আচার্যকন্যা সুইজারল্যান্ড প্রবাসী ডঃ ইন্দিরা পালিত প্রমুখের ভাষণে বিনয় সরকারের পান্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী অধ্যাপক বিনয় সরকারকে বিস্মরণ হতভাগ্য আত্মবিস্মৃত বাঙালীর দুরপনেয় কলঙ্ক।

সংস্কারমুক্ত খোলা দৃষ্টি, অকপট সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য ইত্যাদি সব গুণগুলিই অধ্যাপক সরকারের চরিত্রে সুস্পষ্ট। মালদার দামাল ছেলে, কট্টর বাঙালী, বিশ্ব-পথিক বিনয় সরকারকে কোন নির্দিষ্ট ফর্মুলার মাপে ব্যাখ্যা করা যায় না। উদার হৃদয়, উন্মুক্ত বিবেক নিয়ে তিনি চলিষ্ণু ছিলেন। সারা পৃথিবীতে এত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব প্রকৃত-অর্থে বিরল।

প্রত্যেক লেখক বা বক্তার কিছু নিজস্বতা থাকে। এই নিজস্ব ভঙ্গীর নামই হচ্ছে—style। বাচন ও লেখনভঙ্গীতে এই শব্দটির প্রসিদ্ধি। বিদ্যার মূর্তবিগ্রহ, অসামান্য ব্যক্তিত্ব বিনয় সরকারের নিজস্ব একটা ধারালো বাগ্‌ভঙ্গী ছিল। ৪২ বছর ধরে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এই সব গ্রন্থে তাঁর যে নিজস্ব গদ্যশৈলী গঠিত হয়েছিল—তাই আমার গবেষণার বিষয় বস্তু।

এই কাজে প্রধান প্রেরণাদাতা আমার গবেষণা-নির্দেশক (Guide) ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ। তাঁর কাছে যখন যেভাবে চেয়েছি, অকুণ্ঠ চিত্তে উদার হৃদয় নিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন।

বিনয় সরকারের স্নেহধন্য, অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বয়োবৃদ্ধতার কারণে রুগ্ন শরীরেও তাঁর এই বিষয়ে উৎসাহ-দানের কোন ঘাটতি ছিল না। তাঁর অমূল্য আলোচনা অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে আমার এই গবেষণা-কার্য। বিশেষ শ্রদ্ধা জানাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ স্বপন ভট্টাচার্য্যকে বহু তথ্যভিত্তিক উপদেশের জন্য।

যে সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা), চৈতন্য গ্রন্থাগার, কালীঘাট তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বহু দুষ্প্রাপ্য, অধুনা লুপ্তপ্রায় পুস্তকরাজি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরীয়ান ডঃ অরুণা চ্যাটার্জী। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই সেই কারিগরদের প্রতি যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুদৃশ্য রূপ এবং আকার পেয়েছে আমার এই গবেষণা-কার্য। তাঁরা হলেন Professional Computers ঃ Calcutta -700 006.

আমার সবিশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি—যাঁর নাম স্মরণে সর্বদাই অনুপ্রেরণা লাভ করেছি এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করার।

দু'চারটি মুদ্রন ত্রুটি রয়ে গেল। এ ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে বিদগ্ধ পরিক্ষকদের এই গবেষণা মনোজ্ঞ হলে, আমার দীর্ঘ নিরলস পরিশ্রম সার্থক হবে।

বিনীতা—

পরমা আঢ্য



আচার্য বিনয়কুমার সরকার

জন্ম ঃ মালদহ
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৭

প্রয়াণ ঃ ওয়াশিংটন ডি. সি.
২৪ শে নভেম্বর, ১৯৪৯

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
(১)	প্রস্তাবনা		ক - খ
(২)	প্রথম অধ্যায়—	বাংলা গদ্যের ইতিহাস ঃ প্রাক্-বিনয় সরকার পর্ব	১ - ১০
(৩)	দ্বিতীয় অধ্যায়—	(ক) বিনয় সরকারের জীবন ও জীবনী	১১ - ২৪
		(খ) রচনাবলীর তালিকা	২৫ - ৩৮
(৪)	তৃতীয় অধ্যায়—	রচনাবলীর শ্রেণীবিভাগ	৩৯ - ৫৯
(৫)	চতুর্থ অধ্যায়—	সাধু গদ্যের রূপ ঃ	
		(ক) শব্দ নির্বাচন ও ইডিয়ম ব্যবহার	৬০ - ৬৩
		(খ) অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ, প্রত্যয় ইত্যাদির বিশ্লেষণ।	৬৪ - ৭৪
		(গ) প্রসঙ্গানুযায়ী শব্দ ব্যবহার	৭৫ - ৭৯
(৬)	পঞ্চম অধ্যায়—	বিনয় সরকারী "ফ্রেজ"	৮০ - ৮৬
(৭)	ষষ্ঠ অধ্যায়—	বাক্যবিন্যাস ঃ সাহিত্যধর্মী, রচনাধর্মী, বৈঠকী মেজাজের	৮৭ - ৯১
(৮)	সপ্তম অধ্যায়—	বিনয় সরকারী ভাষায় Cumulative Sum Charts Method -এর ব্যবহার	৯২ - ১০৮
(৯)	অষ্টম অধ্যায়—	বিশেষণ ব্যবহারে দক্ষতা	১০৯ - ১১৪
(১০)	নবম অধ্যায়—	চলিত গদ্যের রূপ ঃ	
		(ক) শব্দার্থতত্ত্ব	১১৫ - ১১৭
		(খ) Diagram and Graph -এর সাহায্যে Style বিচার	১১৮ - ১২৯
		(গ) বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি—গুরুচন্ডালী সমর্থন	১৩০ - ১৪০
		(ঘ) কথ্য ভাষার বিশ্লেষণ	১৪১ - ১৫৬
(১১)	দশম অধ্যায়—	বিনয় সরকারী বিশিষ্ট শব্দচয়ন	১৫৭ - ১৬৭
(১২)	একাদশ অধ্যায়—	উত্তর-কাল	১৬৮ - ১৭৭
(১৩)	গ্রন্থপঞ্জী—	সহায়ক বাংলা এবং ইংরাজী গ্রন্থ-তালিকা	১৭৮ - ১৮২
(১৪)	সংযোজন—	বিনয় সরকারের কতিপয় গ্রন্থের 'টাইটেল' পৃষ্ঠার প্রতিলিপি	

প্রস্তাবনা

বাংলা গদ্যের বয়স প্রায় দু'শ বছর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন থেকে তার সূত্রপাত। যুক্তিশৃঙ্খলায়, কার্যকারণ পরম্পরায় নিয়ম-সংযমে বাঁধা শব্দচয়ন, পদবিন্যাস, রীতিপদ্ধতি মেনে চলে এমন গদ্যের পরিচয় উনিশ শতকের আগে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহনই প্রাক্-প্রত্যুষের সূচক। এঁরা বাংলা গদ্যের দৃঢ়তা সঞ্চারের জন্য সংস্কৃত-শব্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরেও যাঁরা বাংলা গদ্যনির্মাণে অগ্রণী হয়েছেন তাঁরা সকলেই অর্থাৎ অক্ষয়, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম তৎসম-তদ্ভব শব্দ, সন্ধি-সমাস, কৃৎ-তদ্ধিৎ-শতৃ-শানচ প্রত্যয় ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যও এর প্রভাবমুক্ত নয়। তবে তাঁর ষাট বৎসরের বেশী সাহিত্যিক জীবনে সাধু গদ্যরীতিও ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছিল। এই সময় দেশী ও লৌকিক শব্দের ব্যবহার তাঁর গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর তিনি পাকাপাকিভাবে চলিতরীতি গ্রহণ করেন। চলিত ভাষার সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা—কথ্য ভাষা থেকে দূরে সরে গিয়ে কৃত্রিম অ-সাধু ভাষা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই চলিত গদ্য প্রমথ চৌধুরীর এক দশক আগে স্বামী বিবেকানন্দের হাতে অন্যভাবে এসেছিল। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই চলিত গদ্যের প্রকৃতি— প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ স্বামী বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষ দশকে গ্রহণ করেছিলেন, বিনয় সরকারের গদ্যরীতি তারও পরবর্তী ধাপ। কিন্তু গদ্যসাহিত্যের এই প্রবাহে বিনয় সরকার উপেক্ষিত।

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বিনয় সরকার জগদ্বিখ্যাত। মৌলিক গবেষণা তাঁর পর্বতপ্রমাণ। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে তাঁর অসংখ্য পুস্তক ব্যতীত ফরাসী, জার্মানী ও ইতালীয় ভাষাতেও তাঁর রচনার সংখ্যা ছত্রিশ। বিদ্যার খুব কম বিভাগই আছে, যা তিনি গভীর ভাবে অনুশীলন করেননি। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, ভাষাশিক্ষা, শিক্ষাবিজ্ঞান, ভ্রমণ সাহিত্য, অপরাধ বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, ধর্ম, জীবনী, লোকসংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে অনুধ্যানের প্রতিফলন তাঁর অসংখ্য রচনাবলী। বহুধাবিস্তৃত তাঁর পান্ডিত্যে পাশ্চাত্যের সুধীবৃন্দও মুগ্ধ।

বর্তমান আলোচনা ও গবেষণার সাধ্য ও পরিসর কেবলমাত্র বিনয় সরকারের (কুমার শব্দটি তিনি নিজে পরিত্যাগ করায় আগ্রহী) বাংলা ভাষায় রচনা-প্রসঙ্গ। তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত রচনাবলীর পৃষ্ঠা সংখ্যাই পনের হাজার।

বিনয় সরকারের সব গ্রন্থও আজ সুলভ নয়। সমস্ত রচনা-গ্রন্থ সন্ধানও এই গবেষণার বিষয়বস্তু। বিনয় সরকারের জীবন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতির ওপরে এ পর্যন্ত উল্লেখ্য রচনার মধ্যে শিবচন্দ্র দত্তের—Fundamental Problem and Leading Ideas in the Works of Prof. BenoyKumar Sarkar (1932), Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought—Sarkarism in Indian Economics (1939), সুবোধকুমার ঘোষালের—Sankarism—The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and his Conquests (1939), বাণেশ্বর দাস (সম্পাদিত)—The Social and Economic Ideas of Benoy sarkar (1939), নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর—Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology and Economics (1940), পঙ্কজকুমার মুখার্জির—The Economic Services of Zamindars to the Peasants and the Public as analysed by Prof. Benoy Sarkar (Calcutta), হরিদাস মুখোপাধ্যায়—Benoykumar Sarkar-A study (1953), অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের—Benoykumar Sarkar; The Theoritical Foundation of Indian Capitalism in the Bengali Intellectual Tradition from Rammohan Roy to Dhirendranath Sen (1979), ডঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—The Political Ideas of Benoykumar Sarkar (1984), ডঃ স্বপনকুমার ভট্টাচার্যের—Indian Sociology, The Role of Benoy Sarkar (1990), এবং বিনয় সরকারের সামগ্রিক রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের—বিনয় সরকার (১৯৪১), প্রমথনাথ পালের—মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার (১৯৭১) এবং ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ সম্পাদিত 'আচার্য বিনয়কুমার সরকার' (১৯৮৮) উল্লেখ্য কাজ। বাংলা গদ্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে 'বাংলা গদ্যে বিনয়কুমার সরকারের দান,' ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৪ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী রচিত 'আচার্য বিনয় সরকারের বাংলা

গদ্যশৈলী' (৫ পৃষ্ঠা) উল্লেখযোগ্য। এই দুটি প্রবন্ধে সাধারণভাবে বিনয় সরকারের শব্দচয়নের কথা উল্লিখিত।

বিনয় সরকারের রচনাবলীর ব্যাপক অনুসন্ধান ও আলোচনা এখনও যেহেতু হয়নি, তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেন্দ্রিক বিনয় সরকারের রচনার পরিচয় ও মূল্যায়ণ তাঁর জন্ম-শতবর্ষোত্তর কালে বাঙালীর পক্ষে একান্ত জরুরী। এরই সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারায় তাঁর রচনাশৈলীর প্রকৃত মূল্যায়ণ আমার উদ্দিষ্ট।

সাধু ও চলিত গদ্য—এই দুই রীতির ঘোড়াতেই তিনি চড়েছেন। তাঁর রচনার সিংহভাগ অবশ্য সাধুভাষায় লেখা। এই ভষার প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টবক্তৃত্ব (Clarity of thought বা ফরাসী ভাষায় lucidite francise) উল্লেখ্য।

চলিত ভাষায় গদ্য রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারায় এ পর্যন্ত বিনয়সরকার-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ অধ্যায় আজও অনালোচিত। বিনয় সরকারী স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর বিস্তৃত আলোচনায় তাঁর সঠিক মূল্যায়নের প্রয়াসই এই প্রকল্প (Hypothesis)। এই প্রকল্পে তিনি "নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান" ও একটি বিশিষ্ট ধারার যে আবিষ্কারক—তাও প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ভাষাকে অন্তরঙ্গ করার জন্য বিনয় সরকার এমন কতগুলি শব্দ, Phrase, ইডিয়ম ব্যবহার করেন যা তাঁর পূর্বে অন্য কোন লেখক করেননি। ফলে তাঁর ভাষা অনেক বীর্যবান হয়ে উঠেছে—বাংলা সাহিত্যও এক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর গদ্যের, বিশেষত চলিত গদ্যের স্টাইলিস্‌টিকস্‌ আলোচিতব্য ঃ—

(ক) বিনয় সরকারী "ফ্রেজ" গুলি ব্যবহারে "Style is the man" বাক্যটির তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত।

(খ) শব্দপ্রয়োগ ও ইডিয়ম ব্যবহারে, আবেদন সৃষ্টিতে—সফলতা ও দুর্বলতা বিচার।

(গ) বাক্য বিন্যাস—(১) কিছু সাহিত্যধর্মী, (২) কিছু রচনাধর্মী (৩) বৈঠকী মেজাজের।

(ঘ) সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, অনুচ্ছেদ, প্রত্যয় ইত্যাদির সূক্ষ্ম সতর্ক বিশ্লেষণ।

(ঙ) বিশেষণ ব্যবহারে দক্ষতা।

(চ) Contextual use of words - এ বিনয় সরকারের অসাধারণ নৈপুণ্য।

(ছ) Diagram এবং Graph-এর মাধ্যমে তাঁর চলিত ভাষার Style বিচার।

(ঝ) সরকারী ভাষায় মর্টন-কথিত Dr. W.C. Wake আবিষ্কৃত 'Cumulative sum charts method'-এর ব্যবহার।

(ঞ) চলিত গদ্যের শব্দার্থতত্ত্ব

(ট) চলিত গদ্যের বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি— গুরুচন্ডালি সমর্থন।

(ঠ) কথ্যভাষার বিশ্লেষণ।

বিনয় সরকারের চলিত গদ্যের প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকদের উপরে কতখানি তা নিরূপণ করাও এ পর্বের লক্ষ্য।

মোট কথা, বিনয় সরকারের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও গদ্যভাষা একে অপরের পরিপূরক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে চলিত গদ্যভাষার তিনি এক বিশিষ্ট স্রষ্টা বলেই তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

—ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ—

বাংলা গদ্যের ইতিহাস



প্রাক্-বিনয় সরকার পর্ব

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

প্রাক্-বিনয় সরকার পর্ব

সকল প্রাণীর কণ্ঠেই শব্দ আছে। কিন্তু মুখের ভাষা বলতে আমরা যা বুঝি—তা একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মুখে নেই। মানুষ তার আপন বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিত্য প্রয়োজনের সমস্ত জিনিষ তৈরী করে নিয়েছে। ঐ মস্তিষ্ক-ক্ষমতা বলেই সে মুখের ভাষাটিও সৃষ্টি করেছে। তবে এই ভাষা তৈরী করতে লেগেছে বহু-কাল। প্রথমে এই মূর্তিটা ছিল অমার্জিত। ক্রমে শব্দের ভান্ডার বেড়েছে, উচ্চারণ স্পষ্ট হয়েছে, বাক্য অনেক অর্থবহ হয়েছে।

ভাষার এই শৈশব কাটতে লেগে গেছে কয়েক হাজার বছর। সাহিত্য রচনার কথা তখন লোকে ভাবেনি। সাহিত্য জিনিসটা শখের। সংসারের অত্যাবশ্যকটুকু নিয়েই তখন মানুষ ব্যস্ত। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলি অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ সম্পর্কে যখন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে—তখনই তার হাতে অবসর এসেছে। অবসর সময়ে তার মনে নানা শখের উদয় হয়েছে—মূর্তি গড়েছে, কাঠ খোদাই করেছে, পাথরের গায়ে ছবি এঁকেছে অর্থাৎ নানা রকমের শিল্পকলার জন্ম হয়েছে। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলাও একটা শখ—এর থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি।

সাহিত্যের যোগ্য হতে ভাষার লেগে গেছে কয়েক হাজার বছর। সাহিত্যের কাজে লাগাতে গিয়ে ভাষাকে শোধন করে নিতে হয়েছে। আদিযুগের সাহিত্য-শাস্ত্রীরা ভাবতেন ছন্দোবদ্ধ, ঘননিবদ্ধ, সুসজ্জিত ভাষাই—সাহিত্যের ভাষা। সকল দেশে, সকল ভাষা—ছন্দোবদ্ধ পদ্যে ভর করেই সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে। লেখক-পাঠক সকলে পদ্যকেই সাহিত্যের বাহন বলে জেনেছে। গদ্যকে এ কাজের যোগ্য বলে ভাবতে পারেনি। গদ্য জিনিষটা নিত্য প্রয়োজনের, তাকে পোশাকি কোন কাজে লাগানো যাবে না। ফলে সাহিত্যের অন্দর মহলে প্রবেশের অধিকার না পেয়ে তাকে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকদিন।

ইংরাজী সাহিত্যেও এই একই অনাদরের কাহিনী লক্ষণীয়। সেখানেও পদ্যের জন্ম আগে, গদ্য পরে। ইংরাজী সাহিত্যে—পদ্য এবং গদ্যের মর্যাদার ব্যবধান ছিল যথেষ্ট। ইংরাজী গদ্যের সাবালক হতে চারশ বছর লেগে গিয়েছে—যেখানে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র দু'শ বছর। ইংরাজী গদ্যের বয়স এখন ছ'শ বছর। অর্থাৎ ইংরাজী গদ্যের তুলনায় বাংলা গদ্যের অগ্রগতি অনেক দ্রুত গতিতে হয়েছে। অর্থাৎ অতি স্বল্পকালের মধ্যে সে অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে।

আদিযুগের বাংলা সাহিত্য মূলতঃ ধর্মপ্রধান ছিল। যদিও সেখানে মানব মূল্য অস্বীকৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজের আগমনের ফলে বাঙালীর জীবনধারায় ও ভাবধারায় যে পরিবর্তন ঘটল, তার প্রভাব পড়েছিল বাংলা সাহিত্যে। ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালী তার সাহিত্যের অপূর্ণতার প্রতি সচেতন হয়। সাহিত্যে আধুনিকতার পথ পরিষ্কৃত হয় ইংরেজী শিক্ষা ও নবমানসিকতা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে।

উনবিংশ শতকের আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল—পত্র, দলিল এবং কড়চায়। এর পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত। বাংলা গদ্যের প্রথম প্রয়োজন বোধ করে ইংরেজরা। তাদের উদ্যোগেই বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রথম রচিত হল। বাঙালীর জন্য বাংলা গদ্যের জন্ম হয় নি, হয়েছে ইংরেজের জন্য। ইংরেজরা অনুভব করেছিল— এ দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করতে পারলে বাণিজ্য ও রাজকার্য—দুয়েরই পরিচালনা সহজ হবে। কিন্তু ভাষাশিক্ষা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, কারণ গদ্যভাষায় রচিত কোন বাংলা পুস্তকই তখন ছিল না। নিজের গরজে ইংরেজকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হল। এছাড়া আরও একটা তাগিদ ছিল। খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য মিশনারী সাহেবরা গদ্য ভাষায় বাংলা পুস্তকের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, উইলিয়ম কেরী প্রমুখ মিশনারী সাহেবদের উদ্যোগেই ১৮০০ সালে 'গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু'র বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'মথি লিখিত সুসমাচার' প্রকাশিত হয়। এরও আগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত— আইন কানুন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিল। এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ইংরেজ পন্ডিত। অর্থাৎ ১৮০০ সাল অবধি বাংলা গদ্যে বাঙালীর কোন অবদান নেই।

উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনার প্রয়াস হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। ১৮০০ সালে এই কলেজ স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশের সামাজিক রীতিনীতি, দেশীয় ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করানো। ব্যবস্থাপনার ভার পড়েছিল উইলিয়ম কেরীর ওপর। তিনি দেশীয় পন্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রধান সহকারী দুজন ছিলেন রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। এঁদের রচনায় কতগুলি রীতিঘটিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানা বসল। তিনি শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকে বাইবেলের অনুবাদ করিয়েছিলেন বা করেছিলেন। তবে তার ভাষা ইংরেজি সাহিত্যের বাক্য-বিন্যাস রীতির দ্বারা প্রভাবিত। উইলিয়ম কেরীর নামে যে দুটি বই প্রচারিত হয়েছিল—তার গদ্যরীতি অনেকটা মার্জিত। বই দুটির নাম 'কথোপকথন' (১৮০১ খ্রীঃ) ও 'ইতিহাস মালা' (১৮১২ খ্রীঃ)। 'কথোপকথন' গ্রন্থটিতে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং আচার ব্যহারের আলোচনা আছে। একজন ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে যথাসম্ভব চলিত ভাষায় বাক্যালাপের ঢং-এ বইটি লেখা। এর মধ্যে হরেক রকমের জিনিস ঠাঁই পেয়েছে। এমনকি স্ত্রীলোকের কোন্দলও। মানুষের মুখের ভাষা এখানে গৃহীত হয়েছে। জনসাধারণের বোধগম্য ভাষার দ্বারাও যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়—তা কেরী দেখিয়েছেন। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই বইটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গদ্য ভাষার জন্ম হতে না হতেই বৎসরকাল মধ্যে চলিত ভাষার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা বড় কথা। উইলিয়ম কেরীর দ্বিতীয় বই 'ইতিহাসমালা'য় অনেকগুলি ছোট বড় গল্প গৃহীত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই চলিত দেশি গল্প। এর ভাষা অনেক উন্নত। বাইবেল অনুবাদের আড়ষ্টতা এখানে নেই।

রামরাম বসুর গ্রন্থের সংখ্যা দুটি—'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খ্রীঃ) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২ খ্রীঃ)। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটি—বাংলা গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। তিনি ফারসী মিশ্রিত গদ্য রচনা করেছিলেন। অনেক পরস্পর বিরোধী কর্তাকে একই ক্রিয়ার কাঁধে চাপিয়ে নানা গোলযোগ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'—চিঠির আকারে লেখা নানা বিষয়ের আলোচনা। এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত অন্বয়ের দোষ পরিহার করে প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা করতে পেরেছিলেন—ফারসি শব্দকোষের আশ্রয় নিতে হয়নি তাঁকে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যরীতির বিকাশ দেখা যায়। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'রাজাবলি'। 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থে চলিত ভাষার দৃষ্টান্তও আছে—তবে সংস্কৃতানুসারী দৃষ্টান্তই বেশী। 'রাজাবলি' ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। ইতিহাসের বিরাট মহত্ত্ব—মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণায় আসেনি। সংস্কৃত প্রধান বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকৌলিন্য এখানে প্রথম দেখা দিয়েছে মনে হয়। 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের যে কলাকৌশলের উদ্ভব দেখি, 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' দেখি তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। তিনটি বিশিষ্ট গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে—কথ্যরীতি, সাধুরীতি এবং সংস্কৃতানুসারীরীতি। 'হিতোপদেশ', 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাবলী সংস্কৃত অনুগামী ছিল। তাঁর রচনারীতিতে পন্ডিতির ছাপ প্রবল ছিল। তাঁর সংস্কৃত প্রধান গদ্যভাষা—ভাব কল্পনার সঙ্গে ভাষাসম্পদের তাল রক্ষা করে এগিয়ে চলেছিল। তাঁর হালকা চালের সংলাপী ধরণের সাধুরীতি দেখা যায়—'প্রবোধচন্দ্রিকায়'। সাধুভাষার মধ্যে চলতি ইডিয়ম ও বাক্‌রীতি ভাষাকে নাটকীয় করে তুলেছে। চলতি গ্রাম্য শব্দকে—বিচক্ষণতার সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। বিষয়ানুসারী ভাষার রীতি হাল্‌কা, গম্ভীর বা মধ্যমগতি করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ ও গতিবান্ হয়েছে।

বাংলা গদ্যের জন্ম অতি শুভ-লগ্নে। লগ্নের অধিপতি স্বয়ং রামমোহন রায়। একজন মহামনস্বী ব্যক্তি—তাঁর কর্মে-বাক্যে-চিন্তায়, ব্যক্তিত্বের মহিমায় চতুর্দিকে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন—তার সঙ্ঘাতে সমগ্র সমাজ ব্যগ্র-ব্যস্ত-উচ্চকিত হয়ে ওঠে। যে ভাষার মুখে বাক্য ছিল না, সেও মুখর হয়ে ওঠে। রামমোহন যেদিন বেদান্তসূত্র বাংলা গদ্যে অনুবাদ করলেন, সেদিনই আমাদের গদ্য—শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নিগূঢ়তম তত্ত্বকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচার বাংলাদেশে এক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। সমাজে প্রচন্ড তোলপাড় ঘটেছে, ঘোরতর বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ভাষা ও সাহিত্য—দু'এরই পুষ্টি সাধন হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু রামমোহন এই কলেজি রচনার সীমানার বাইরে বাংলা গদ্যকে নিয়ে আসলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি হল 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫ খৃঃ), 'বেদান্তসার' (১৮১৬ খৃঃ), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৮ খৃঃ), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮ খৃঃ), 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ খৃঃ), 'পণ্যপ্রদান' (১৮২৩ খৃঃ), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১ খৃঃ), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১ খৃঃ), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ খৃঃ) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় যে দুটি রীতি আছে সাধু এবং চলিত, তারই কথা রামমোহন রায় 'বেদান্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই সকল রীতির—ভাষা উপকরণ ছিল না, তাই এর প্রয়োগের সমস্যা ছিল তাঁর পক্ষে। বাক্যের শেষে

ক্রিয়া স্থাপন করেছেন আবার অনেক ক্ষেত্রে উহ্য রেখেছেন। ব্যাকরণ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'গৌড়িয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃতজ উপাদান প্রচুর আছে। কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতি বা রূপ নির্মাণ রীতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। তাঁর ভাষায় বৈজ্ঞানিকজনোচিত বাক্‌সংযম ছিল। তিনি বাংলা ভাষার প্রথম লেখক, যিনি তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে সর্বসাধারণ পাঠকের সঙ্গে সহিতত্ত্বের মেলবন্ধনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মিশনারি সাহেবরা যখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট, তখন যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁদের মতবাদ খন্ডন করেছেন। রচনার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর যুগ-সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করে তাদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন। তিনি বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ না করে সংযম, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শালীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই কৌশল—বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছেন।

১৮১৮ খৃঃ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রে এই বাংলা গদ্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। এই সকল রচনার ভাষা বৈশিষ্ট্যই ছিল বাংলা গদ্যের প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পন' প্রকাশিত হয়। প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার মত—প্রথম সাময়িক পত্রের প্রকাশও ইংরেজের উদ্যোগেই হয়েছিল। সাধারণ জীবনযাত্রা এবং ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ যথাসম্ভব অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। সাময়িক পত্রিকাগুলির বাংলা ভাষাতে—এই ভাষা-বৈশিষ্ট্য ছিল।

এরপর বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্যায়—'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৩৯ খৃঃ)-র যুগ শুরু। প্রধানতঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে এযুগের সমৃদ্ধি। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় কুমারের 'ভূগোল'—প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল— শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় 'সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা' (১৮৪৫ খৃঃ), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫১ খৃঃ, ২য় ভাগ ১৮৫৩ খৃঃ), 'চারুপাঠ' (১ম ভাগ ১৮৫৩ খৃঃ, ২য় ভাগ ১৮৫৪ খৃঃ, ৩য় ভাগ ১৮৫৯খৃঃ), 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫ খৃঃ), 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫ খৃঃ), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬ খৃঃ), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৮ খৃঃ), এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ভাগ ১৮৭০ খৃঃ, ২য় ভাগ ১৮৮৩ খৃঃ)।

'ভূগোল', 'চারুপাঠ' এবং 'পদার্থবিদ্যা' পাঠ্যপুস্তকের জন্য রচিত হলেও, অন্যান্য গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে রচিত হয়নি। ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গদ্য রচনার জন্য তিনি শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বিষয়কে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা গদ্যের কৃতি শিল্পী। ভূগোল, বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত ছিল—জি. টি. পিয়ার্সনের 'ভূগোল' ও 'জ্যোতিষ বিষয়ক প্রস্তাব' পড়ে তাকে মিথ্যা বলে মনে করতেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মালো। মানবধর্মাচরণকে একমাত্র সত্য বলে মানলেন।

বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব অক্ষয়কুমারের। কিন্তু বাংলা গদ্য রচনা করতে গিয়ে তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন—তা হল শব্দ নির্বাচনের। কারণ তাঁর সামনে বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ খাড়া ছিল না। ইংরেজী অনেক শব্দের বাংলা পরিভাষা ছিল না। তিনি এই সকল শব্দগুলি নির্মাণ করলেন। এই পরিভাষাগুলি এখনও কিছু অবিকৃত আছে। তাঁর সংযোজিত শব্দগুলি স্বতন্ত্র শব্দে পরিণতিলাভ করেছে। যেমন—'পরমসুখ', 'জলকল্লোল', 'বৃক্ষসমূহ' ইত্যাদি। তিনি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বেশী করেছেন। বাক্যবিন্যাসে দেখা গেছে—তিনি দীর্ঘ রীতিতে বাক্য রচনা করেছেন। দীর্ঘরীতিতে সম্পন্ন বাক্যে বক্তব্যের পারম্পর্য নষ্ট হয়নি। তাঁর ভাষা কখনও পান্ডিত্যপূর্ণ, কখনও সঙ্গীতময় হয়েছে—তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাতেও সঙ্গীতের সুর শুনিয়েছেন।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার আর একজন লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যের সৌষ্ঠব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচনাগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) ধর্মসাহিত্য, (২) পত্রসাহিত্য, (৩) জীবনীসাহিত্য। তাঁর গ্রন্থগুলি হলঃ—'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১৮৫০ খৃঃ), ঐ বঙ্গানুবাদসমূহ (১ম এবং ২য় ভাগ) (১৮৫১ খৃঃ), 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৮২ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০ খৃঃ), 'পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ - - - বক্তৃতা' (১৮৬১ খৃঃ), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২ খৃঃ), 'মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ' (১৮৬০-৬৭ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ১ প্রকরণ

(১৮৫১ খৃঃ) ২ প্রকরণ (১৮৬৬ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্মের পরিশিষ্ট' (১৮৮৫ খৃঃ), 'ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী' (১৮৬৪ খৃঃ), 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' (১৮৬৪ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি' (১৮৬৫ খৃঃ), 'ভবানীপুর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ' (১৮৬৫-৬৬ খৃঃ), 'উপহার' (১৮৮৭ খৃঃ), 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (১৮৯৩ খৃঃ), 'পরলোক ও মুক্তি' (১৮৯৫ খৃঃ), 'পত্রাবলী' (১৮৫০-১৮৮৭ খৃঃ), 'আত্মচরিত' (১৮৯৮ খৃঃ), ইত্যাদি।

ধর্মকে গদ্য সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করার কৃতিত্ব দেবেন্দ্রনাথের। তাঁর কাছে ঈশ্বরবোধ আর জীবনবোধ—দ্বৈতাদ্বৈতরূপে প্রকাশিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সব প্রবন্ধ ও উপদেশ প্রভৃতি প্রকাশিত হয় তা গ্রথিত হয় 'অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্যা'য়।

তাঁর সাহিত্যধর্মী পত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন দিক খুলে দেয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'র আদর্শ দেবেন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য থেকেই পেয়েছেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'আত্মজীবনী' (১৮৯৪ খৃঃ)। 'আত্মজীবনী'র ভাষায় বাংলা গদ্যের অপূর্ব রূপ দেখা যায়। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের রচনায় অধ্যাত্মবোধই স্থায়ী সুর। তাঁর গদ্যরীতি বিষয়শাসিত। বিদেশী শব্দ বিশেষতঃ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার—তাঁর রচনার চলৎশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাস ব্যবহারে তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি অনেকসময় ক্রিয়াকে উহ্য রেখে বাক্য তৈরী করেছেন। এতে রচনার সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। ভাষার মধ্যে সঙ্গীতসৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয় শিল্পী। 'তত্ত্ববোধিনী সভা', (১৮৩৯ খৃঃ), 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০ খৃঃ), এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩ খৃঃ)-র মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলি বেশীর ভাগই ধর্মসাহিত্য। তাঁর এই সকল গ্রন্থগুলি সঙ্গীত-সুধায় ভরপুর ছিল।

'তত্ত্ববোধিনী' যুগের আর একজন মনস্বী ও যুক্তিবাদী লেখক বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা তখনকার অন্য কোন গদ্য লেখকের ছিল না এবং যার জন্য তিনি তখনকার গদ্য লেখার মামুলি ঢঙকে অবিকল অনুকরণ করার প্রেরণা বোধ করেননি। তাঁর সমগ্র রচনা মোটামুটি চার শ্রেণীর। (১) অনুবাদমূলক রচনা, (২) শিক্ষামূলক রচনা (৩) সমাজসংস্কার মূলক রচনা, (৪) মৌলিক রচনা।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর হিন্দী 'বেতালপচ্চিশি'র অনুসরণে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' লেখেন। সাহিত্যে যাকে সাধুভাষা বলে— তার পরিচয় এই রচনাতে পাওয়া যায়। প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। মূল সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' থেকে তিনি বাংলায় 'শকুন্তলা' ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বাগভঙ্গীতে লঘুরীতি ব্যবহার করেছেন। ভাষা এখানে স্বচ্ছন্দ হয়েছে। তাঁর একটি অনুবাদগ্রন্থ শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors'-এর অনুসরণে 'ভ্রান্তিবিলাস' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। মূল কমেডির হাস্যতরঙ্গ ও লঘু ধরণটি তিনি সুন্দরভাবে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ভবভূতির 'সীতার বনবাস' বিদ্যাসাগরের হাতে অনেক সহজ হয়েছে। তিনি এখানে ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সীতার শোচনীয় পরিণাম বোঝাতে তিনি করুণ রসের একটু বেশী স্থান দিয়েছেন।

তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে 'বোধোদয়' (১৮৫১ খৃঃ), 'কথামালা' (১৮৫৬ খৃঃ), 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৮ খৃঃ), 'বর্ণমালা' (১ম ও ২য় ভাগ) প্রভৃতি অন্তর্গত। ভাষার বাঁধুনি-গাঁথুনির প্রথম পাঠ পাওয়া গেছে 'বোধোদয়', 'কথামালা'র পাতায়। এর ভাষারীতি অতি পরিচ্ছন্ন ও সংযত।

তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৫ খৃঃ), এবং 'বহুবিবাহ বন্ধবিষয়ক রচনাদি' (১৮৭১-১৮৭২ খৃঃ)। তাঁকে নানা বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। তাঁর যুক্তিবাদী ভাষা, তীক্ষ্ণ-তুখোড়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই ধরণের গ্রন্থে। যুক্তির বাঁধুনি থাকার জন্য তাঁর ভাষা শিথিল হয়ে পড়েনি। বাংলা গদ্যের গোড়াটা মজবুত হয়েছিল এই কারণে যে—প্রথমেই ভাষাকে কঠিন কাজে লাগানো হয়েছিল বলে। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যে সাহিত্যের স্বাদ এনেছিলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—'আবার অতি অল্প হইল' এবং 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩ খৃঃ), 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' (১৮৮৮ খৃঃ), 'ব্রজবিলাস', 'বিধবাবিবাহ', 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' (১৮৮৪ খৃঃ), 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬ খৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। এই গ্রন্থগুলি সাধুরীতিতে লেখা হলেও এখানে বাগভঙ্গী হালকা রীতির হয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি স্ল্যাং শব্দও ব্যবহার করেছেন। বহু চলতি শব্দের সংকলন তিনি করেছেন।

বিদ্যাসাগর অতি নিপুণ হাতে ভাষার অবয়বটি তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাঁর গদ্যের প্রতিটি শব্দ বলবান ও সুনির্বাচিত। বাংলা গদ্যের প্রয়োজনে তিনি সংস্কৃত উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। বিষয় অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। যখন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন বা কোন গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তখন তাঁর রচনায় সংস্কৃতের ভাষাগত প্রভাব বেশী পড়েছে। আবার যখন সাধারণ বিষয় বা শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তখন সেখানে সরলপদ সৃষ্টি করেছেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে তিনি নামধাতু প্রয়োগ করেছেন। 'বলিয়া' বা 'এই বলিয়া' যোগে ব্যাক্যারম্ভ তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন—তাঁর ছাঁদটি সাহিত্য রচনাকার্যের ছাঁদ। ফলে তাঁর গদ্য শিল্পশ্রী মন্ডিত গদ্য হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী ও অনুরাগী রাজনারায়ণ বসু সে যুগের এক কৃতী লেখক। তাঁর 'সেকাল ও একাল' আজও সুখপাঠ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত হয়েও ইংরাজি শিক্ষার গুণে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২ খৃঃ), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২ খৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থে স্বচ্ছন্দ গদ্য রচনায় কুশলতা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

এতদিন বাংলা গদ্য চলছিল বিদাসাগর প্রদর্শিত পথে। হঠাৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ ক্ষুদ্রকায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। লোকে যে ভাষায় কথা বলে, লিখন-পাঠনের ভাষাকে যতটা সম্ভব তার কাছাকাছি নিয়ে আসাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। অল্পশিক্ষিত লোককে সহজবোধ্য ভাষায় সাহিত্যরস যোগান দিত এই পত্রিকা। প্যারীচাঁদ মিত্র বহু রচনা করেছেন যেমন—'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়', 'রামরঞ্জিকা' (১৮৬০ খৃঃ), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫ খৃঃ), 'অভেদী' (১৮৭১ খৃঃ), 'অধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খৃঃ) ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি প্রধানত 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থের লেখক হিসাবে। 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮ খৃঃ, ১৮৫৪ খৃঃ থেকে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত) প্রকাশের পর সাহিত্যে কোন রীতিটি গৃহীত হবে—তা নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। সাধারণ লোকের মুখে প্রতিদিনের কথাবার্তায় যে সব কথা হরদম চলছে, সেই সব শব্দ বা ভাষা তিনি তাঁর কাহিনীর আখ্যানভাগে এবং সংলাপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ক্রিয়াপদের কাঠামো সাধুভাষার মত হয়েছে—অর্থাৎ 'খাচ্ছি', 'এলুম', 'গেলুম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নি। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধুভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার মিশেল দিয়ে ভাষার মধ্যে সরসতা বাড়িয়েছেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬১-৬২ সালে প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তখনকার কলকাতার সামাজিক জীবনের একটি ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র। অল্প শিক্ষিত কলকাতা-বাসিন্দাদের মুখের 'কলকাত্তাই' বুলিতে লিখিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি নতুন পদ্ধতির গদ্যরীতির সৃষ্টি করলেন। এর ভাষা অনেক বেশী কথ্যধর্মী।

এতদিনে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য দুই-ই পরিণতির পথে অগ্রসর হল। কিন্তু ভাষা সবল হলেও সেখানে লালিত্যের অভাব ছিল। কঠিন বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করেছে কিন্তু রসের কথা বলতে শেখেনি। ভাষা—রসিকের ভূমিকা নিলে, তবেই তা সাহিত্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। বাংলা ভাষা সাহিত্যের দীক্ষা গ্রহণ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে। বঙ্কিমের হাতে ভাষার দেহ-সৌষ্ঠব যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বিস্ময়কর।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ ১৮৬৫ সালে। যে ভাষায় প্রথম গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ ১৮০১ সালে—সে ভাষায় মাত্র চৌষট্টি বছরের পার্থক্যে উপন্যাস রচিত হল। ইংরেজী ভাষায় গদ্যের জন্ম যেখানে চতুর্দশ শতকে, সেখানে উপন্যাসের জন্ম অষ্টাদশ শতকে হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার যেখানে চৌষট্টি বছর লেগেছে ইংরাজি সাহিত্যের সেখানে সাড়ে তিনশ বছর লেগেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি যে কি দ্রুত গতিতে হয়েছে এখানেই তার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র সামনে কোন আদর্শ রেখে কাজ করেন নি। দেশী, বিদেশী নানা গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু এই সকল সাহিত্য থেকে তিনি কোন রীতি গ্রহণ করেন নি। মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু বিশেষ উপাদান তাঁর মনের ভিতর জমা ছিল। কল্পনা সর্বস্ব রচনার রীতি—বঙ্কিমের উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

তিনি মানুষের জীবন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সংঘাত ঘটে আবার সংঘাত ব্যক্তির চিত্তে ঘটে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই দেখা যায়—উপকাহিনী চিত্তাকর্ষক হয়েছে। উপন্যাসে পত্র ব্যবহার বঙ্কিমের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য। ঘটনাবহুল উপন্যাসে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে মহাকবির দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর উপন্যাসে সর্বত্র এই দৃষ্টি প্রসারিত।

তাঁর উপন্যাসগুলি হল—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খৃঃ), 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬ খৃঃ), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯ খৃঃ), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খৃঃ), 'ইন্দিরা' (১৮৯৩ খৃঃ), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩ খৃঃ), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খৃঃ), 'রজনী' (১৮৭৫ খৃঃ), 'রাধারানী' (১৮৭৫ খৃঃ), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খৃঃ), 'রাজসিংহ' (১৮৯৩ খৃঃ), 'আনন্দমঠ' (১৮৯৪ খৃঃ), 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৯৫ খৃঃ), 'সীতারাম' (১৮৯৮ খৃঃ)।

তাঁর রচনার ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। তিনি মনে করতেন, লোকে যে ভাষা বোঝে—সেই ভাষায় রচনা করা উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে তিনি এই নীতি মেনে চলতে পারেন নি।

'কপালকুন্ডলা'র সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দাড়ম্বর বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বর্জন করেন। সংলাপে সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দী, ইংরেজী, ফার্সী ব্যবহার করতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখা গেছে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত একাধিক উপন্যাসে দেখা যায়। যেমন—'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা' ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের শৃঙ্খলিত ব্যবহার—তাঁর রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

বাংলাগদ্যের বাঙালীসুলভ লাবণ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রণয়কাহিনী যেমন রচনা করেছেন—তেমনি ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাও প্রচুর করেছেন। এখানেও ভাষার প্রাঞ্জলতা ক্ষুন্ন হয়নি। বঙ্কিমের বহুমূল্যবান প্রবন্ধ—বিচিত্র চিন্তার এক মহামূল্য ভান্ডার। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়টি 'কৌতুক ও রহস্য' প্রবন্ধ 'লোকরহস্য' নামে পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয় ১৮৭৪ সালে। 'লোক রহস্যে'র কৌতুকরসের মধ্যে বিদ্রূপ না থাকার জন্য এটি জনপ্রিয় হয়েছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫ খৃঃ) তাঁর সাহিত্যশিল্পের একটি অভিনব সৃষ্টি। প্রবন্ধ ও নক্শাগুলিতে বুদ্ধির দীপ্তি এবং অনুভূতির গভীরতা আছে। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৭৯ খৃঃ) একটি ব্যঙ্গগল্প। বিজ্ঞানবিষয়ক নয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হয় 'বিজ্ঞানরহস্য' নামে। এই প্রবন্ধগুলি সহজ ভাষায় লেখা। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬ খৃঃ) এবং দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯ খৃঃ) নামে সঙ্কলিত হয়েছিল।

বঙ্কিমের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর স্তম্ভে এক জ্যোতিষ্কমন্ডলী গদ্য-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হল। অক্ষয়চন্দ্র

সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখরা 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর খ্যাতনামা লেখক। বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধিতে এঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' মাসিক পত্রের সম্পাদক হিসাবে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি ও তাঁর সরস মনোভাবটির আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ, যথা—'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৪ খৃঃ), 'আলোচনা' (১৮৮২ খৃঃ), 'সনাতনী' (১৯১১ খৃঃ) ও 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩ খৃঃ) প্রভৃতিতে জ্ঞানগম্ভীর ও কল্পনারস—এই দুই রীতিরই নিদর্শন মেলে। তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরস ও ঋজুগতির—উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিকের অনেক গুণই তাঁর ছিল।

চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১ খৃঃ), 'ত্রিধারা' (১৮৯১ খৃঃ), 'সাবিত্রী তত্ত্ব' (১৯০০ খৃঃ) সেকালে খানিকটা সমাদর লাভ করেছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পালামৌ' (১৮৮০ খৃঃ) ঠিক প্রবন্ধ নয়, মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী, তবে এর মধ্যে উপন্যাস ও প্রবন্ধের কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ ও সরল ভাষায় গুরুতর প্রবাদ লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্ব এবং বাংলা ও সংস্কৃতের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী

ছিলেন। তাঁর 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯ খৃঃ) উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদি হিন্দুযুগের জীবনযাত্রার ছবি এঁকেছেন। 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১ খৃঃ) নামক পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২ খৃঃ) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। এছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে।

বঙ্কিম বাংলা গদ্যকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেখানে দিগন্ত অবধি সমস্ত পথই তার কাছে উন্মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এসে একটি সাজানো বাগান হাতে পেলেন। এতে তাঁর কাজে সহায়তা হয়েছে আবার দায়িত্বও বেড়েছে। 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ কুড়ির দশকে বিশ্ব নাগরিকে পরিণত হয়েছিলেন। তার ছাপ পড়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। ফলে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি বেড়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কাব্যিয়ানা নেই। তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ও স্বাদবৈচিত্র্য ফোটাতে তিনি যে বিশেষ শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। মাত্র ষোল বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয় (১৮৭৭-৭৮ খৃঃ)। কিন্তু এতে ততটা পরিপক্কতা নেই বলে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে তিনি ক্রমে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ওপর প্রত্যক্ষ অধিকার অর্জন করেন। 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে (১৯৮৭ খৃঃ)—বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার ইতিহাসের কাহিনী অনুসৃত হয়েছে।

এই দুইখানি উপন্যাসের পর অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনা থেকে বিরত ছিলেন। 'চোখের বালি' (১৯০২ খৃঃ) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬ খৃঃ) তাঁর পরবর্তী উপন্যাস। এই অন্তবর্তীকালে তিনি ক্রমশঃ কাব্যপরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময় ১৮৯১ খ্রীঃ থেকে তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প, মাসিক পত্রিকায় অনুশীলন করে—অপরূপ সৌন্দর্য সুষমায় একে সমৃদ্ধ করে তোলেন। জীবনের বিচিত্র রূপ রসের নতুন অভিজ্ঞতা—তাঁর পরবর্তী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হল। 'চোখের বালি'তে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নূতনত্ব সঞ্চারিত হল। এই উপন্যাসটিতে এক বাস্তব সংঘাতের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এর মধ্যে যে কাব্যানুভূতি আছে তা চরিত্রগুলিকে স্বচ্ছতর করতে সাহায্য করেছে। 'চোখের বালি'র কয়েক বছর পরে ১৯০৬ সালে 'নৌকাডুবি' প্রকাশিত হয়। এখানে মানুষের চরিত্র অপেক্ষা ঘটনারই প্রাধান্য। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা রক্ষিত হয়নি। এটি একটি রোমান্স আশ্রয়ী ঢিলেঢালা ধরণের উপন্যাস।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বাজাত্যবোধ—ধর্মবিরোধ ও রাজনৈতিক চেতনার আঘাতে, বাঙালী জীবন আন্দোলিত হয়েছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এক বিশালতর পটভূমিকায় জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে এসে দাঁড়াল। 'গোরা' (১৯০৯ খ্রীঃ) উপন্যাসে বিরাট পটভূমিকার প্রভাব লক্ষণীয়। আকারে-প্রকারে, ভাবে-আদর্শে 'গোরা' মহাকাব্যের মতই বিশাল। 'গোরা'তে মানবিক পরিবর্তন ও যথার্থ ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটিকে নাটকীয় মুহূর্তে সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। 'গোরা'তে তিনি সমগ্র সমাজের—দেশব্যাপী নানা ভাব আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র এঁকেছেন। 'গোরা'-র পরে যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করলেন তাদের মধ্যে সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশ তৈরী করলেন। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬ খৃঃ), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬ খৃঃ), 'যোগাযোগ' (১৯২৯ খৃঃ), 'শেষের কবিতা' (১৯৩০ খৃঃ), 'দুইবোন' (১৯৩৩ খৃঃ), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪ খৃঃ), ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪ খৃঃ) উপন্যাসগুলি এক নতুন রীতি, শিল্পকৌশল ও জীবন-সমীক্ষা অবলম্বনে লিখিত। তাঁর ভাষা তীক্ষ্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষারীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে। তাঁর ১১৯টি গল্প—১৮৮৪ খৃঃ থেকে ১৯৪১ খৃঃ, এই মোট সাতান্ন বছর ধরে রচিত হয়েছিল। এত দীর্ঘ সময় কোন লেখকের ব্যক্তিগত শৈলী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর—রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্যরীতি ত্যাগ করে, চলিত রীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে একটি বিশেষ ব্যঙ্গের 'এফেক্ট' তৈরী করতে—'তোতাকাহিনী'তে আবার সাধুভাষার আশ্রয় নেন। নিজ প্রয়োজনেই, ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। এত বিভিন্ন ও এত বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তাঁকে লিখতে হয়েছে যে, বিষয়ভেদে ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে তাঁকে সজাগ থাকতে হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র'-তেই রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যরীতি প্রয়োগ করেছিলেন। পত্রের আকারে লিখেছেন বলেই হয়ত চলিত গদ্যে লেখার কথা মনে হয়েছিল। চিঠির সহজ ভাষা চলিত গদ্য। তাই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রের আকারে লেখা বলে সেখানে চলিত রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাই এরপরেই রবীন্দ্রনাথ 'ভাইফোঁটা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'শেষের রাত্রি' (১৩২১, আশ্বিন) গল্পে সাধুরীতির গ্রহণ করেছেন। 'পয়লা নম্বর' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) গল্পেই তিনি পাকাপাকিভাবে চলিত রীতি গ্রহণ

করেন। এই সকল গল্পগুলি 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশ করেছিলেন। 'সবুজপত্র'-তে মোট দশটি গল্প পকাশ করেছিলেন 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'হৈমন্তী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'বোষ্টমী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'ভাইফোঁটা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'শেষের রাত্রি' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'অপরিচিতা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'তপস্বিনী' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ), 'পয়লা নম্বর' এবং 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রভাবিত থাকলেও পরের দিকে বঙ্কিমের গদ্যরীতি পরিহার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধরণের অতিনাটকীয়তাকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় স্থান দেননি। তার সমাজ ও পারিবারিক গল্পগুলিতে—সমাজ ও জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। 'একরাত্রি', 'দুরাশা', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্পে প্রেম, সৌন্দর্য ও কল্পনার বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি গল্প অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; যেমন—'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার', 'রাসমণির ছেলে', 'ছুটি', 'দিদি', 'ঠাকুরদা' ইত্যাদি। 'নষ্টনীড়' আকারে বড় হলেও, এটি প্রকারে ছোটগল্পের জাত। মনোবিশ্লেষণমূলক এই গল্পটি অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে উদার বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ গীতিকবিতার আকারে ফুটে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত গল্প 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি' আধুনিক জীবনের সমস্যার অবতারণা করেছে। 'মণিহারা', 'নিশীথে' গল্প দুটিতে গার্হস্থ্য প্রতিবেশের মধ্যে ভৌতিক রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যের চাইতে রবীন্দ্রগদ্যের বিকাশ ও পরিণতি অনেক বেশি দ্রুত। মাত্র সতের-আঠার বছর বয়সে কলম ধরেই 'য়ুরোপ প্রবাসী পত্র' নামক গ্রন্থে যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কোন কাব্যগ্রন্থেই পাওয়া যায় না। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯১ খৃঃ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ—দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। নানা বিষয়ক প্রবন্ধ সম্ভারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭ খৃঃ), 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪ খৃঃ), 'বিচিত্রপ্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গ কৌতুক' প্রভৃতি সমালোচনা গ্রন্থ (সবই ১৯০৭ খ্রীঃ প্রকাশিত), ১৪ খন্ডে লেখা 'শান্তিনিকেতন', 'প্রবন্ধ সমষ্টি', 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২ খৃঃ), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২ খৃঃ), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯ খৃঃ), 'যাত্রী' (১৯২৯ খৃঃ), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০ খৃঃ), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১ খৃঃ), 'জাপান-পারস্যে' (১৯৩৬ খৃঃ), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬ খৃঃ), 'কালান্তর' (১৯৩৭ খৃঃ), 'পত্রধারা' (১৯৩৮ খৃঃ), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১ খৃঃ)—এই সকল গদ্য তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে সাধু ও চলিত—এই দুই ভাষাশৈলীই লক্ষিত হয়। সাধুরীতি থেকে চলিত রীতি গ্রহণের একটি মধ্যবর্তী পর্ব তৈরী হয়েছে। এই সময়ে তাঁর গদ্যরীতি, সাধুরীতির আবরণে থাকলেও—ভঙ্গি ও শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে চলিতরীতির অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। 'রাসমণির ছেলে', 'হালদার গোষ্ঠী', 'পণরক্ষা', 'চতুরঙ্গ', 'জীবনস্মৃতি' সাধুভাষায় লেখা হলেও এই বইগুলিতে প্রথম থেকেই পাওয়া যায় চলতি ভাষার নির্ভর স্বাচ্ছন্দ্য।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য বহুরূপী। একই সময়ে, একই সঙ্গে, দুরকম ভাষায় লিখেছেন—'গল্পগুচ্ছ' সাধুভাষায়, 'ছিন্নপত্র' চলিত ভাষায়। প্রবন্ধ যখন লিখছেন কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে—তখন তাঁর ভাষা যুক্তিতর্কের আঁট বাধুনি হয়েছে। আবার 'বিচিত্র প্রবন্ধে' সেই লেখনীরই রাশ আলগা করেছেন। 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা'-র চকচকে ক্ষুরধার ভাষা ঠিক স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম। তবে ভাষার বাক্-চাতুর্য্য তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা তাঁর নিজস্ব ভাষা, প্রাকৃতজনের ভাষা নয়। চলিত ভাষা—পথ, ঘাট, বাজারের ভাষা। কিন্তু খাঁটি, নির্জলা, চলিত ভাষার ব্যবহার বিবেকানন্দ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যে পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'বর্তমান ভারত' (১৩০৫-৭ বঙ্গাব্দ), 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৩০৭-৮ বঙ্গাব্দ), 'পরিব্রাজক' (১৩০৭-৮ বঙ্গাব্দ), 'পত্রাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি গুণগত উৎকর্ষে ঋজু, কঠিন। বিবেকানন্দ ঊনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দুচারটি প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর গদ্য রচনার সবটুকুই মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

সাহিত্যসৃষ্টি—বিবেকানন্দের রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র ঐ কয়েকটি গ্রন্থে। চলিতরীতি ছাড়া সাধুরীতিকেও ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারত'-এ লক্ষ্য করা যায়। সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। এখানে তিনি দু-ধরণের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি তৎসম শব্দবহুল আর একটি হাল্‌কা বাক্‌রীতি। সমাস-সংবদ্ধ চিন্তার বাহন তাঁর সাধুভাষায় লক্ষ্য করা যায়। অনেক জায়গায় চলিত রীতিতে ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিবেকানন্দের ভাবের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারী শুনে বুঝলেন, মুখের ভাষা কেমন করে উপমায়-শব্দচয়নে অসামান্য ভাষা হয়ে উঠতে পারে। বাংলা ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা গদ্যের রূপান্তর সাধনে 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা-প্রবন্ধটি এবং 'বর্তমান ভারত' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি একদিকে ও অন্যদিকে 'ভাববার কথা', 'বিলাত যাত্রীর পত্র' (পরিব্রাজক) পাশাপাশি রাখা যায়। প্রথমটিতে সাধুরীতি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়টিতে তিনি দেশী, ঘরোয়া শব্দে মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় পরিণত করেছেন। এর মধ্যেও মাঝে মাঝে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'তে বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরণ-ধারন মুদ্রাদোষগুলিও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত জীবন্ত। চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও প্রয়োজনস্থলে আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর বিবৃতিধর্মী চলিতগদ্যে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি লক্ষ্য করা যায়। আবার চলিত ভাষার মধ্যে তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের সমাবেশ দেখা যায়। চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনায় যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। চলিত ভাষাতে বিদগ্ধ ভব্যরূপ না দিয়ে, তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে তাতে ওজঃ রস সঞ্চার করেছিলেন তিনি। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘুতাই যে চলিতরীতি নয়, তা বিবেকানন্দ ভাল করে জানতেন। বাংলা গদ্য গঠনে তিনি অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের উদয়ের ফলে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'মন্দির' শরৎচন্দ্রের রচনা। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে একটি বড় গল্প প্রকাশিত হলে তার অপূর্বত্বে সেদিনের পাঠক সমাজ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। বাইশ বৎসরের মধ্যে তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্প সংকলন পাঠকসমাজের ওপর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৩৮ খৃঃ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর 'শুভদা' প্রকাশিত হয়। 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট রচনাটি রাধারানী দেবী সম্পূর্ণ করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী, রোম্যান্টিক ঔপন্যাসিক। তিনি সমাজের অখ্যাত বিবর্ণ চরিত্রগুলিতে অসাধারণত্ব আরোপ করেছেন। ফলে এই সকল চরিত্রগুলি পাঠকের মনে অক্ষয় স্থান অধিকার করেছে। তাঁর কিছু উপন্যাসে পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে কোন সামাজিক নীতিঘটিত প্রশ্ন নেই। যেমন—'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪ খৃঃ), 'পরিণীতা' (১৯১৪ খৃঃ), 'পন্ডিত মশাই' (১৯১৭ খৃঃ), 'মেজদিদি' (১৯১৫ খৃঃ), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬ খৃঃ), 'বৈকুন্ঠের উইল' (১৯১৫ খৃঃ), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬ খৃঃ), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭ খৃঃ) ইত্যাদি। তিনি তথাকথিত সমাজের আদর্শকে না মেনে, সমাজের অবিচারের চাপে পিষ্ট সেই সকল নরনারীর বেদনাতুর কাহিনী লিখে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের সমাজে আঘাত হেনেছিলেন। সেই সকল উপন্যাসগুলি হল 'বড়দিদি' (১৯১৩ খৃঃ), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪ খৃঃ), 'শ্রীকান্ত' (১ম-১৯১৭ খৃঃ, ২য়-১৯১৮ খৃঃ, ৩য়-১৯২৭ খৃঃ, ৪র্থ-১৯৩৩ খৃঃ), 'দেবদাস' (১৯২৭ খৃঃ), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭ খৃঃ), 'গৃহদাহ' (১৯২০ খৃঃ), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩ খৃঃ), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১ খৃঃ) ইত্যাদি। নীতি ও তত্ত্বকথা যেখানে প্রচার করেছেন সেখানে শিল্পরস ক্ষুন্ন হয়েছে। যেমন—'পথের দাবি' (১৯২৬ খৃঃ), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১ খৃঃ), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫ খৃঃ) ইত্যাদি। 'স্বামী' (১৯২৮ খৃঃ), 'কাশীনাথ' (১৯১৭ খৃঃ), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৫ খৃঃ), 'নববিধান' গল্পগুলিতে দাম্পত্য বিরোধের নানা স্তর উদঘাটিত হয়েছে। 'দেনাপাওনা' (১৯২৩ খৃঃ), 'দত্তা' (১৯২৪ খৃঃ) উপন্যাস দুটিতে প্রেমের বিকাশে মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় তার—প্রধান লক্ষ্য চরিত্রসৃষ্টি। পরিবার জীবনের সাধারণ আবেগ ও বৃত্তি সমূহের সম্বন্ধে এক আশ্চর্য সত্যানুভূতি শরৎচন্দ্রের ছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে, মা যেমন তাঁর নিজের ছেলেকে ভালবাসেন তেমনি সময় সময় পরের ছেলেকেও সমান স্নেহ দেন। দাম্পত্যপ্রেমও তেমনি কোন আদর্শে বাঁধা থাকে না। সেখানেও মান অভিমান, তীব্র মতভেদ, ঘৃণা, অবজ্ঞার আবরণ এর স্বরূপকে দুর্নিরীক্ষ্য করে তোলে। স্নেহ -প্রেমের এই তির্যক গতি পারিবারিক জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করে তা শরৎচন্দ্র খুব সূক্ষ্মভাবে তার উপন্যাসে এঁকেছেন।

তাঁর কাহিনীতে যেমন, ভাষায়ও তেমনি হৃদয়াবেগের প্রাবল্য। রবীন্দ্রযুগেও তিনিই ছিলেন সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক। প্রতিটি গল্পে অনেকখানি আবেগের সঞ্চার করেছেন। তিনি বাঙালি চিত্তকে যেভাবে স্পর্শ করেছিলেন, এমন আর কেউ নয়।

রবীন্দ্রযুগে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীই নতুন এক গদ্যরীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী। তিনি 'ভলটেয়ার'-এর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর ভাষা লঘু, তীক্ষ্ণ, চোস্ত ছিল। 'হুতোমে'র ভাষা অনেক বেশী কথ্যধর্মী, মুখের ভাষার নিকটস্থ ছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রখর মনীষার কর্ষণে বাংলা গদ্যের চলিতরূপ অন্যভাবে এল। তাঁর নেতৃত্বে ও 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪ খৃঃ) মাধ্যমে কথ্য ভাষার সপক্ষে এক বৃহৎ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তিনি চলতি রীতির সমর্থনে বরাবর সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামের ধৈর্যই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা মজলিশি। তর্কের দীপ্তি আছে এ ভাষায়। তাঁর ভাষায় কোথাও ঢিলেঢালা নেই, যেমন—'আঁটসাট সুঠাম দেহ তেমনি উজ্জ্বল মুখশ্রী'। তাঁর রচনায় মননশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রবণতা। কথ্যরীতি ও লেখ্যরীতির অভিন্নতা প্রমাণে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইডিয়ম প্রয়োগ করে গদ্যে সাধুভাষার কৃত্রিমতা ঘোচাতে চেয়েছিলেন। প্রবাদ-প্রবচন ভাষার মধ্যে প্রয়োগ করে বক্তব্যের অস্পষ্টতা ঘোচাতে চেয়েছেন। তিনি বাংলা গদ্যে ইংরাজী বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন।

লেখকের চিন্তাশক্তির মৌলিকতায় বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় 'জয়দেব' প্রবন্ধটিতে। সাধুভাষায় রচিত এই প্রবন্ধটিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে হৃদয়বৃত্তির ছাপের চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ প্রগাঢ়। তিনি মনে করতেন সাহিত্যের মধ্যে হাসির কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হয়েছে—বিতর্ক। আবার প্রবন্ধ ছেড়ে যখন গল্প লিখেছেন তখন রচনার চাতুর্যে চমক সৃষ্টি করেছেন।

বক্তব্যকে ঘুরিয়ে উপস্থাপন করা তাঁর গদ্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। ফলে অনেক সময় রস ক্ষুন্ন হয়েছে। সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রয়োগ তাঁর ভাষার ধার বাড়িয়েছে। উইট বা বাকবৈদগ্ধ্যের চুমকি বসিয়ে পাঠক মনে চমক লাগিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধে ও ছোটগল্পে প্যারাডক্স ও এপিগ্রাম লক্ষ্য করা যায়।

নানা জাতীয় শব্দের ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা তত্ত্বেও তাঁর ভাষা ভেঙ্গে পড়েনি। শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রভব আছে তাঁর ভাষায়। বুদ্ধির খেলা, শ্লেষ, বক্রোক্তি—বীরবলী রীতিতে অনন্যতা দান করেছে। তাঁর প্রবন্ধের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুশাসনে না থেকে যদৃচ্ছাচারণ করেন। দীর্ঘ ভূমিকা, অনেক শিথিল সম্পর্কিত প্রসঙ্গ ঘুরে, তবে নির্বাচিত বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য থেকে তাঁর দীপ্ত মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কিত বিতর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁর মনন কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়।

'সবুজপত্রে'র প্রকাশের আগে প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের হাওয়া বদলের প্রয়োজন আছে। লেখার ভাষাকে মুখের ভাষার নিকটস্থ করার যে শর্ত অর্থাৎ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান—তা তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর অভিজাত মন কথ্যরীতির লৌকিক রূপটি গ্রহণে অক্ষম ছিল। ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের হেরফের ঘটিয়ে তাঁর গদ্যকে সাধুরীতির পর্যায়ে রূপান্তরিত করা যায়। তাঁর চলিত রীতি—কথ্য বাংলা নয়।

'সবুজপত্রে'র পরেই 'কল্লোলে'র আবির্ভাব। 'কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা পূর্ববর্তী লেখকদের প্রতি বিদ্রোহ জানিয়ে নেমেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী লেখকরা সাহিত্যকে উচ্চ সমাজের জন্য তৈরী করেছিলেন। সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা সাহিত্য রচনা করেননি। বিষয়বস্তু এবং ভাষার মধ্যে 'কল্লোল'-গোষ্ঠী নতুনত্ব আমদানি করলেন। গ্রাম্য মানুষের বা শহরের নিম্ন জাতীর মুখের ভাষাকেই সাহিত্যের বাহন করলেন। ফলে ভাষা অনেক জীবন্ত ও সরস হল। লৌকিক জীবন থেকে উদ্ভূত ইডিয়ম তাঁরা সাহিত্যে প্রয়োগ করলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এবং লেখনভঙ্গির নতুনত্ব—বাংলা গদ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করল।

এখানে যে সকল গদ্য শিল্পী অর্থাৎ রামমোহন থেকে যাঁরা বাংলা গদ্যকে লালন করেছেন, তাঁদের সকলের ব্যক্তিত্বের ছাপ বাংলা গদ্যে পড়েছে। প্রত্যেক লেখকের লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা করে চেনা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতবর্গের হাতে বাংলা গদ্যের বিকাশ সূচিত হয়েছিল। তারপর বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধু গদ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং চলিত গদ্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের পথ বেয়ে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীতে উত্তরণ। কিন্তু গদ্য সাহিত্যের এই ধারাপথে একটি অতি উজ্জ্বল নাম বিনয় সরকার আজও উপেক্ষিত।

—:—

—ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—

ক) বিনয় সরকারের জীবন ও জীবনী

খ) রচনাবলীর তালিকা



[illegible] Bengal [illegible]
Library
[illegible]

* * * * *

।। ক ।। বিনয় সরকারের জীবন ও জীবনী

বাংলাগদ্যে বিনয় সরকারের অবদান সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্-লগ্নে যে জীবন এই সৃষ্টির মর্মমূলে আছে, তা সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন। তাই এ অধ্যায়ে বিনয় সরকারের জীবন ও জীবনী এবং তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা কাম্য।

'Talent' আর 'Genius'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'প্রতিভা।' ইংরেজীতে এই দুটি শব্দের পার্থক্য করা হয়েছে এইভাবে—**"Doing easily what others find difficult is talent, doing what is impossible for others is genius."** [১] এই রকম বহু উক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আছে। **"Genius must be born, it can never be taught".**[২] —এইরকম ধারণা ভারতে প্রচলিত। বিরল প্রতিভা তৈরী করা যায় না, এটা জন্মসিদ্ধ ঘটনা। এই Genius দুই ধরণের হতে পারে। "একটি কর্ম ও আবেগ তথা ভক্তির পথ ধরে প্রবল বেগে বিশেষ বিশেষ খাতরেখা-প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায় দল ধরে চলে বিশেষ মতবাদের তটবন্ধনে যা সুরক্ষিত হয়ে উত্তরধারা বাহিকতা রেখে দেয়। আর একটি বুদ্ধি-জ্ঞানকে আশ্রয় করে বারিগর্ভ মেঘের মতো, যতদিন সম্ভব, বিপুল বর্ষণে সমকালের জিজ্ঞাসু মনের চিত্ত ক্ষেত্রকে সরস ও উর্বর করে নব-নব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়—সম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য কিন্তু তেমনটা করে না, গড়ে না—কেবল বুদ্ধি ও চিত্তের অবাধ মুক্তির সুযোগ করে দেয়। এরা আদর্শনিষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং একদিক থেকে আচার্যও। - - - অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরল প্রতিভা বা জিনিয়াস।"[৩]

এই জগদ্বিখ্যাত পন্ডিত বিনয়কুমার সরকার মালদহের ভূমিপুত্র। জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর। চাকরীর অন্বেষণে তাঁর পিতা সুধন্যকুমার সরকার এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ঢাকার পৈত্রিক বাসস্থান ছেড়ে মালদহে আগমন করেন এবং মুনসেফী আদালতে কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলায় খুব পারদর্শী ছিলেন এবং সেই সময় থেকেই পরবর্ত্তীকালে অসাধারণ মানুষ হবার কিছু লক্ষণ তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তির সঙ্গে সময়নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা এবং কার্য্য সম্পাদনে শৃঙ্খলা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী, সহিষ্ণু এবং স্বাবলম্বী। নিজের অসুবিধা এবং দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সবসময় সচেষ্ট থাকতেন।

বিনয় সরকার মালদহ জেলা স্কুল থেকে ১৩ বছর বয়সে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এরপর সরকারী বৃত্তি পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। এফ. এ পরীক্ষার ঠিক আগে অসুস্থ হয়ে যাবার কারণে ঐ পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেন। ঐ কলেজ থেকেই ১৯০৫ সালে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের অনার্সে সর্বোচ্চ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে বি.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ঈশান বৃত্তি" লাভ করেন।

।। ২।। স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

স্বামী বিবেকানন্দ, ডন সোসাইটি, ডন পত্রিকা, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব বিনয়কুমারের ওপর পড়েছিল। তিনি সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময়ে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সতীশবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বাংলার যুবকদের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক মুক্তি আনার উদ্দেশ্যে দেশ গঠন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিনয়কুমার তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শে দীক্ষিত হয়েই তিনি দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন।

"ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় বিখ্যাত মনীষীদের গীতার বিশ্লেষণে ও নৈতিক ব্যাখ্যায় তিনি জীবনগঠনের তিনটি বীজ-মন্ত্র লাভ করেন। এগুলি হল স্বদেশ-সেবা, নিষ্কাম-কর্ম ও স্বার্থত্যাগ।" [৪] তাঁর স্বদেশসেবার প্রথম ধাপ হল ১৯০৫-১৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়া।

বিনয়কুমার এম.এ এবং আইন ক্লাসে ১৯০৬ সালে প্রবেশ করেন। বৃটিশ সরকার সে যুগে মেধাবী ছাত্রদের সরকারী চাকরী দিয়ে নিজেদের বশীভূত করতেন। বৃটিশ সরকারের এই নীতি বিনয় সরকারের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। তাঁরা তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রদান করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই পদে অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি এই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। এই পদ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে যে দৃঢ় মনোবল

প্রকাশিত হয় সেজন্য দেশবাসীরা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছিল। এরপর সরকার তাঁকে কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য সরকারী বৃত্তি দিতে চাইলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। এই সকল ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর দেশের প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্যবোধ প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বিনয় সরকার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের সময় ১৯০৬ সনে এম. এ পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইসচ্যান্সেলর এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি ইংরাজীতে এম. এ পরীক্ষা দেন এবং পঞ্চম স্থানাধিকারপ্রাপ্ত হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করেন। তিনি যে মেসবাড়ীতে ছিলেন সেখানে সতীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মোক্ষদা সমাধ্যায়ী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ থাকতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী, বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল, দর্শনশাস্ত্রবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ। এছাড়া ঐ বাড়ীরই নীচের তলায় 'ফিল্ড্ এন্ড ফ্যাকাডেমি ক্লাব' ছিল। সেখানে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দানবীর রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক ইত্যাদি ব্যক্তিগণ আড্ডা দিতেন। বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত বিনয়কুমারের সহজাত স্বদেশপ্রেম এই সকল ব্যক্তিগণের প্রভাবে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

স্বদেশী আন্দোলনের আনুষঙ্গিকরূপে 'জাতীয় শিক্ষা'র দাবি নিয়ে দেখা দেয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং এর পরিচালনাধীন 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল' (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে)। এই কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং তত্ত্বাবধায়ক হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অরবিন্দ ঘোষ সেদিন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"Work that she way, prosper. Syffer that she may rejoice. All else is contained in that single advice."—তার মধ্যে বিনয় সরকার নিজের আত্মার মর্মবাণী শুনতে পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও যশের মুকট পরা শ্রেষ্ঠ ছাত্র—বিনয় সরকার—ন্যাশনাল কলেজে ঢুকলেন মামুলি সেবক হিসাবে। তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর তখনকার অবস্থা ছিল, "খালি পা আর খালি গা। জামাও নাই জুতাও নাই। বিলকুল কপর্দকহীন।" তাঁর অনুপ্রেরণায় ও দৃষ্টান্তে তাঁর ছাত্রেরাও অনেকে খালি গায়ে, খালি পায়ে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। "স্বদেশসেবা আর স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেছেন এবং দেশের মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি তিল-তিল করে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।" [৫]

।। ৩ ।। শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ ও জাতীয় শিক্ষা প্রচার

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষাদানের সঙ্গে বিনয় সরকার গবেষণা কার্য, গ্রন্থ রচনা, বক্তৃতা দান এবং মফঃস্বল অঞ্চলে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করতেন। ১৯০৭-০৮ সালে ঢাকা ও মালদহ জেলায় কয়েকটি জাতীয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যালয়গুলিতে কারিগরী বিভাগ ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি' এবং 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' স্থাপন করেন।

বিনয় সরকার জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়েও গবেষণা চালিয়েছিলেন। ১৯১০-১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি উত্তরবঙ্গে 'গম্ভীরা' আন্দোলন চালিয়েছিলেন। শ্রীহরিদাস পালিতকে দিয়ে "আদ্যের গম্ভীরা" নামে একটি বই লিখিয়েছিলেন।

এই সময় তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেন—খালি পায়ে এবং শুধু উত্তরীয় গায়ে দিয়ে। সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করতেন। সার্ট, পাঞ্জাবী বা কোট ব্যবহার করতেন না।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "মালদহ সমাচার" পত্রিকায়। ঐ বছরই জুলাই মাসে কলিকাতার "অমৃতবাজার" পত্রিকায় ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "গৃহস্থ" মাসিক পত্রিকাতেও তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর চিন্তাধারা ও লিখনভঙ্গি ছিল অভিনব।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রধানত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু মাতৃভাষায় বইয়ের অভাব ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই বিনয় সরকার এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আবহাওয়ায় তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। এই সময় তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল—'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' (১৯০৭ খৃঃ), 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' (১৯১০ খৃঃ), 'প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা' (১৯১০ খৃঃ), 'ভাষা শিক্ষা'

(১৯১০ খৃঃ), 'শিক্ষা সমালোচনা' (১৯১২ খৃঃ), 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' (১৯১২ খৃঃ), 'সাধনা' (১৯১২ খৃঃ) ইত্যাদি। এছাড়া ইংরাজীতে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের সাত-আটখানা বই প্রকাশিত হয়। তিনি যে শিক্ষা পদ্ধতির খসড়া দিয়েছিলেন, তার মূল কথা হল—মস্তিষ্কের শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। "ডন" পত্রিকায় তাঁর এই বইগুলি সম্পর্কে অভিমত দেখা যায়—**"বাবু বিনয়কুমার সরকার, এম. এ, শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শিক্ষা পরিষদের শিক্ষামূলক তালিকায় "পেডাগগিক্‌স্" অন্তর্ভুক্ত। যদিও এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন ক্লাস আরম্ভ হয় নাই, তবুও শিক্ষকমন্ডলী ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। বাবু বিনয়কুমার সরকার এই বিষয়ে যে শিক্ষকদের 'হ্যান্ডবুক্' প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন"।** [৬]

তিনি বুঝেছিলেন দেশের অগ্রগতির জন্য চাই যন্ত্রশিল্পের প্রসার। এই কারণেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত এগারটি বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী, কারখানা ও গবেষণাগার ছিল। বাংলাদেশে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কম। এইজন্য তিনি রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সংশ্লিষ্ট পনের জন ছাত্রকে সংগৃহীত অর্থে শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিজ্ঞান শেখানোর জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। এদেশে অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন এবং শিল্পশিক্ষা বিস্তারে তিনি আজীবন প্রয়াসী ছিলেন।

বিনয় সরকার যেমন দেশের শিক্ষা-উন্নয়নের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তেমনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিগড় অবিলম্বে ছিন্ন করার জন্যও বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

।। ৪ ।। গৃহস্থ পত্রিকার পরিচালনা

১৯১১ খৃঃ থেকে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত গৃহস্থ মাসিক পত্রের পরিচালনা তাঁর এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই মাসিক পত্রে বিশ্বসংস্কৃতি, আর্থিক উন্নয়ন ও সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হত। তাঁর বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার সূচনা এখানে হয়েছিল বলা যায়। তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সী বিনয়কুমারকে কাশীর "ভারত ধর্মমহামন্ডল" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে "বিদ্যাবৈভব" উপাধিতে ভূষিত করেন।

।। ৫ ।। বিশ্ব-পর্যটনের যুগ

১৯১৪ সন থেকে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ছিল তাঁর বিশ্ব পর্যটনের যুগ। তাঁর বিশ্ব পরিক্রমার কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। বিদেশী ডিগ্রী অর্জনের কোন স্পৃহা ছিল না। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র ছাত্রদেরকে আমেরিকা প্রেরণের পর বিনয়কুমারের বিভিন্ন দেশভ্রমণের এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন ভারতের বাণীপ্রচার ও বিদেশে ভারতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী প্রচার। ভারতের বাণীপ্রচার ও বিদেশে ভারতীয় মানমর্যাদা বৃদ্ধি ছিল তাঁর লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল—বিদেশে ভারতের জন্য সুযোগ সৃষ্টি। তৃতীয় লক্ষ্য ছিল—পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভারতীয় উন্নতির স্বার্থে নিয়োগ।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জাহাজযোগে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। সেই জাহাজে সঙ্গী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমেরিকা যাত্রার পথে তিনি মিশর, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড ভ্রমণ করেন। দেশ ভ্রমণকালে তাঁর লেখনী ক্ষান্ত হয়নি। তিনি যে সকল দেশ ভ্রমণ করতেন সেই দেশের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 'বর্তমান জগৎ' নাম দিয়ে লিখতেন। তাঁর এই সব রচনা সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। পরে সেগুলি গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হত।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনীগুলি হল—"বিশ্বশক্তি", "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র", "মিশর বা কবরের দেশে দিন পনের", "ইংরাজের জন্মভূমি" এবং একটি অনুবাদ গ্রন্থ "নিগ্রোজাতির কর্মবীর" ইত্যাদি। হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব বা সাংসারিক ভিত্তি সম্বন্ধে বিনয়কুমারের ব্যাপক গবেষণার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয় "Positive Background of

Hindu Sociology"। "Positive" শব্দটা ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত কাঁতের মার্কামারা পারিভাষিক। কাঁৎ'-দর্শনে 'পজিটিভ্' শব্দের অর্থ সংসারনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ বা জাগতিক শব্দের ঠিক বিপরীত। বিনয়কুমারের এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুজাতির সংসারনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, লড়াইনিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ মূর্তি জ্বল জ্বল করছে। এই গ্রন্থটি চারখন্ডে সমাপ্ত।

তিনি অত্যন্ত অল্প বয়সে দেশে-বিদেশে বিদ্বন্মন্ডলীর কাছে পরিচিত ও সমাদৃত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "শুক্রনীতি" এবং "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউন্ড অব্ হিন্দু সোশিওলজি" ইত্যাদি গ্রন্থের কপি ইউরোপ এবং আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রৌঢ় অধ্যাপকগণ ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করে গ্রন্থকারের বিদ্যাবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেন। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক জন ডুয়ী ও ধনবিজ্ঞানী সেলিগম্যান এতই আকৃষ্ট হন যে, তাঁরা এক যুগ্মস্বাক্ষরিত ইস্তাহারে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানান— তাঁরা যেন প্রাচ্য দেশীয় জ্ঞানরাজ্যের এই খ্যাতনামা প্রতিনিধির বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও বিনয়কুমারের কাছে আমন্ত্রণ লিপি আসতে থাকে এবং তিনি সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করেন।

বিদেশে থাকাকালীন তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান নির্দিষ্ট করায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আবার বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে বাঙালীর কাছে পরিবেশন করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে থেকেও যে তিনি স্বদেশের কথা চিন্তা করতেন তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলি। তাঁর বিদেশের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য এইরকম ঃ 'আমি বন্দেমাতরম্-এর তিলক কেটে গোটা ভারতকে ঘাড়ে করে নিয়ে ফিরেছি, দুনিয়ার সকলকে শুনিয়েছি আমাদের ছোকরারা এই কাজ করছে, পন্ডিতেরা এই কাজ করছে, অমুক পরিষদ এই কাজ করেছে। যুবক বাংলার আর যুবক ভারতের বিজ্ঞান সভা, সাহিত্য সভা, শিল্প-আন্দোলন, মজুর আন্দোলন ইত্যাদি কিছুই আমার বিদেশী বোলচালে, বক্তৃতার বা প্রবন্ধ রচনায় বাদ পড়েনি, এইভাবে দুনিয়ার সর্বত্র লেখাপড়া চালিয়েছি। আমার বিশ্বাস—আমি কোথাও আমার জাতির আমার স্বদেশের ইজ্জৎ মারিনি। নিজে গিয়ে বিদেশ দেখে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধি বা কর্মদক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু বাঙালী জাতের চাকর আমি। আমার পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব। এক সঙ্গে পাঁচ সাত হাজার বাঙালীকে গোটা দুনিয়া দেখিয়ে এনেছি। বাঙালী জাত একসঙ্গে বর্তমান জগৎ দেখেছে।" ("নয়াবাংলার গোড়াপত্তন," ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৫-৪৩২)।

বিনয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সে দেশের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি গদর পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। পরে গদর পার্টির ধরপাকড় শুরু হলে তিনি পিকিং চলে যান। সেখানে তাঁকে অর্থকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল।

'তাঁহার প্রগাঢ় পান্ডিত্য, বহুমুখী প্রতিভা, বিরল সততা, অসাধারণ ধীরতা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য তিনি আমেরিকার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে এমন একটা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এসেছিলেন যাহার ফলে অনেক সময় তিনি এদেশ হইতে চিঠি লিখিয়া দিলে ভারতীয় ছাত্রগণ সে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজে প্রবেশের ও বৃত্তিলাভের সুযোগ পাইত।" [৭]

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বিনয় সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্টের অর্থনীতি এবং তাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কারণগুলো বিশ্লেষণ করার সুযোগ পান। এই সময় তিনি হাভার্ড, ইয়েল, পেনসিলভানিয়া, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকের কাজ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ে 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখেছেন। পরে সেটি 'ইয়াঙ্কিস্থান' নামে প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি সেখান থেকে চীন ও জাপান যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে তিনি ইউরোপে ১৯১৮ সালের শেষের দিকে ফিরে গেলেন। প্রথমে তিনি ঘাঁটি গাড়লেন জার্মানীতে। জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন ধনবিজ্ঞানের অতিথি অধ্যাপক। সেখান থেকে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতেন। ১৯২০ সালে ফ্রান্সের প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। এটা তাঁর ইউরোপ গমনের গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ বলতে হবে। এই বছর তিনি 'Societe d` Economic Politique de Paris'-এর সংবাদদাতা-সদস্য নির্বাচিত হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন যেমন সে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতেন তেমনি ইউরোপে অবস্থানকালেও তিনি পিটস্‌বার্গ, লাইপজিগ, মিউনিক ও রোম বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের সভায়ও বক্তৃতা দিতেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং বক্তৃতা দেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। বার্লিনেও "Deutsche Gesells- chaft" আর Deutsche Morgenlandische Gesellschaft" নামে দুটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। ১৯২১ সালে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েছিলেন তিনি। তিনি ফ্রান্সে ফরাসী ভাষায় এবং জার্মানীতে জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দিতেন।

লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম "একাডেমি অব্ ফ্রান্স"-এ বক্তৃতা দেন।

।। ৬ ।। প্রাবন্ধিক ও ভাষা-বিশেষজ্ঞ

এই যুগে তাঁর বিভিন্ন মৌলিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ পায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের 'School and Society' পত্রিকায়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর 'International Journal of Ethics' পত্রিকায়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Political Science Quarterly' পত্রিকায়, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের 'Scientific Monthly' পত্রিকায়, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রোমের 'Giornale degli Economisti e. Rivista di Statistica' পত্রিকায়, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের 'Seances et Travaux de I' Academic des scienecs Morales et Politigues' পত্রিকায়, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের 'Revue de synthese Historique' পত্রিকায় এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের যথাক্রমে "Deutsche Rundschau" ও 'Mitteilungen Vereins Deutscher Ingenieure' পত্রিকায় এবং আরও অন্যান্য পত্রিকায়।

তিনি বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ফ্রান্সে, জার্মানিতে, ইতালিতে যথাক্রমে ফরাসী, জার্মান এবং ইতালি ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁর ইতালি ভাষা শিখতে এক মাস, ফরাসী ভাষা শিখতে দুই মাস এবং জার্মান ভাষা শিখতে তিন মাস সময় লেগেছিল। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দেন তখন তাঁর জার্মান ভাষার উচ্চারণ, কথনভঙ্গি ও অনর্গলতা লক্ষ্য করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা সেকস্‌পীয়র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ব্র্যান্ডেল সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি মন্তব্য করলেন—"অধ্যাপক সরকার এমন একজন ভারতীয়—যিনি পদ্ম পত্রের উপর ঘুমান না। তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন আমরা অনুভব করতে পারলাম যে তার উচ্চারিত প্রতিটি কথাই অগ্নিগর্ভ। তাঁর চোখ দুটি দিয়ে দীপ্তির স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলেননি। কোন কোন সময় তা এত তিক্ত ছিল যা গলাধঃকরণ করা যায় না। কিন্তু প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারলেন যে এই মহান মানুষটির অন্তরে রয়েছে মানবজাতির জন্য জ্বলন্ত ভালবাসা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পাশে এশিয়ার যোগ্য স্থান কি হবে, এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়সম্পন্ন ছিলেন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্য সমমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই তাঁর কাম্য। শ্রোতাদের তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য গভীরভাবে ভাববার মতো চিন্তার খোরাক্ দিয়ে গেলেন।" [৮]

বিনয় সরকার আমেরিকা, ফ্রান্স জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সম্পর্ক বিষয়ে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির ওপর ভিত্তি করে "The futurism of India" গ্রন্থ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এছাড়া তাঁর আরও অনেক বাংলা, ইংরাজী, জার্মান, ইতালি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই যুগে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সুইজারল্যান্ডে যান এবং সে দেশের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস ও লা ফার্গের জীবনী বাংলায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে তিনি "Collegian" পত্রিকার জন্য নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ পাঠাতেন।

এই সকল ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সেই যুগে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার জগতেও প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মেছিল। যে যুগে ইয়োরামেরিকায় ভারতবাসীর পরিচয় ছিল 'গোলামের বাচ্চা' বলে, সেই যুগে শক্তিধর বিনয় সরকার নিজ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জোরে বিদেশে ভারতের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তা ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় সন্দেহ নেই।

126684
১৫
1 6 AUG 1999
North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

।। ৭ ।। পরিণয়-প্রসঙ্গ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনয় সরকার যখন জাহাজে লিভারপুল থেকে আমেরিকা রওনা হন, তখন এক অষ্ট্রিয়ান তরুণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই তরুণীর নাম ইডাদেবী।

ইডাদেবীর জন্মস্থান অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত তিরোল। তিনি একবছর উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। ভিয়েনা শহরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি ইন্‌স্‌ব্রুক বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং পরে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে একটি বৃত্তি পান। ইংল্যান্ডে কয়েক মাস থাকার পরেই যুদ্ধ শুরু হয়। ইডাদেবী স্বদেশে ফেরার জন্য ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ইউরোপগামী শেষ জাহাজটি চলে যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর আত্মীয়রা থাকায় তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন।

বিনয়কুমার ইডাদেবীকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। তিনি প্রতিদিন জাহাজে শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও লালাজীর অনুরোধে "বন্দেমাতরম্", "আমার সোনার বাংলা", এবং "একলা চলো রে" ইত্যাদি গানগুলি গাইতেন। শেষোক্ত গান দুটির ইংরাজী অনুবাদও তিনি করেছিলেন। যে শক্তির দ্বারা বিনয়কুমার সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন সেই শক্তিই ইডাদেবীর জীবনে পরিবর্তন আনে—তিনি ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

২৪ শে নভেম্বর জাহাজ আমেরিকায় পৌঁছায়। বিনয়কুমার ন্যুইয়র্কে হাভার্ড ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যান এবং ইডাদেবী ভগ্নহৃদয়ে ক্লিভল্যান্ডে তাঁর পিতার পিসীর বাড়ী চলে যান। ক্লিভল্যান্ডে পৌঁছে তিনি বিনয়কুমারকে প্রতিদিন চিঠি লিখতেন এবং বিনয়কুমারও তাঁকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বই পাঠাতেন। এইভাবে ইডাদেবী ভারতবর্ষের বহু মহাপুরুষদের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত "A study of an Eastern home" নামে একখানি বই লালা লাজপৎ রায়ের কাছ থেকেও তিনি পেয়েছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ইডাদেবী বিনয়কুমারের একটি চিঠি পান। তার সারমর্ম্ম ছিল যে তিনি জাপান যাওয়ার জন্য সানফ্রান্‌সিসকো রওনা হচ্ছেন। যাওয়ার সময় ক্লিভল্যান্ড হয়ে যাবেন। ইডাদেবী তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য স্টেশনে যান। বিনয়কুমার ট্রেন ছাড়ার আগে যে কথা তাঁর সঙ্গে বলেছিলেন তা **"Never forget the song Bande Mataram that I taught you on the ship. They will be the last words that I shall utter when I die"** [৯] এই কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বিনয়কুমার মৃত্যুর আগেও স্বদেশের প্রতি চিন্তা ত্যাগ করতে পারেন নি। ইডাদেবীকে মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথাটি হল **"Do you remember how I taught you to sing Bande Mataram? His heart always throbbed for his homeland India."** [১০]

এরপর বিনয়কুমারের সঙ্গে ইডাদেবীর পুনর্বার সাক্ষাৎ হয় যখন বিনয়কুমার পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে তিনি ইডাদেবীকে তাঁর টাইপ-রাইটারটি দিয়ে যান। বিনয়কুমার তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইডাদেবীকে টাইপ করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। বিনয়কুমারের সহস্রাধিক পাণ্ডুলিপি টাইপ করার সময়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন ইডাদেবী অধ্যাপক সরকারের "The Bliss of a moment", "Chinese Religion Through Hindu Eyes", "Love in Hindu literature" গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি টাইপ করেন। এই গ্রন্থগুলি পড়ে তাঁর যে অনুভূতি হয়েছিল তা তিনি "My life with Prof Benoy Kumar Sarkar" গ্রন্থটিতে প্রকাশ করেছেন। **"How much could I learn from these writings! I admired his depth of knowledge and his spirit of free thought. The pages of his writings were new discoveries for me"** [১১]

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়কুমার ইডাদেবীর বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হননি। কারণ আর্থিক স্বাচ্ছল্য তিনি ইডাদেবীকে কোনদিনই দিতে পারবেন না এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছেও তিনি অপ্রিয়। তবে ইডাদেবীর একান্ত আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হন। ইডাদেবীর জননী তিরোলে বিনয়কুমারকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এরপর বার্লিনে হিন্দুমতানুসারে তাঁদের পরিণয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে বার্লিনের সব ভারতীয়ই উপস্থিত ছিলেন। বিনয়কুমার ও ইডাদেবী দুজনেই জার্মানীতে বিদেশী থাকার জন্য তাঁদের বিবাহ সিভিল ম্যারেজ



আচার্য বিনয়কুমার সরকার এবং সহধর্মিনী ইডা সরকার

আইনানুমোদিত হয়নি। তাই অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে গিয়ে সিভিল ম্যারেজ আইন অনুসারে তাঁদের বিবাহ অনুমোদিত করিয়ে নিতে হয়। ১৯২২ সালের ১৪ই নভেম্বর এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরে তিনি ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি পরিভ্রমণ করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে "Chinese Religion Through Hindu eyes", "Love in Hindu Literature", "Hindu achievements in Exact science", ১৯২০ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস ও লাফার্গ—এই তিনজনের জীবনীর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, 'নবীন এশিয়ার জন্মদাতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে "Futurism of young Asia" (Berlin), "The Aesthetic of young Asia", 'ইয়াঙ্কিস্থান", "The Political Institutions and Theories of the Hindus" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী থেকে ফিরে ইতালির বোলজানো নামক স্থানে প্রায় আট মাস থাকেন। এখানে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল কন্যা ইন্দিরা জন্মগ্রহণ করেন।

।। ৮ ।। ভারত-প্রত্যাবর্তন

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বোম্বাই নগরীতে আসেন। দীর্ঘ এগার বছর পর তিনি স্বদেশে ফেরেন। বিনয়কুমার বোম্বাইতে তিন সপ্তাহ থাকার পর এলাহাবাদ হয়ে লক্ষ্ণৌতে রাজা শিবপ্রসাদ গুপ্ত-র কাছে যান। এই সাক্ষাতের সময় শিবপ্রসাদ তাঁর 'কাশী বিদ্যাপীঠ' সংস্থাপন ও সংবর্দ্ধনে সহায়তা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বিনয়কুমার তাঁর অনুরোধ রাখতে পারেননি তাঁর বাংলাদেশের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের জন্য। তিনি বারাণসী থেকে কলিকাতা যাবার জন্য রওনা হন এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এসে পৌঁছান।

বিনয় সরকার বিদেশে থাকাকালীন এদেশবাসীর স্বার্থে যে সমস্ত কাজকর্ম করেছিলেন তা এদেশের লোকজন সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'যাদবপুর বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট' এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জানায়। কলিকাতায় এসে ৪৫ নং, পুলিশ হস্‌পিট্যাল রোডের দোতলার ফ্ল্যাটে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত এই ফ্ল্যাটেই বাস করে গেছেন।

বিনয় সরকার কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলে, কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ আসে তাঁর কাছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার জন্যও প্রস্তাব আসে। অবশেষে আর্থিক অনটন দূরীভূত করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রক্ষা করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের লেকচারার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন।

।। ৯ ।। শিক্ষক বিনয়কুমার

বিনয়কুমার 'নিরক্ষর' ও 'অশিক্ষিত' শব্দ দুটিকে একার্থক বিবেচনা করতেন না। তিনি এম. এ ক্লাসে ছাত্রদের পড়াবার সময় প্রায়ই বলতেন যে লেখাপড়ায় পাশ ফেল ছাড়াও জীবনে হাজার রকমের পাশ-ফেল আছে। "**The last boy in the class is not the worst figure in Bengal. Perhaps he is the most creative**—এই হল তাঁর উক্তি।" [১২] তিনি বলেছেন **"নিরক্ষর বলিলে আমি লোকগুলিকে অশিক্ষিত বলি না, নিরক্ষর লোকেরাও বেশ শিক্ষিত হইতে পারে। ..... কাজ করিতে করিতে প্রত্যেক লোকই, সে যত বড় নিরক্ষর হউক না কেন, দিনের পর দিন তাহার মগজ চষিয়া যাইতেছে। কাজের সঙ্গে সংস্পর্শে মগজ চষার ফলে তাহার জ্ঞান বাড়িতেছে। প্রতি মুহূর্তে সে সজ্ঞানে সজাগভাবে মাথা খেলাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। কাজেই বাংলাদেশের যে সকল স্বল্পনারী এখনও লিখিতে পড়িতে পারে না তাহাদিগকেও আমি শিক্ষিত জ্ঞানী চিন্তাশীল ও মস্তিষ্কজীবী স্বল্পনারীর তিতর গণ্য করিতে অভ্যস্ত।"** [১৩] অত্যন্ত সমাজসচেতন ও মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এই ধরণের উক্তি সম্ভব।

তিনি শিক্ষাজগতের কাছে বিশেষত ছাত্রদের কাছে ভালবাসা পেয়েছেন। **"বিনয় সরকারকে বাংলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি কিংবদন্তী হিসাবে পরিগণিত করা উচিত। - - - দেখেছি, বিনয় সরকার টেকনলজি বা সোসেও**

এর উন্নতির জন্য সবিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। টেকনলজির সহায়তাতেই ভারতে শিল্পবিপ্লব ঘটা সম্ভব, এবং তা ঘটাতেই হবে, এটি ছিল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। - - -তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ, খাঁটি মাষ্টার; আমি বলি গ্র্যান্ড মাষ্টার।" [১৪]

অধ্যাপক সরকারের পড়ানোর স্টাইল ছিল অন্যান্য অধ্যাপকদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর ধার ধারতেন না। তিনি যে বিষয় পড়াতেন সেই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করতেন। **"তাঁকে কোন বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপক না বলে Humanities বা মানবতা-শাস্ত্রের অধ্যাপক বললেই যথার্থ হয়। - - -বিনয় সরকারের নানা বিষয়ে দৃঢ় মত ছিল। পড়াবার সময় তিনি দৃঢ়তা সহকারে সেই মত প্রচার করতেন। তাঁর নিজস্ব মত থাকা সত্ত্বেও তিনি ছাত্রদের তাদের নিজস্ব মত গঠন ও পোষণ করতে বলতেন, এমনকি এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। - - - তিনি চাইতেন ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখবে এবং সেইভাবে নিজের মতামত গঠন করবে। - - -তাঁর মত ছাত্রদরদী অধ্যাপক আমি আমার জীবনে খুব বেশী দেখিনি।"** [১৫] তিনি ছাত্রদের পথপ্রদর্শকও ছিলেন।

ছাত্রদের গবেষণার পথ নির্দেশ করে দিয়ে প্রয়োজনীয় বইয়ের নামও জানিয়ে দিতেন বিনয় সরকার তাদের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাও করে দিতেন। তাঁর কাছে গবেষণার ডিগ্রিটাই সব কিছু নয়, গবেষণায় যে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হবে তার ফলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। নূতন ও যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব দেখতে পেলে তিনি আনন্দিত হতেন।

তিনি ক্লাসে ফলিত সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বিশেষভাবে জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, অপরাধের শাস্তি ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ওপর জোর দিতেন। অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ঘটনাবলীও আলোচনা করতেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওয়ার্লড ইকনমিক ইনষ্টিটিউট' স্থাপন করেন এবং ডি. ফিল. উপাধির গবেষকদের একটি পাক্ষিক বৈঠক স্থাপন করেন। ধনবিজ্ঞান বিভাগে আগে কেবল ইংরেজী বই ছিল, কিন্তু তাঁরই চেষ্টায় দেশী-লেখকদের বই এম. এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়।

বিনয়কুমার অন্যান্য বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করতেন ও ছাত্রদের নতুন নতুন আলোকের সন্ধান দিতেন। অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা বুঝতে পারত না যে তিনি ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

।। ১০ ।। "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ

বিনয় সরকার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্বগত ও ফলিত অর্থনীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে "আর্থিক উন্নতি" নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্র পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে ঐ মাসিক পত্র ও ইংরেজী "Journal of Bengal National chamber of Commerce"- এর সম্পাদনা করতেন।

টাকার বাজার, বীমা, কৃষি প্রচেষ্টা, রাষ্টায়ত্তকরণ, ব্যাঙ্কিং, রেলব্যবস্থা, জাহাজ চালনা ইত্যাদি সম্পৃক্ত অর্থনীতি, অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ণ, কারিগরি শিক্ষা, পৌরসভা পরিচালনা এবং নাগরিকদের অন্যান্য প্রকার কল্যাণকর বিষয়ের মুখপত্র হিসাবে 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই মাসিক পত্রের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগে—বাংলাদেশের কৃষক, তাঁতী, জেলে ইত্যাদি শ্রেণী থেকে সমাজের উচ্চতর শ্রেণী অর্থাৎ ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের জীবনধারণের মান সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হত। দ্বিতীয় বিভাগে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা করা হত। তৃতীয় বিভাগে—বিভিন্ন দেশে সরকারী অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করা হত। ভারতীয়গণের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব ও সুবিধাজনক কিনা তাও আলোচিত হত। চতুর্থ বিভাগে—বিশ্বের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি, রসায়নশাস্ত্রী, অর্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ হত প্রকাশিত।

বিনয়কুমার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। যেমন— "Economic Development", "Politics of Boundaries", "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ। এছাড়া আরও গ্রন্থ যেমন—"Hindu Politics in Italian", "দুনিয়ার আবহাওয়া", "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন", "Shiping Railway Policies in Economic Legistation," "The law and the cultivator, the example of France" প্রকাশিত হয়।

।। ১১ ।। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থপ্রচার

১৯২৬-২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রাচ্য কলা সমিতির "রূপম" পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লেখেন। 'চারুকলা' সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন হল তাঁর এই প্রবন্ধগুলি।

১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার অর্থনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য কংগ্রেস' ও অন্যান্য বিভিন্ন সভাসমিতিতে যোগদান করেন।

এছাড়া ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। যেমন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার মাজুতে, নদীয়া জেলার শান্তিপুরে, জুন মাসে শিলং -এ, আগস্ট মাসে ঢাকায় বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ভারত প্রত্যাবর্তন করেন—তখন এবং তার পরেও এদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর এবং ১৯২৭ সাল পর্যন্ত যে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেন সেই সকলের ওপর ভিত্তি করে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে "Greetings to young India" প্রকাশিত হয়। "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা", "The Positive Background of Hindu Sociology" এবং ধনবিজ্ঞান সম্পর্কিত চৌদ্দটি রচনা প্রকাশিত হয়।

১৯২৬-২৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর 'বম্বে ক্রনিকল', 'বোম্বাই সমাচার', মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়ান রিভিয়ু', পাটনার 'সার্চলাইট', কলিকাতার 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট ফরোয়ার্ড', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'আত্মশক্তি', 'বাংলার কথা' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধে ঐ সকল পত্রিকার জন্য শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। ঐ সময় তিনি জার্মানীর (কিয়েল) "Weltwirtschaftliches Archi" পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে জার্মান ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক বইয়ের সমালোচনাও লিখে দিতেন।

তিনি এই সময় বিদেশে যেতে ইচ্ছুক ছাত্রদের এবং ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিতেন। এতে তারা উপকৃত হতেন।

।। ১২ ।। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেন। তিনি এখানে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে গবেষণা চালাতে গবেষকদের সাহায্য করতেন। শিবচন্দ্র দত্ত, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, বাণেশ্বর দাস, হরিদাস পালিত, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল ইত্যাদি গবেষক এই পরিষদের মধ্যে ছিলেন। এই পরিষদের উদ্যোগে 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' গ্রন্থ (১ম ও ২য় ভাগ) প্রকাশিত হয়।

এই পরিষদ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার করা, এই দুই বিষয়ে গবেষণা করা এবং বিশ্বশক্তির প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা।

এর পরে তিনি আরও ছয়টি পরিষদ ও সমিতি গঠন করেন। 'আর্থিক উন্নতি' ও এই সকল পরিষদের গঠন ও পরিচালনায় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা। পরিষদের অধিবেশনে ছাত্র, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, গবেষক প্রভৃতি ৩০/৪০ জন লোক উপস্থিত থাকতেন। সভায় যতক্ষণ কাজ চলত তার মধ্যে মাঝে

মাঝে বিনয়কুমার রসিকতাও করতেন। তিনি সহজ ও সরসভাবে সব বিষয়ের আলোচনা করতেন ফলে অল্পবয়স্ক ছাত্ররাও অমনোযোগী হতে পারতেন না।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও প্রকাশ করেন, যেমন—"ধনদৌলতের রূপান্তর।" এছাড়া তাঁর "বর্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য" গ্রন্থও এ সময়ে প্রকাশিত হয়।

।। ১৩ ।। দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে ট্রাভেলিং প্রফেসার হিসাবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ইতালি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া সপরিবারে ভ্রমণ করেন। তিনি ঐ সকল দেশের ব্যাঙ্ক পরিচালনা পদ্ধতি, বীমা আইন, কৃষিঋণ, অর্থনৈতিক গবেষণাগারগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। ১৯২৯-৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত জেনেভা'র জাতিসংঘ, শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক গবেষণাগারের কর্মকান্ড বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করতেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'Institute National Genevois'-এ ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিলানের 'Universita Bocconi' এবং পদুয়ার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালি ভাষায় বক্তৃতা দেন। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালি ভাষায় বক্তৃতা দেন। ঐ বৎসরই রোমে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা কংগ্রেসে'র অর্থনৈতিক শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইতালি ভাষায় প্রবন্ধ পরিবেশন করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র' এবং 'সুইট্‌সার্ল্যান্ড' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

।। ১৪ ।। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই বছর ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশ্বআর্থিক সঙ্কট ও শ্রম-আন্দোলন সম্পর্কিত মতামত প্রকাশিত হয়।

১৯৩২ সালে জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম-দ্বিশতবার্ষিক এবং গ্যেটের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেন। ঐ বছরই 'আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদ স্থাপন' করেন। এই সময়ে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন—'নয়াবাংলার গোড়াপত্তন', 'স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি', 'প্যারিসে দশমাস', 'ইতালিতে বারকয়েক', "Comperative Birth, Death and Growth rate" ইত্যাদি।

।। ১৫ ।। বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা-সংসদ ও অন্যান্য বিভিন্ন কাজ

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সরকার বাংলায় জার্মান-সংস্কৃতির প্রভাব এবং যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা সংসদ' স্থাপন করেন। এতে জার্মানিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়রা জার্মান-বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেতেন। ভারতপ্রবাসী জার্মান পন্ডিতগণও এই সংসদে মাঝে মাঝে জার্মানির বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করে যেতেন।

এই বছরই তিনি 'কলিকাতা-মালদহ সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতায় যে সকল মালদহবাসী আছেন বা থাকবেন তাঁদের সঙ্গে কলিকাতার বাঙালী, অ-বাঙালীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

ঐ বছর অধ্যাপক সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক পত্র 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে বিশ্ব অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজদর্শন-চিন্তা সম্পর্কে রিপোর্ট লিখেছেন।

১৯৩৩ সালে কলিকাতার 'ভারতীয় যাদুঘরে'র সদস্য, 'বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা' ও জার্মানির মিউনিকস্থিত 'Indischer Ausschuss der Deutschen Akademie'-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৪ সনে তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তা হল—"Imperial Preference Vis-a-vis World Economy"। তাঁর আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়— "বাঙালির পথে বাঙালী"।

ঐ বছর তিনি "Indian Commercial and Statistical Review" পত্রিকার সম্পাদনা করতেন।

১৯৩৫ সনে "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বছর "পরাজিত জার্মানি" গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তিনি জার্মানির সকল জায়গা থেকে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এই সবের ভিতরে থাকত তাঁর বাঙালী জাতির সমৃদ্ধি সাধন এবং জার্মানির সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ রক্ষার আন্তরিক প্রয়াস। প্রথম বারের জার্মানি ভ্রমণের ফলে সে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যে হৃদ্যতা জন্মেছিল, তা স্বদেশে ফিরেও ক্ষীণ হয়নি। জার্মানির সেই সব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন।

।। ১৬ ।। ধর্মমহাসভার সম্পাদকতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা

১৯৩৬ সালে সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হয়. সেই উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সরকার সেই সভার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই ধর্মমহাসভার সমস্ত কার্যসূচী তিনিই তৈরী করেছিলেন। একে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমও করতেন। বিনয়কুমার নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নিজেকে প্রকাশ করতেন না। গেরুয়া বসন না পরলেও মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে নিজেদের সহকর্মী মনে করতেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে যে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার তুলনায় এই ধর্মমহাসভার গুরুত্ব কম ছিল না। বিনয় সরকারকে কোন্ দার্শনিক, কোন্ ধর্মের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করতে হবে, তাঁদের এদেশে থাকবার ব্যবস্থা ইত্যাদি— করতে হত। বক্তাদের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে তাঁকে দিতে হত তাছাড়া তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ জানানোও তার দায়িত্বের মধ্যে ছিল। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হত। তাঁর সম্পাদনায় এই ধর্মমহাসভা হয়েছিল সাফল্যমন্ডিত ।

এই বছর তাঁর "Japanese Expansion through Bengal Eyes". "Social Insurance. Legislation and statistics". "Sociology of Population" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

।। ১৭ ।। ডক্টরেট উপাধি লাভ ও সমাজবিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিনয় সরকার পারস্য দেশের তেহেরানের "Academia Asiatic" থেকে ডক্টরেট (ভূবিদ্যায়) উপাধি লাভ করেন। ঐ বছর তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জার্মানী শহরের 'ডয়শে আকাডেমি' তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

প্রেগ শহরের "Institute Oriental" এবং তেহেরানের "Federation Internationale des corps savants de Recherches"-এর সদস্য নির্বাচিত হন ঐ বছরেই।

অধ্যাপক সরকার ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যে "আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদ" স্থাপন করেন তার অন্যতম শাখা ছিল সমাজবিজ্ঞান শাখা। তাঁর 'Sociology in Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত হওয়ার ফলে 'আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদে'র পরিচালকগণ সমাজবিজ্ঞান পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সরকার এই পরিষদ স্থাপন করেন। 'সমাজবিজ্ঞান পরিষদে'র উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করা, সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান, এই সব গবেষণা ও অনুসন্ধান বিষয়ক রচনা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে বাঙালী চিন্তাশক্তিকে পুষ্ট করা, দেশ এবং বিদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্বন্ধ রক্ষা করা।

সমাজবিজ্ঞান পরিষদের সদস্যদের উনিশটি রচনা এবং অধ্যাপক সরকারের নিজের সাতটি প্রবন্ধ নিয়ে 'সমাজবিজ্ঞান' গ্রন্থ ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আরও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন—"Creative India", "Social Metabolism in its

bearings on Progress", "The Positive Background of Hindu Sociology" (2nd Edn). 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' (১ম খন্ড) ইত্যাদি।

।। ১৮ ।। বঙ্গীয় এশিয়া পরিষদ স্থাপন ও পোল্যান্ডে সম্মান লাভ

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সরকার 'বঙ্গীয় এশিয়া পরিষদ' স্থাপন করেন। এই পরিষদের সভাপতি তিনি ছিলেন। এই বছরই পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরের "Instytut Orientalistyezny" নামে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হন। কলিকাতার "Academy of Art and craft" -এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

এই বছর প্যারী নগরী থেকে দুটি বই এবং হাইডেলবার্গ থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে—"La situation Demographique de L'Inde Actuelle Visa' Vis Les Recoltes Les Industries et Les Capitay". "Les Equations de La Mobilite Sociele", "Geopolitik Von Indien aus Geseheh". এছাড়াও ইংরাজী গ্রন্থ যেমন— "The New Foundations of French Social Economy". "The Political Philosphies of the two five years Plans". ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

।। ১৯ ।। বাংলা ধনবিজ্ঞান গ্রন্থের সম্পাদনা, অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ

১৯৩৯ সালে 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' গ্রন্থ—উনিশ জন লেখক-লেখিকার সহযোগিতায় অধ্যাপক সরকার সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁর তেরটি রচনা আছে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪১ সালে "Villages and Towns as Social Patterns" বই প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন যুগে সমাজব্যবস্থার কেমন পরিবর্তন এবং অগ্রগতি হয়েছিল তারই আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ । ১৯৪০ সালে তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশটি বক্তৃতা দেন এবং নানা বিষয়ে তিনি প্রায় ষোলটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালে "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থের প্রথম ভাগ, ১৯৪৩ সালে "The Equations of World Economy". ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

।। ২০ ।। বঙ্গদেশ বিভাগের চিন্তা

বিনয় সরকার বুঝেছিলেন—দেশবিভাগ হবেই—একে বন্ধ করার কারো শক্তি নেই। তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা করতেন। সুভাষচন্দ্র যে 'আজাদ হিন্দ' ফৌজ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তাতে তিনি খুশী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বাহুবল পাঞ্জাব এবং বুদ্ধিবল বাংলার প্রতি গান্ধীজির বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের জন্য "গান্ধী দেশভাগে রাজী হবেনই"—এই ধারণা অধ্যাপক সরকারের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তিনি দেশবিভাগ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে একটা অসন্তোষ ও অস্বস্তি গোপন রাখতেন। এই দুই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে অসমর্থ হওয়ার জন্য তিনি চিন্তান্বিত ছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে কলিকাতা শহরে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় বীভৎস নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল। এই সময় বিনয় সরকারও বিপদে পড়েছিলেন। মুসলমান গুন্ডাদের হত্যার হুমকির ভয়ে তাঁকে তাঁর বাসাও ছাড়তে হয়। তাঁর বিপন্ন হওয়ার খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু তাঁকে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন অন্যতম বিচারপতি কমল চন্দ্রের ৮১ নম্বর, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীর নীচতলার ঘরে ভাড়ার ব্যবস্থা করে সেখানে বিনয় সরকারকে পাঠিয়ে দেন। এইস্থানে তিনি মাসাধিক কাল থাকার পরে নিজের বাসায় ফিরে যান। যে বিনয় সরকার—১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন—সেই তিনিই ১৯৪৬ সনে বাংলা বিভাগের প্রস্তাবক ও প্রবর্তক।

।। ২১ ।। বঙ্গীয় মার্কিন সংস্কৃতি পরিষদ

বিনয় সরকারের উদ্যোগে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুন কলিকাতায় বঙ্গীয় মার্কিন পরিষদ গঠন করা হয়। তিনি এই পরিষদের সভাপতি ও গবেষণা-উপদেষ্টা এবং অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস এবং অধ্যক্ষ রফি আমেদ সম্পাদক নির্বাচিত

হন। ৩৪ জন সুধী এই পরিষদের ডিরেক্টর হন। আমেরিকার লোকজনদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি, আচার, সভাসমিতি, প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করাই ছিল এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই বছর তাঁর "Education for Industrialization" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

।। ২২ ।। তৃতীয়বার বিদেশযাত্রা

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লস্ এঞ্জেলসের "Watumul Foundation" এবং নিউইয়র্কের "Institute of Education"-এর থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ পান। এই আমন্ত্রণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'ব্লুআর্থ' কারখানা সংগ্রহ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা খিদিরপুরে একটা সামরিক কারখানা বসিয়েছিল। সেটার নামই 'ব্লুআর্থ' ফ্যাক্টরি। আমেরিকা গভর্ণমেন্ট এই কারখানাটা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায়নি। বিনয় সরকার মার্কিন সামরিক বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কারখানাটি কেনার ব্যবস্থা করে দেন—এক লাখ টাকায়। যাদবপুর কলেজের শ্রীবৃদ্ধির কথা তাঁর মনে সর্বদা জাগ্রত থাকত।

১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনয় সরকার স্বাধীন ভারতের নতুন বাণী প্রচারের জন্য তৃতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। তখনও যৌবনচিত উদ্যম ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্তে বিদেশীরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তাঁর বক্তৃতার সাধারণ বিষয় ছিল 'ডোমিনিয়ন ইন্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড পারসেপেকটিভ' অর্থাৎ বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতে ডোমিনিয়ন ভারতের স্থান। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থের নামকরণও ছিল ওটাই। ১৯৪৯ সালের ৭ই মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে শুরু হয় তাঁর বক্তৃতা সফর। ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন—কলোনিয়া, কর্নেল, পেনসিলভানিয়া, মিশিগ্যান ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরণের। তাঁর বক্তৃতাবলী মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "The people and cultures of India" নামে একটি গ্রন্থে মুদ্রণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল—এই বইটি তার প্রমাণ। জুন মাসের ২০ তারিখ থেকে ৯ই আগষ্ট পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করতে থাকেন। তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের দিয়ে বৈঠকী আলোচনা করতেন। তাঁর বক্তৃতা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা শুনে নৃতত্ত্ব বিভাগের সেক্রেটারি গ্রেস. এল্. উড উক্ত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "**অধ্যাপক সরকারের ক্লাসের অন্যতম শ্রোতা হিসাবে এবং তাঁর বৈঠকী কথোপকথনের একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষকে অতি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। ভারতবর্ষকে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং সম্ভবপর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে তারা সকলেই তাঁর তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞানের পরিধি এবং তথ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের রকমারি প্রণালী দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি।**"

।। ২৩ ।। অধ্যাপক সরকারের পরলোকগমন

বক্তৃতা সফরের মাঝখানেই ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে নভেম্বর তাঁর প্রয়াণ ঘটে । তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন শ্রীমতী ইডা সরকার। ওয়াশিংটন ডি. সিতে নিগ্রোজাতির হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও তিনি ভারত ও বাংলার কথা ভুলতে পারেন নি। ডক্টর মণি মৌলিক তাঁর "Last days of Benoy Sarkar" প্রবন্ধে লিখেছেন, "ওয়াশিংটনে থাকার সময় অধ্যাপক সরকার আমেরিকায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের ওপর স্টার্লিং-এর মুদ্রামান হ্রাসের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ এর ফলে আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে চিন্তা করে তিনি দূতাবাসের কর্মচারী ও আমেরিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন।"

বিনয়কুমার বিশ্বে ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুনিষ্ঠার কথা প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন শান্তি, প্রেম, অহিংসা ও মৈত্রীই ভরতের ভাব সাম্রাজ্যের ভিত্তি। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শকে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে ব্যক্তিই সত্য। 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে'র তদানীন্তন কর্ণধার স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ বলেছিলেন—"**উনি আমাদেরই একজন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অমূল্য ভাবধারার এরূপ অপূর্ব মূল্যায়ন আর চোখে পড়েনি আমার।**" [১৬]

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থেকেও তিনি ভারত-গত প্রাণ ছিলেন। মৃত্যুর দুইদিন আগে হাসপাতালে মিসেস সরকারকে বলেছিলেন, "তুমি কি ভুলে গিয়েছো সেই দিনের কথা, যখন আমি তোমায় ১৯১৪ সনে জাহাজে 'বন্দেমাতরম' গান শিখিয়েছিলাম"? সত্যকারের দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি।

বিনয় সরকার বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী হলেও তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি ছিল না। স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্বজনীনতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। জার্মানীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চিন্তানায়ক অধ্যাপক কার্ল হাউসোফার-ও লিখেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে, **"He (Sarkar) is one of the rare but great culture mediators between East and West knows the actualities of Asia and Europe in their fundamentals as few".**[১৭] বিনয় সরকারের চিন্তার উদারতা ও স্বচ্ছতা পশ্চিমীদের সর্বদাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অধ্যাপক সরকারের জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়। তাঁর জীবনাবসানের পর সমকালের কবি মৃত্যুঞ্জয় মাইতি "হে মহাপথিক" শীর্ষক কবিতাটি লিখে মহামনীষীর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১। ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী, 'আচার্য বিনয় সরকারের বাংলা গদ্যশৈলী' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৬৯।

২। তদেব, পৃঃ ৬৯।

৩। তদেব, পৃঃ ৬৯।

৪। উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশ-সেবক বিনয় সরকার' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৭৭।

৫। 'অর্থশাস্ত্র পত্রিকা,'' হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, পৃঃ ৫৩।

৬। 'তন' পত্রিকা, ১৮৯৭-১৯১৩।

৭। প্রমথনাথ পাল, 'মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার', ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৪।

৮। ইডা সরকার, "My life with Prof. Benoykumar Sarkar" নামক জার্মান গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ, 1977, PP. 75-76.

৯। তদেব, পৃঃ ১২।

১০। তদেব, পৃঃ ১৩।

১১। তদেব, পৃঃ ২০।

১২। হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 'বিনয় সরকার ও নিরক্ষরের অধিকার' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ১০৩।

১৩। তদেব, পৃঃ ১০৩।

১৪। ডক্টর ত্রিগুণা সেন, 'খাঁটি জাতীয় অধ্যাপক ঃ বিনয় সরকার' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৫৮।

১৫। তুহিনাংশু ভট্টাচার্য, 'বিনয় সরকার স্মরণে' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত) , ১৯৮৮, পৃঃ ৪১-৪২।

১৬। দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৪, পৃঃ ৯৩-৯৪, ১৬১।

১৭। অ্যাকাদেমি পত্রিকা, হরিদাস মুখার্জী, ১৯৮৮, পৃঃ ৮।

।। খ ।। বিনয় সরকার রচিত এবং সম্পর্কে আলোচিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ-তালিকা

চরম কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যেও বিনয় সরকারের জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা ছিল তাঁর বিশাল রচনাশক্তি। বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি কখনও বেছে নিয়েছেন শিক্ষাবিজ্ঞান, কখনও বা ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আবার কখনও বিচরণ করেছেন ভ্রমণ সাহিত্যে অথবা ঐতিহাসিক চরিত্রে। তাঁর এই প্রয়াস দেশে-বিদেশে সর্ব অবস্থানকালেই সক্রিয় ছিল। সে কারণে তাঁর রচিত গ্রন্থের অনেকাংশই বিদেশে প্রকাশিত হয়। ভাষাগত দিক থেকে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন মাতৃভাষা বাংলায়, ঠিক ততোধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান এবং ইটালীয়ান ভাষায়। এই কারণেই প্রয়োজনবোধে তাঁর এইসব বিবিধ ভাষাক্ষেত্রে বিচরণ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। জীবনব্যাপী এই রচনাকালে যদিও তাঁর সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ইংরাজীতে এবং তারপর বাংলায়, তবুও মাঝে মধ্যে ফরাসী, জার্মান এবং ইটালীয়ান ভাষাতেও তাঁর রচনা লক্ষ্য করার মতন। দীর্ঘকাল মুদ্রণের অভাবে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি আজ প্রায়শই লুপ্তপ্রায়। তাঁর রচনাবলীর সঠিক আকার নিরূপণ করাও শ্রমসাধ্য যেহেতু তাঁর অনেক রচনাই বিদেশে মুদ্রিত এবং সংরক্ষিত হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা নির্ণয়নই মূল উদ্দেশ্য। ব্যক্তি এবং গদ্যশিল্পী হিসাবে আজ মানুষের মনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও বিনয় সরকার এযাবৎকাল বেশ কিছুদিন আলোচনা প্রসঙ্গে উপেক্ষিত ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুধীদের কিছু আলোচনা ব্যতীত গবেষণাস্তরে তেমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি। তবুও তাঁর প্রসঙ্গে আলোচিত সমগ্র গ্রন্থের-ও এক তালিকা নিরূপণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে কিছু তথ্যের আভাস ড: প্রদ্যোত ঘোষ সম্পাদিত "আচার্য বিনয়কুমার সরকার" গ্রন্থে পাওয়া যায়।

—ঃ বিনয় সরকার রচিত গ্রন্থ-তালিকা ঃ—

(ক) বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ঃ-

(১) বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯০৭ (৪৯ পৃষ্ঠা)

(২) শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা, তদেব, ১৯১০ (৪৮ পৃষ্ঠা)

(৩) প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা, তদেব, ১৯১০ (১৮০ পৃষ্ঠা)

(৪) ভাষা-শিক্ষা, তদেব, ১৯১০ (১২০ পৃষ্ঠা)

(৫) ইংরাজী শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলিকাতা, ১৯১১ (২২০ পৃষ্ঠা)

(৬) সংস্কৃত শিক্ষা, তদেব, ১৯১১ (৩২০ পৃষ্ঠা)

(৭) শিক্ষা সোপান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯১২ (৬৪ পৃষ্ঠা)

(৮) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, তদেব, ১৯১২ (১৩১ পৃষ্ঠা)

(৯) শিক্ষা সমালোচনা, তদেব, ১৯১২ (১৪০ পৃষ্ঠা)

(১০) সাধনা, স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১২ (১৭২ পৃষ্ঠা)

(১১) অসাধ্য-সাধন, গৃহস্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯১৩ (৪৮ পৃষ্ঠা)

(১২) দুনিয়ার ডাক, তদেব, ১৯১৩ (৬৪ পৃষ্ঠা)

(১৩) দুনিয়া আমার, তদেব, ১৯১৩ (৫৮ পৃষ্ঠা)

(১৪) জীবনের সাড়া, তদেব, ১৯১৩ (৮২ পৃষ্ঠা)

(১৫) রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী, তদেব, ১৯১৪ (১৫০ পৃষ্ঠা)

(১৬) কবরের দেশে দিন পনেরো, তদেব, ১৯১৪ (১৭৮ পৃষ্ঠা)

(১৭) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র, তদেব, ১৯১৪ (১৩০ পৃষ্ঠা)

(১৮) ইংরাজের জন্মভূমি, তদেব, ১৯১৪ (৫৮৬ পৃষ্ঠা)

(১৯) বিশ্বশক্তি, তদেব, ১৯১৪ (৩২৪ পৃষ্ঠা)

(২০) নিগ্রোজাতির কর্মবীর, তদেব, ১৯১৪ (২৭৬ পৃষ্ঠা)

(২১) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, বেঙ্গল বুক কোং, কলিকাতা, ১৯২২ (২৪১ পৃষ্ঠা)

(২২) ইয়াংকিস্থান, গৃহস্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯২৩ (৮২৪ পৃষ্ঠা)

(২৩) নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত, তদেব, ১৯২৪(১০০ পৃষ্ঠা)

(২৪) পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (এঙ্গেলেসের জার্মান ভাষায় রচনার অনুবাদ), এন. এম. রায়চৌধুরী এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯২৬ (৩৫৫ পৃষ্ঠা)

(২৫) দুনিয়ার আবহাওয়া, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯২৬ (২৬৮ পৃষ্ঠা)

(২৬) হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলিকাতা, ১৯২৬ (৩৩৩ পৃষ্ঠা)

(২৭) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯২৬ (৪৮১ পৃষ্ঠা)

(২৮) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, তদেব, ১৯২৬ (২৭ পৃষ্ঠা)

(২৯) আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র, আর্থিক উন্নতি কার্য্যালয়, কলিকাতা, ১৯২৭ (৩৭ পৃষ্ঠা)

(৩০) যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র, তদেব, ১৯২৭ (৫২ পৃষ্ঠা)

(৩১) ধনদৌলতের রূপান্তর (লাফার্গের ফরাসী ভাষায় রচনার অনুবাদ), সিদ্ধেশ্বর প্রেস, কলিকাতা, ১৯২৮ (২০৭ পৃষ্ঠা)

(৩২) বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, তদেব, ১৯২৮ (৪৩৬ পৃষ্ঠা)

(৩৩) এ কালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র, এন. এম. রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯২৮ (৩৯৯ পৃষ্ঠা)

(৩৪) সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, আর্য সাহিত্য ভবন, কলিকাতা, ১৯৩০ (৬৭ পৃষ্ঠা)

(৩৫) নয়া বাংলার গোড়াপত্তন (প্রথম ভাগ), চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩২ (৫৩০ পৃষ্ঠা)

(৩৬) নয়া বাংলার গোড়াপত্তন (দ্বিতীয় ভাগ), তদেব ১৯৩২ (৪৫০ পৃষ্ঠা)

(৩৭) স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি (ফ্রেডেরিক লিষ্টের রচনার অনুবাদ), নিউ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩২ (২০৩ পৃষ্ঠা)

(৩৮) জর্জ ওয়াশিংটন হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩২ (২৪

পৃষ্ঠা)

(৩৯) গ্যেটে সাহিত্য ও জার্মান কুল্টুরের এক ছটাক, নিউওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩২ (৪০ পৃষ্ঠা)

(৪০) প্যারিসে দশ মাস, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৩১ (২৯০ পৃষ্ঠা)

(৪১) ইতালিতে বার কয়েক, সিটি লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩২ (২৮৪ পৃষ্ঠা)

(৪২) বাড়তির পথে বাঙালী, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৪ (৬৩৬ পৃষ্ঠা)

(৪৩) পরাজিত জার্মানী, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৩৬ (৮০১ পৃষ্ঠা)

(৪৪) বাংলায় ধনবিজ্ঞান (প্রথম ভাগ) (সম্পাদিত), চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৭ (৭৫০ পৃষ্ঠা)

(৪৫) সমাজবিজ্ঞান (প্রথম ভাগ) (সম্পাদিত), তদেব, ১৯৩৮ (৫৮৮ পৃষ্ঠা)

(৪৬) বাংলায় ধনবিজ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (সম্পাদিত), তদেব, ১৯৩৯ (৫৭৩ পৃষ্ঠা)

(৪৭) বিনয় সরকারের বৈঠকে (প্রথম ভাগ), তদেব, ১৯৪২ (৭৭০ পৃষ্ঠা)

(৪৮) বিনয় সরকারের বৈঠকে (দ্বিতীয় ভাগ), তদেব, ১৯৪৫ (৭০০ পৃষ্ঠা)

(খ) ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ ঃ-

(1) Outlines of Economics, S. K. Lahiri & Co., Calcutta, 1910 (193 Pages)

(2) Constitutions of Seven modern states, longmans Green & Co. London, 1910 (134 Pages)

(3) Analysis of Seeley's Introduction to political Science, Ibid, 1910 (84 Pages)

(4) Analysis of some Important Topics of political Science and International law, Ibid, 1910 (102 Pages)

(5) The Man of Letters : a scheme for fostering Indian Vernacular Literature, R. Chatterjee & Co., Calcutta, 1911

(6) Political Science, Ibid, 1911 (86 Pages)

(7) Constitutions, Ibid, 1911 (58 Pages)

(8) Ancient Europe, S. K. Lahiri & Co, Calcutta 1912 (100 Pages)

(9) Mediavel Europe, Ibid, 1912 (164 Pages)

(10) History of English Literature, Ibid, 1912 (232 Pages)

(11) The Science of History and The Hope of Mankind, Longmans Green & Co, London, 1912 (84 Pages)

(12) The Pedagogy of The Hindus, Chuckervertty Chatterjee & Co, Calcutta, 1912

(13) Sukraniti, The Panini Office, Allahabad, 1912 (300 Pages)

(14) Introduction to The Science of Education, Longmans Green & Co, London, 1913 (173 Pages)

(15) The Positive Background of Hindu Sociology (volume-I, Book-I) The Panini Office, Allahabad, 1914 (770 Pages)

(16) Chinese Religion through Hindu Eyes, The commercial Press Ltd, Sanghai, 1916 (363 Pages)

(17) Love in Hindu Literature, Maruzen Co Ltd, Tokyo, 1916 (85 Pages)

(18) The Folk Element in Hindu Culture, longmans Green & Co, London, 1917 (332 Pages)

(19) Hindu Achievements in Exact Sciences, Ibid, 1918 (100 Pages)

(20) The Bliss of a Moment, B. T. Huebesch, Boston, 1918 (65 Pages)

(21) Hindu Art : Its Humanism and Modernism, B. T. Huebesch, New York, 1920 (44 Pages)

(22) The Positive Background of Hindu Sociology (volume-I, Book-II), The Panini Office, Allahabad, 1922 (300 Pages)

(23) The Futurism of young Asia, Julius Springer, Berlin, 1922 (411Pages)

(24) The Political Institutions and Theories of the Hindus, verlag von Market, leip zig, 1922 (242 Pages)

(25) The Aesthetic of young India, Kar Majumdar & Co, Calcutta, 1923 (124 Pages)

(26) Economic Development : Snapshots of world movements in commerce, economic legistation, industrialism and technical Education (volume-I), B. G. Paul & Co, Madras, 1926 (464 Pages)

(27) Shipping and Railway Policies in Economic Legistation, Ibid, 1926

(28) The Politics of Boundaries and Tendencies in International Relations N. M. Ray Chowdhury & Co, Calcutta, 1926 (322 Pages)

(29) Hindu Politics in Italian, The Calcutta oriental press, calcutta, 1926 (64 Pages)

(30) The law and the cultivator : The examples of France, Ibid, 1926

(31) A scheme of Ecomomic Development for young India, Oriental Library, Calcutta, 1926

(32) The Positive Background of Hindu Sociology (volume-II), The Panini Office, Allhabad, 1927 (366 Pages)

(33) Greetings to young India : Messages of Cultural and Social Reconstruction, N. M. Roy Chowdhury & Co, Calcutta, 1927 (160 Pages)

(34) The Political Philosophies Since 1905 (volume-I), Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd, Calcutta, 1928 (404 Pages)

(35) Their Origins and Their Tendencies : An objective and Chronological Survey (volume-I), B. G. Paul & Co, Madras, 1928

(36) The Post Graduate University at Calcutta, N. M. Ray Chawdhury & Co, Calcutta, 1929 (136 Pages)

(37) Comparative Pedagogies in Relation to Public Finance and National Wealth, Ibid. 1929 (133 Pages)

(38) Economic Development : Snapshots of world movements at Commerce, economic legislation, industrialism and technical education (volume-II), B. G. Paul & Co, Madras, 1932 (320 Pages)

(39) Studies in Applied Economics (volume-I), Chuckerverty Chatterjee & Co, Calcutta, 1932

(40) Comparative Birth, Death and Growth rates, The University of Calcutta, Calcutta, 1932 (72 Pages)

(41) Indian Currency and Reserve Bank Problems, Chuckerverty Chatterjee & Co, Calcutta, 1933 (94 Pages)

(42) Realities in the relations between East & West, Mayavati, Calcutta, 1934

(43) Imperial preference vis-a-vis word Economy, N. M. Roy Chowdhury & Co, Calcutta, 1934 (170 Pages)

(44) Economic Expansion of the Bengalee people, Ibid. 1934

(45) The Political Philosophy of Ramdas, The University of Calcutta, Calcutta, 1935

(46) Relatives in Food Nutrition and Efficiency Economics, Ibid, 1936

(47) Social Insurance Legislation and Statistics, Chuckerverty Chatterjee & Co, Calcutta, 1936 (460 Pages)

(48) The might of the man in the Social Philosophy of Ramkrishna and Vivekananada, Ramkrishna Math, Madras, 1936 (28 pages)

(49) World culture in India today, N. M. Ray Chowdhury & Co, Calcutta, 1936

(50) India's Advances in Industrialism during the period of Depresssion, Ibid, 1936

(51) The Sociology of population, Ibid, 1936 (150 Pages)

(52) The Sociology of Crimes and Punishment, Ibid, 1937

(53) Secular and Social Strata in Buddhist thought, Mahabodhi Society, Calcutta, 1937

(54) Religious Categories as Universal expression of creative personality, Ibid, 1937

(55) The Social Philosophy of Masaryk, Oriental Book Agency, Calcutta, 1937

(56) Creative India, Motilal Banarasi Dass Press, Lahore, 1937 (725 Pages)

(57) Social Metabolism in it's Bearings at Progress, Chappel Hill N. C., New York, U. S. A., 1937

(58) Introduction to Hindu Positivism, The Panini Office, Allahabad, 1937 (770 Pages)

(59) India in Exact Sciences–old and new, The Indian Research Institute, Calcutta, 1937

(60) The New Foundations of French Social Economy, Ibid, 1938

(61) The Sociology of Races, Cultures and Human Progress, Chukerverty Chatterjee & Co, Calcutta, 1939 (410 Pages)

(62) The Political Philosophies of the two five year plans, Ibid, 1938

(63) Villages and Towns as Social Patterns, Ibid, 1941 (704 Pages)

(64) The Political Philosophies since 1905 (volume-II), Motilal Banarasi Dass Press, Lahore, 1942 (1294 Pages)

(65) The Equations of World Economy in their Bearings on Postwar Reconstruction, Chuckerverty Chattejee & Co, Calcutta, 1943 (440 Pages)

(66) Education for Industrialisation, Ibid, 1946

(67) Dominion India in world Perspectives : Economic and Political, Ibid, 1949

(গ) ফরাসী ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ-

(1) Aspects Economiques Et Politiques De La Civilisation Hindu, Paris, 1930

(2) La Sociographic Hindone Aur Debuts De Capitalisme Moderne, Paris, 1936

(3) La Situation Demographique De L'Inde Actuelle Visa' Vis Les Recoltes, Les Industries Et Les Capitay, Paris, 1938

(4) Les Equations De La Mobilite Sociale Paris, 1938

(5) La Morphologic Sociate Des villes Et Des villages, Etude Statistique Internationale, Bucharest, 1939

(ঘ) জার্মান ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ-

(1) Die Lebensanchaung Des Inders, Leipzig, 1923 (66 Pages)

(2) Die Soziologischen wechesezieh ungen Der Demographisehen Dichte, Leipzig, 1937

(3) Geopolitik von. Indien Aus Geseheh, Heidelberg, 1938

(ঙ) ইতালিয়ান ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ-

(1) Quozienti De' Natalita Di Mortalita E Di Anmento Naturale Nell' India Attanale Nel Quandro Della Demogratia Comparata, Rome, 1931.

বিনয় সরকার রচিত প্রবন্ধ-তালিকা ঃ-

(চ) বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(১) ঘরে বাইরে বাঙালীর সৃষ্টি, মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলন বুলেটিন, ১৯৩৬

(২) বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বঙ্গসমাজ, মালদা সমাচার, মালদা, ১৯০৬

(৩) হিন্দুধর্মের দিগ্বিজয় ও রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য, উদ্বোধন পত্রিকা, কলিকাতা, ১৯৩৬

(৪) শিক্ষানুশাসনা, এডুকেশনাল অব্জারভেশন, কলিকাতা, ১৯১২

(৫) হিন্দু ও মুসলমান, নব্য ভারত, কলিকাতা, ১৯০৮

(৬) নিম্নশ্রেণীর অধিকার, তদেব, ১৯০৮

(৭) সমাজে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাব, তদেব, ১৯০৮

(৮) আমাদের কর্তব্য, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৯০৮

(৯) নেতৃত্ব, তদেব, ১৯০৯

(১০) আধুনিক বঙ্গসমাজ ও মালদহ, মালদা সমাচার, মালদা, ১৯০৯

(১১) আমাদের জাতীয় চরিত্র, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৯১০

(১২) ভাবুকতা, আর্য্যাবর্ত, কলিকাতা, ১৯১০

(১৩) আলোচনা প্রণালী, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৯১০

(১৪) ধর্মের প্রকৃতি অসীমের উপলব্ধি, সুপ্রভাত, কলিকাতা, ১৯১০

(১৫) ভাষাবিতান, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৯১১

(১৬) সাহিত্যসেবী, ঢাকা রিভিয়ু, ঢাকা, ১৯১১

(১৭) সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব, নব্যভারত, কলিকাতা, ১৯১২

(১৮) হিন্দু সাহিত্য প্রচারক, বাণী, কলিকাতা, ১৯১২

(১৯) ইতিহাসের উপদেশ, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৯০৭

(২০) বিপ্লব, তদেব, ১৯০৭

(২১) গ্রীক ও হিন্দু, ঢাকা রিভিয়ু, ঢাকা, ১৯০৮

(২২) ইতিহাসে শিখ জাতি, আর্য্যাবর্ত, কলিকাতা, ১৯০৯

(২৩) আধুনিক ভারত, তদেব, ১৯০৯

(২৪) বীরত্ব, তদেব, ১৯১০

(২৫) ইতিহাস বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা, নব্যভারত, কলিকাতা, ১৯১১

(২৬) আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় সমৃদ্ধির যুগ, তদেব, ১৯১২

(২৭) ইউরোপ ও ভারত, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৯১২

(ছ) ইংরাজী ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(1) Hindu Political Philosophy, Political Science quarterly, New York, 1918

(2) Hindu theory of International Relations, American Science Review, New york, 1919

(3) Humanism in Hindu Art, Modern Review, Calcutta, 1919

(4) The Fortunes of the Chinese Republic, Ibid, 1919

(5) The Democratic Background of Chinese Culture, The Scientific monthly, New York, 1919

(6) The Theory of property, Law and Social order in Hindu political philosophy, The Inter National Journal of Ethics. Calcutta, 1920

(7) Political tendencies in Chinese Culture, The Modern Review, Calcutta, 1920

(8) The Ganas or, Republic of Ancient India, Ibid, 1920

(9) The Beginnings of the Republic in China, Ibid, 1920

(10) The Economic Foundations of the state in Sukra's political theory, Ibid, 1920

(11) The war office in Hindu Empires, Ibid, 1920

(12) The Pen and the Brush in China, The Asian Review, Tokyo, 1920

(13) The International Fetters of Young China, The Journal of International Relations (Clerk University, USA), 1921

(14) On some methods and Conclusions in Hindu Politics, Indian Historical Quarterly, Cal cutta, 1926

(15) Memorandum on Post- Graduate studies with special references to Economics and allied sciences, The Calcutta Review, Calcutta, 1926

(16) New Orientations in Commerce, Ibid, 1927

(17) The Bank-Notes and Note-Banks of Germany , Ibid, 1927

(18) Investments and Business organisation for Bengal Capitalists, Ibid, 1927

(19) Empire Development and World Economy, Ibid, 1927

(20) Types and Tendencies in American Banking, Ibid, 1927

(21) The Arthasastra of Young Bengal, Ibid, 1927

(22) Trusts and Rationalisation : Aspects of the New Industrial Revolution, Ibid, 1927

(23) Labour, Property and Traffic policies in statesmanship and political ideals from Bis marck to Lenin and Mussolini, Ibid, 1927

(24) Some current questions in Indian Industry, Commerce and Economics, Ibid, 1927

(25) The Social values of Clerical labour, Ibid, 1927

(26) The new Contents of Sovereignty, Democracy and Nationhood, Ibid, 1928

(27) Categories of Social Speculation in Eur-America, Ibid, 1928

(28) A scheme for the constitutional Reorganisation of the Post-Graduate University at Cal cutta, Ibid, 1929

(29) Rationalism in Indian Cotton Mills, Railways, Steel Industry and other Enterprises, Bengal National Chamber of Commerce, Tri-monthly English magazine, Calcutta, 1930

(30) Railway Industry and Commerce of India, Ibid, 1930

(31) National and Local Finance, The Calcutta Review, Calcutta, 1932

(32) The Strength and Limitations of Economic Japan Vis-a-Vis Young Bengal, Ibid, 1933

(33) The Reserve Bank of India Bill, Ibid, 1933

(34) The Societal transformation and economic rejuvenation of today, Insurance and finance Review, Calcutta, 1933

(35) Business Organisation as an Aid-to Economic Expansion of Japan, The Calcutta Review, Calcutta, 1934

(36) Systems of Sickness Insurance, Ibid, 1934

(37) The functioning of Ottawa Aggrement, Ibid, 1934

(38) The Problem State Control in Indian Coal Industry, Ibid, 1934

(39) The Health movement in Social economics, Ibid, 1934

(40) Trade Balance and public finance : The experience of fascist Italy, Ibid 1935

(41) Nilkantha and Mitra-Misra : Two Hindu Political Philosopher of the Seventeenth Century, Ibid, 1935

(42) The Ain-I-Akbari as a Semi-Moslem and Semi-Hindu Arthasastra, Ibid, 1935

(43) Hindu Sociological Literature from chandesvara to Rammohun, Ibid, 1935

(44) Bengali Positivism in the Sociology of values, Ibid, 1936

(45) The Social Philosophy of Ramkrishna and Vivekananda, Ibid, 1936

(46) Progress as a social Reality, Ibid, 1936

(47) German winter Relief as a form of Social Service, Ibid, 1936

(48) The People and the State in Neo-Democracy, Ibid, 1936

(49) The Sociological Correlates of Demographic Density, Ibid, 1936

(50) Technocrary, Capitalism and World Economy in India, Ibid, 1936

(51) The sociology of Indian Socialism and Feminism, Ibid, 1936

(52) Ramkrishna as a remaker of man, Kalyan Kalpataru, Gorakhpur, 1936

(53) The problem of correlation between exchange rates and exports, The Calcutta Review, Calcutta, 1937

(54) The Remaking of Religion from Ramkrishna to Ramkrishna-Vivekananda, Ibid, 1937

(55) Religious Categories as Universal expressions of creative personality, Ibid, 1937

(56) The Labour Laws and Socio-economic planning in France, Ibid, 1937

(57) Hindu sensatism and ideationalism in Sorokin's Social and Cultural Dynamics, Ibid, 1937

(58) Modernism in Land Legislation, Ibid, 1937

(59) Indian Exact Sciences in Growth, Decline and Rebirth, Ibid, 1938

(60) The Eugenic potentialities of the alleged inferior races and classes, Ibid, 1938

(61) Economic Autarchy as embodied in the German four-year plan, Ibid, 1938

(62) Economic Italy during the first years of the fascist regime, Ibid, 1938

(63) Barne's History of Western Civilization, Ibid, 1938

(64) Prosperity and Depression, Ibid, 1938

(65) The acceptable and unacceptable in Bankim's Social Philosophy, Ibid, 1938

(66) Stalin as the Manager of Leninism, Ibid, 1938

(67) Divyoka - A National Hero of Bengal, Ibid, 1938

(68) Employment planning and Demographic Reconstruction, Ibid, 1938

(69) Neo-Idealism in Hocking's Man and the State, Ibid, 1938

(70) Demo-Despotocracy and Freedom, Ibid, 1939

(71) New tedencies in German Social Philosophy, Ibid, 1939

(72) The Jute Situation, Ibid, 1939

(73) Industrial Planning and Economic-Autarchy, Ibid, 1939

(74) Indices of Economic progress in France, Ibid, 1939

(75) The Doctrine of Malnutrition in its Bearings on the Over-population, Ibid, 1939

(76) The Aesthetic and the social in Art Appreciation, Ibid, 1939

(77) Creative Disequilibrium in Freedom, Democracy and Socialism, Ibid, 1940

(78) The Sociology of creative disequilibrium in education, Ibid, 1940

(79) Fallacies about Indian population, Ibid, 1940

(80) Two French Sociologists : Levy Bruhl and Bougle, Ibid, 1940

(81) Bengalee Culture as a system of Mannual Accuturation, Ibid, 1941

(82) Progress as creative disequilibrium, Ibid, 1941

(83) Tagore the poet as painter, Ibid, 1941

(84) Social Metabolism, Ibid, 1941

(85) The economic theory of Soviet Russia, Ibid, 1941

(86) Post-War World Economy, Ibid, 1941

(87) India's epochs in World Culture, Prabudhya Bharat, Calcutta, 1941

(88) The last phrases of Tagores's Social philosophy, The Calcutta, Review, Calcutta, 1942

(89) Aurobindo's Life Divine, Ibid, 1942

(90) The league of nations as an interhuman pattern, Ibid, 1942

(91) Inter-Racial relations in analytical Sociology, Ibid, 1942

(92) Classes as Social configurations, Ibid, 1942

(93) Socioloigy of "Asia for Asians", Ibid, 1942

(94) World War II as a phase of the hundred year's war between Germany and England, Ibid, 1942

(95) Inflation in the paradox of war Economy, Ibid, 1943

(96) Gandhi, Non-Gandhi and Anti-Gandhi in the pattern of Indian Ideologies, Ibid, 1948

(97) Inflation as high price, Ibid, 1949

(জ) ফরাসী ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(1) Aspects economiques et politiques de la civilisation hindoue, Revue de synthese Historique, Paris, 1924

(2) La Sociographie hindoue aux debute du capitalisme moderne, Revue Internationale De Sociology, Paris, 1936

(3) La Metabolisme Social, Revue de Synthese, Paris 1937

(ঝ) জার্মান ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(1) ইণ্ডিয়েন্স এন্ট্হিকল্ঙ ইম্ ফার্গলাইখ্ৎসু অয়রামেরিকা, ড্যয়েচে, রুণ্ডশাও, বার্লিন, ১৯৩০

(2) ফার্গলাইখেণ্ডার ইণ্ডুষ্ট্রিয়ালিস্মুস্, ফর্শুঙ্গেন উণ্ড ফোর্ট শ্রিট্টে, বার্লিন, ১৯৩০

(3) Neuorientierungen in optimum und wirtschaftlicher Leistungsfahinkeit, Bevolkerungsfragen Munich, 1936

(4) Die Soziologischen wechselbeziehungen der demographischen Dichte, Archiv fur Bevolkerungs-Wissenschaft, leipzig, 1937

(ঞ) ইতালিয়ান ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(1) ইস্তিতুৎসিঅনি পলিতিকে এ সচ্যালি দেল আন্তিক পপল ইন্দিয়ান, আনালি দি একনমিয়া, মিলান, ১৯৩০

(2) আম্পেত্তি এ প্রবলেমি দেল্লা অর্দ্যানা একনমিয়া ইন্দিয়ানা, আনালি দি একনমিয়া, মিলান, ১৯৩০

(3) ৎসালপোলিটিক ইন্ ইণ্ডিয়েন, ন্যির্নব্যগার ৎসাইট্টঙ, মিলান, ১৯৩০

(4) I Dati Secolari e Sociologici nella Letteratura Buddistica Pali, ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ওরিয়েন্ট্যালিষ্টস্ বুলেটিন, ১৯৩৬

বিনয় সরকার রচিত গ্রন্থের অনুবাদ ঃ-

(ট) বাংলা গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ইংরাজী অনুবাদ ঃ-

(1) Introduction to Science of Education ('শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ)/ Major Baman Dass Basu, Longmans Green & Co, London, 1913 (60 Pages)

(2) Steps to a University ('শিক্ষা সোপান' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ)/ Major Baman Dass Basu, Ibid, 1913 (72 Pages)

(ঠ) ইংরাজী গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বাংলা অনুবাদ ঃ-

(১) হিন্দু সাহিত্যে প্রেম ('Love in Hindu Literature' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ)/ প্রমথনাথ পাল, ক্যালকাটা পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫৫ (১৩৮ পৃষ্ঠা)

-ঃ বিনয় সরকার সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ-তালিকা ঃ-

(ড) বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ-

(১) বাংলায় দেশী বিদেশী/ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কার্যালয়, কলিকাত্ত, ১৯৪২ (৪৬ পৃষ্ঠা)

(২) বিনয় সরকার / কালিদাস মুখোপাধ্যায়, তদেব, ১৯৫১

(৩) পঞ্চাশ বৎসর / প্রমথনাথ পাল, তদেব, ১৯৫৭

(৪) ইতিহাসচর্চায় বিনয় সরকার / হরিদাস মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৯৫৮ (১০৭ পৃষ্ঠা)

(৫) মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার / প্রমথনাথ পাল, প্রভাত কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭১ (২৬০ পৃষ্ঠা)

(৬) অর্থনীতির পথে / ভবতোষ দত্ত, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৭

(৭) আচার্য বিনয়কুমার সরকার/ ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৮ (১৭৭ পৃষ্ঠা)

(ঢ) ইংরাজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ ঃ-

(1) Fundamental problems and leading ideas in the works of Prof. Benoykumar Sarkar/ Shib Chandra Dutt, Chuckervertty Chatterjee & Co, Calcutta, 1932

(2) Conflicting tendencies in Indian economic thought– Sarkarism in Economics/ Shib Chandra Dutt, Ibid, 1939 (234 Pages)

(3) Sarkarism --- the ideas and ideals of Benoy Sarkar on man and his conquests/ Subodh Krishna Ghosal, Ibid, 1939 (60 Pages)

(4) The Social and Economic ideas of Benoy Sarkar / Baneswar Dass (Editted), Ibid, 1939 (664 Pages)

(5) Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology and Economics/ Nagendra Nath Choudhury, Ibid, 1940 (152 Pages)

(6) The Economic Services of Zamindars to the Peasaants and the public as analysed by Prof. Benoy Sarkar/ Nagendra Nath Choudhury, Ibid, 1941

(7) Benoykumar Sarkar— A study/Haridas Mukherjee, Siksha Tirtha Karyalaya, Calcutta, 1953

(8) My Life with Prof. Benoykumar Sarkar (as Compiled and translated from the German text by Mrs. Indira Palit)/Ida Sarkar, Prabhat Karyalaya, Calcutta, 1977 (96 Pages)

(9) The Political Ideas of Benoykumar Sarkar/Bholanath Banerjee, Calcutta, 1984 (187 Pages)

(10) Indian Sociology, the role of Benoy Sarkar/Swapankumar Bhattacharya, Calcutta, 1990 (231 Pages)

-ঃ বিনয় সরকার সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ-তালিকা ঃ-

(ণ) বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(১) বিনয় সরকার / হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অর্থশাস্ত্র (বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ) পত্রিকা, কলিকাতা, ১৯৮৫

(২) অধ্যাপক বিনয় সরকার স্মরণে / হীরেন্দ্রনাথ রায়, তদেব, ১৯৮৫

(৩) চিন্তানায়ক বিনয় সরকার / হরিদাস মুখোপাধ্যায়, আকাদেমি পত্রিকা, কালিকাতা, ১৯৮৮

(৪) বাংলা চতুর্দশ শতকে বাঙালীর জীবন ও মনীষা / হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বসুধারা পত্রিকা, কলিকাতা, ১৯৯৪

(৫) জন্মশতবর্ষের আলোকে বিনয়কুমার সরকার / অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, দেশ, ১৯৮৭

(৬) গম্ভীরা ও আচার্য বিনয়কুমার সরকার / ডক্টর প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ সমাচার, ২৩/১২/১৯৮৭

(৭) শতবর্ষের পূণ্যলোকে আচার্য বিনয়কুমার / ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ, ভারত কথা, ২৪/১২/৮৭

(৮) আচার্য বিনয়কুমার সরকার ও তাঁর 'ইকনমিক ডেভল্যাপমেন্ট' গ্রন্থ /ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ, গৌড়কণ্ঠ, ২৯/১২/১৯৮৭

(৯) শতাব্দীর সীমান্তে—আচার্য বিনয়কুমার / যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতকথা, ২৪/১২/৮৭

(১০) বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার/কালিদাস মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৬

(ত) ইংরাজী ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ঃ-

(1) Benoykumar Sarkar : The Theoretical Foundation of Indian Capitalism —The Bengalee intellectual tradition from Rammohun Ray to Dhirendra Nath Sen/ Amalkumar Mukherjee. K. P. Bagchi & Co, Calcutta, 1979

(2) Sociological thinking of Benoykumar Sarkar, Sociologist Perspective (Volume-6, No-4)/ Bholanath Banerjee, Calcutta.

(4) East is West and Vice Versa/Haridas Mukherjee, AmritaBazar Patrika, 4-10-87

(5) A Meterial Idealist/Amal Mukhopadhyay, The Statesman, 21-12-1987

—ঃ—

—ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ—

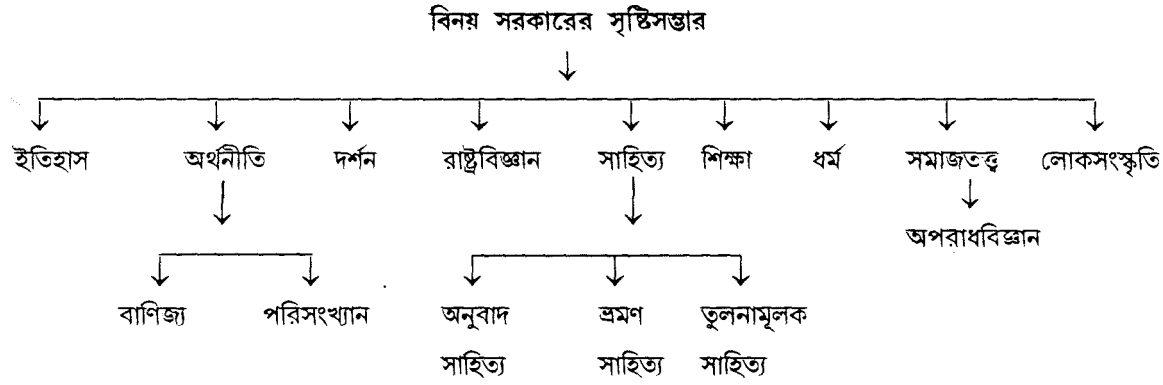
রচনাবলীর শ্রেণীবিভাগ



* * * * *

রচনাবলীর শ্রেণীবিভাগ

বিনয় সরকার সৃষ্টি-প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। পাণ্ডিত্যে তিনি রত্নাকর বিশেষ। তাঁর রচনাবলীর ব্যাপকতা বিস্ময়কর। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা এত বেশী ছিল যে, তা সাধারণ পণ্ডিতদের নাগালের বাইরে ছিল। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, অপরাধ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অপার আধিপত্য। এখানে বিনয়কুমারের সৃষ্টির শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া যায়—



এ সকল বিষয়েই তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা, তুলনামূলক আলোচনা ও বিজ্ঞানসম্মত কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত হয়েছে। বিদ্যার বিচিত্র বিভাগে পারদর্শী বিনয় সরকার এক ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথা স্বতঃই প্রতীয়মান যে—বিনয় সরকারের পাণ্ডিত্যের পরিধি যেমন সুবৃহৎ, তেমনি তাঁর সমগ্র রচনাবলীর পর্যালোচনা একজন গবেষকের পক্ষেও দুঃসাধ্য। এই অনন্য মনীষার জন্যই অনেক জার্মান গবেষক তাঁকে জার্মানীর বিখ্যাত পণ্ডিত অসওয়াল্ড স্পেংলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে বাংলাভাষায় তাঁর রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান—এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

"ক"

বিনয়কুমার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদহে জাতীয় শিক্ষা সমিতি স্থাপন উপলক্ষে যে ভাষণ পাঠ করেন তাই **'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা'** নামে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। এই সময় বিনয়কুমার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অভিষিক্ত ছিলেন বলে এর প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনায়। কিভাবে শক্তিসাধন করতে হয়, মানুষের চরিত্র গঠনের কারখানা-কর্মক্ষেত্র, পুরাতন মতে স্বদেশসেবা কি, জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য, ইউরোপীয় ও ভারতীয় মানবজীবনের পার্থক্য কি, আধুনিক ভারতবাসী লক্ষ্য ও আদর্শ কি, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যবোধ কি হওয়া উচিত, জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা কি, স্বার্থত্যাগই প্রকৃত ধর্ম, অভিভাবকের কর্ত্তব্য কি, দেশের আর্থিক অভাবমোচনের উপায় কি ইত্যাদি এই গ্রন্থের বস্তু বিষয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"মানুষের বিবাহ হয় পরিবার ভরণপোষণ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই পরিবারের ভার গ্রহণ ক'রে মানুষ ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতি লাভ করতে পারে বলেই পারিবারিক জীবনের দরকার। যখন দেখা গেল পরিবারই মুক্তির কন্টক হ'য়ে পড়েছে, তখন ও বন্ধন ছিঁড়ে ফেললে কোন দোষই হয় না। ইহাই হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ। মানুষ যে সামাজিক জীব—এ কথাটিরই অর্থ কি? লোকের সঙ্গে মিলেমিশে যদি না থাকে, তবে তার কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক; কোন উপকারই হয় না। সুতরাং ব্যক্তিত্ব বিকাশই সামাজিকতার উদ্দেশ্য।" (পৃঃ ২৭)

ছাত্রগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত হল "দেখো, সর্বদা সতর্কতার সহিত চ'লো। কেউ যেন কোন খুঁত ধরতে না পারে, তোমাদের আদর্শজীবন গড়ে সামাজিক ভাল মন্দের নূতন Standard, নূতন মাপকাঠি প্রস্তুত করতে হবে। অভিভাবক ও বৃদ্ধদের বুঝাতেছ, তর্কে পরাস্ত করছ বলে ভক্তির হ্রাস বা অশ্রদ্ধা যেন না হয়। ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করতে হবে—উচ্চ স্বভাবের প্রকৃতি হচ্ছে নম্রতা। বয়সে বৃদ্ধ বা অন্য কোন ভাবে পূজনীয় ব্যক্তিদের নিন্দা বা অপমান সূচক বাক্যব্যবহার একেবারে বর্জ্জন করতে হবে। - - - - সকলের সঙ্গে সমান হতে গিয়ে ৯ বছরের আর ১৯ বছরের ছেলের কোন বিষয়ে একই অধিকার কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। - - - - সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে অধিকতর যত্ন করতে হবে। বইপড়া ও বিদ্যাভ্যাসকে একেবারে তুচ্ছ মনে করো না।" (পৃঃ ৪৪) তিনি মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির মঙ্গল কামনায় প্রকৃতিদেবীর কাছেও প্রার্থনা জানিয়েছেন।

১৯১০ সনে 'শিক্ষাবিজ্ঞান সিরিজে' বিনয়কুমার 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' (পৃঃ ৬৪), 'প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা' (পৃঃ ১৭৫) ও 'ভাষা ও শিক্ষা' (পৃঃ ১২০) শীর্ষক তিনখানি পস্তক রচনা করেন।

'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা'র দুইরকম অর্থ করা হয়েছে। প্রথমতঃ শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা তার প্রাথমিক আলোচনা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ প্রণয়ণের পরিকল্পনা করেছিলেন—এই গ্রন্থের প্রকাশে তার সূচনা হয়েছিল।

এই গ্রন্থটিকে বারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। (১) মানবিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি, (২) শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ, (৩) শিক্ষাদানের আরোহ প্রণালী, (৪) ভাষাশিক্ষা, (৫) ইতিহাস পাঠ, (৬) ভূবিদ্যা পাঠ, (৭) মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান পাঠ, (৮) গণিত পাঠ, (৯) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষা, (১০) আরোহ প্রণালী সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য, (১১) পুস্তকের মুখবন্ধ এবং (১২) গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা।

বিনয়কুমার বলেছেন যে, শিক্ষকদের তিনপ্রকার কর্তব্য থাকে। ফলে শিক্ষাবিজ্ঞানও তিনভাগে বিভক্ত হবে, যেমন—শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাশিল্প। তাঁর মতে শিক্ষা মানবজীবন গঠন পদ্ধতির সহায়ক। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই পদ্ধতির সহায়ক হতে হবে। শিক্ষকের কর্ম হওয়া উচিত আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ছাত্রকে সহায়তা করা। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে—"বিভিন্ন ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে করিতেই সেই সেই ভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইবে, বাক্য ব্যবহার করিতে হইবে, অশুদ্ধ বাক্য সমূহকে শুদ্ধ করিতে শিখিতে হইবে এবং সর্ব্বদা কথা বলিয়া সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। বাক্য ব্যবহার করিতে করিতেই ব্যাকরণের বিষয়ীভূত নিয়মাবলি আয়ত্ত হইয়া যায়।" (পৃঃ ২৪) —তিনি লিখেছেন যে, "আদর্শবাদিগণ ও আত্মোৎসর্গকারিগণ একনিষ্ঠভাবে ও সাগ্রহে শিক্ষাক্ষেত্রে আসিয়া সম্মিলিত হইবেন। মানুষ তৈয়ারের সংস্কৃতি বিস্তারেই আমাদের দেশের কোন কোন শ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইবে।"

'প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা' গ্রন্থটি 'শিক্ষাবিজ্ঞান' পুস্তকের প্রথম ভাগের প্রথম অংশ মাত্র। এর বস্তুবিষয় 'শিক্ষাপদ্ধতি'। প্রথমে দেশ, কাল ও জাতিগত বিভিন্নতা অনুসারে "শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য" এবং "জাতীয় চরিত্র ও যুগসভ্যতার সহিত শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ" ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে, পরে প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে।

আচার্য সরকার প্রাচীন গ্রীস বলতে এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টাকে বুঝিয়েছেন। তিনি স্পার্টার সামরিক-সামাজিক গঠনোপযোগী শিক্ষানীতির বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থকার তিন যুগে ভাগ করে গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতিকে বিশেষভাবে বিবৃত করেছেন। হোমর, হেরডোটাস, ঈসকাইলস্ ও সফোক্লিস, সক্রেটিস ও প্লেটো—কেবল যে একটি শিক্ষাপদ্ধতির ফল, তা কেউ কোন দিন সাহস করে বলতে পারবে না। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক জীবন যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে অনুপ্রাণিত করে এবং নিজেও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ও তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিকাশ হয়, গ্রন্থকার সেটাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। স্বরাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয়-জীবনকে কেন্দ্র করে একটা জাতি কতদূর উন্নতি করতে পারে এবং তাদের শিক্ষাপদ্ধতি কেমন আকার ধারণ করতে পারে—তাই এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে।

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ । ইতিহাসের যে সকল স্তরের মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানবজাতি একটি সমন্বয়ের দিকে এগিয়েছে—প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতবর্ষ হচ্ছে তার মধ্যে দুটি প্রধানতম স্তর। এই দুই স্তরের আদর্শ এবং আরও অনেক আদর্শ সম্মিলিত হয়ে, পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে। প্রকৃতির অন্তর্গত সত্য, শিব, সুন্দরকে আশ্রয় করে বিজ্ঞান, শিক্ষা ও কলাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হবে। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে এক করে সত্য, বিজ্ঞান, বিশ্বজনীন প্রেমের ওপর সমস্ত মানব-পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করবে। ভবিষ্যতের শিক্ষাপদ্ধতি সেই আদর্শেরই অনুযায়ী হবে।

"ভাষাশিক্ষা" গ্রন্থটি 'শিক্ষাবিজ্ঞান' গ্রন্থটির তৃতীয় বিভাগ। এই গ্রন্থটিতে ভাবের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিনয় সরকার আলোচনা করেছেন। ভাবের ক্রমিক-বিকাশ সম্পর্কে বলেছেন—**একবারে একাধিক বিষয়ে ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব, বয়স অনুসারে ভাবের বৈচিত্র্য জন্মে, পরিচিত ভাবের ভিত্তির ওপর নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়, ভাব ক্রমশঃ প্রণালী-বদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত হয়।**

ভাষার ক্রমিক বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন মানবের ভাবপ্রকাশপ্রণালী এবং বিভিন্ন মানবসঙ্ঘের ভাষার পরিপুষ্টির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করলে, ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। মানবের ভাষা একই বয়সে সর্ব্বভাবব্যঞ্জক হতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বাক্যসমূহ বিবিধ বিষয়ক হয়। বাক্যসমূহ ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ হয়ে সাহিত্যে পরিণত হয়।

মাতৃভাষা শিক্ষা করতে হলে শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকেই তার আজন্ম ব্যবহৃত বাক্যরচনা প্রণালী তার সর্ব্ববিধ মনোভাব প্রকাশে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করতে হলেও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রণালীই অবলম্বন করতে হবে। ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

১৯১২ সালে প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হল **"শিক্ষা সমালোচনা"** (পৃঃ ১৪০)। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন বিচারপতি বরদাচরণ মিত্র। বিনয়কুমার ১৯০৭ খৃঃ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সভাসমিতিতে নিজস্ব লিখিত ভাষণ পাঠ করেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় নানা বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইসব ভাষণ-প্রবন্ধের সংকলনই এই গ্রন্থ।

বিনয় সরকারের মতে শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের খাওয়া-পরার কথাটারও মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে জীবন কোন্ কাজে সমর্পণ করা হবে, তা আগে থেকেই স্থির করা উচিত। পাঠদ্দশার কর্মজগতে আধিপত্য বিস্তারের আয়োজন থাকা দরকার। কাজ করবার শক্তির বিকাশ এবং বৃদ্ধি হওয়াও যে ছাত্র জীবনেই আবশ্যক, তা অনেকের মনে থাকে না। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সেটাই যাতে মনকে—ভাবে ও চিন্তায় পরিপূর্ণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই চিন্তা ও ভাবরাশিকে কার্যে পরিণত করারও ব্যবস্থা করে দেয়। স্বাধীনচিন্তার সুযোগ ছাত্রদের থাকা দরকার। স্বদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসই—উন্নত শিক্ষালাভের লক্ষণ। আলোচিত বিদ্যাই অন্নসংস্থানের উপায় হওয়া আবশ্যক।

বিনয় সরকার পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন তা ছাত্রদের মানসিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক। তিনি মনে করতেন দৈনিক কাজের পরীক্ষার ফল গ্রহণ করা উচিত। এতে ছাত্রেরা স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিত রূপে কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের বই ছাড়া দুচারখানা বই বেশী পড়লে মনোবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তা কেবল পরীক্ষার ফলের জন্য নয়, সব সময়েই কাজে লাগে। আরোহ-পদ্ধতিতে শিক্ষা, শিক্ষাপ্রণালীতে পুস্তক, সূত্র ও নিয়মসমূহের স্থান গৌণ—ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞানাগার, কৃষিক্ষেত্র ও কারখানার স্থানই মুখ্য।

তিনি জাতীয় শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন যে—"সমগ্র সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষের বিকাশ সাধন করিয়া যে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় প্রকৃতি ও বিশেষত্বের পরিণতি ও পূর্ণতা বিধানের সহায় হয়, সেই জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকল্প সাধনোপযোগী শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা।"

ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর মত হল যে, বাক্যরচনার দ্বারা ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করতে পারলে শিক্ষার্থীর শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য ভাষা-শিক্ষা করতে হলেও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রণালীই অবলম্বন করা দরকার। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার, অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার মত ধর্মশিক্ষায় মস্তিষ্ক সঞ্চালন হয়, চিন্তা করার ক্ষমতা বিকশিত হয়, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সাহায্য হয়, আর সামাজিক পুষ্টি হয়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বিনয়কুমার যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিপুল বিস্তৃত ও দুঃসাধ্য।"

১৯১২ সালে তাঁর আর একটি গ্রন্থ **"ঐতিহাসিক প্রবন্ধ"** প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ এখানে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। ইতিহাস দর্শন পরিষ্কারভাবে, সূত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছে তবুও এই গ্রন্থে আচার্য সরকারের মূল বক্তব্য কি তা দেখা যেতে পারে।

এক ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে মানবসভ্যতার গতি ও প্রকৃতির পর্যালোচনাই ছিল বিনয়কুমারের স্বভাবসিদ্ধ। এজন্য তাঁর মতো ঐতিহাসিককে নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি বিষয়েও স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন হয়ে থাকে। খণ্ড ও অংশের অধিকার না থাকলে সমগ্র মানবজাতির পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় না।

তিনি ঐতিহাসিক আলোচনার যথার্থ বস্তু হিসাবে রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'সমাজ'কে গ্রহণ করেছেন।

"ইতিহাসের উপদেশ" প্রবন্ধে—ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অবস্থা, উন্নতি অবনতি, জাতীয় চরিত্রের অভিব্যক্তি, ইতিহাসের ধর্মতত্ত্ব ও নীতিকথা, ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইতিহাস নাট্যে ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিপথ প্রদর্শন, সদসতের সম্বন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে।

'বিপ্লবে'র আনুষঙ্গিক ফল হল—"মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম যখন পরস্পর সম্বন্ধ, তখন ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতিতে অথবা ধন সম্পদের হ্রাসে বা বৃদ্ধিতে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অপরাপর সকল বিষয়েই উন্নতি অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিকই বটে। ফরাসী বিপ্লবে - - - - প্রত্যেক বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার ঢেউ, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আন্দোলন আসিয়া আঘাত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মের আন্দোলন - - - - রাজার কর্ত্তব্য, জাতীয় ঐক্য, বিদ্যা শিক্ষা, জাতির সঙ্গে জাতির আদান প্রদানের নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই রূপান্তরিত হইয়া নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।" (পৃঃ ২৫)

প্রাচীন গ্রীসের বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রের সামাজিক জীবন বিকাশেই ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা। প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব হল—(১) ব্যক্তির মধ্যে নিখিলের উপলব্ধি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের লাভ (২) ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকাশ।

এতিহাসিক গবেষণার উল্লেখযোগ্য রচনা হল—"ইতিহাস বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধ। ব্যক্তি সমাজ ও জাতির উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে বিশ্বশক্তির যোগাযোগই ছিল এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

"ইউরোপ ও ভারত" প্রবন্ধের বক্তব্য হল—ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র সংসারে পার্থিব উন্নতিই চরম লক্ষ্য। আর ভারতবর্ষের আদর্শ এর বিপরীত। "আত্মবশতাই যে সুখ—এ ভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত।" (পৃঃ ১১৯) ভারতবর্ষই যথার্থভাবে প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনস্থল। ভারত সমাজে—বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয় ঘটেছে। "ভারতের প্রকৃত উন্নতিতেই ইউরোপের মুক্তি।" (পৃঃ ১২৯)

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'সুপ্রভাত', 'আর্য্যাবর্ত', 'বাণী', 'মানসী', 'প্রতিভা' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর **'সাধনা'** গ্রন্থ (পৃঃ ১৭২) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। 'হিন্দু ও মুসলমান', 'নিম্নশ্রেণীর অধিকার', 'সমাজ পদার্থবিজ্ঞানের অভাব', 'আমাদের কর্ত্তব্য', 'নেতৃত্ব', 'আমাদের জাতীয় চরিত্র', 'ভাবুকতা', 'ধর্মের প্রকৃতি অসীমের উপলব্ধি', 'ভাষাবিজ্ঞান' প্রভৃতি প্রবন্ধ যোগ করে 'সাধনা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধতে বিনয়কুমারের দূরদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উপলব্ধি করে তা তাঁর সমগ্র জীবনে ও কাজে প্রতিফলিত করেছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পরে কি ঘটবে, তা যেন তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকার অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন—"গ্রন্থখানি একেবারে ভাবসমুদ্র। গুরুতর বিষয়ে, সর্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে এমন আড়ম্বরশূন্য, অলংকারশূন্য নিরেট ভাষায় এত কথার আলোচনা বোধহয় বাঙ্গালায় আর নেই।"

আজ থেকে ৮৪ বৎসর পূর্বে "নিম্নশ্রেণীর অধিকার" প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"যাদের হাটে-বাজারে পাই, রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়, যারা দোকান করে, ব্যবসা করে, ঘরে বসে থাকে, তারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের লোক। এদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। বড় একটা কাজ করতে হলে যে ধনের প্রয়োজন তা কেবল দু'জন একজন বড়লোকের দানে সংগৃহীত হলে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কাজ হলো না। সমস্ত জাতির পক্ষে মঙ্গলকর কাজ সেটাই যাতে ইতর, দরিদ্র, ধনী, জমিদার সকলে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার সাহায্য করবার জন্য যত্ন করে।" (পৃঃ ৫৮)

বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেছেন—"মহা 'অসৎ' হতে 'সৎ'-এ যাবার জন্য আমাদের জেলায়-জেলায়, বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার গন্ডী বিস্তৃত করতে হবে।" (পৃঃ ৬২)

গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন—"সমগ্র সমাজের লোককে যথাসাধ্য ত্যাগ শিক্ষা করতে হবে। কাঙ্গাল, গরীব, মুটে, মজুর সকলের ধনেই দেশের ধন, সকলের শক্তির একীকরণে দেশের সামর্থ্য।" (পৃঃ ৬৬)

তিনি দেশনায়কের চরিত্র সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন তা হল—নেতা সমগ্র দেশের, সমস্ত সমাজের প্রতিভূস্বরূপ, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কর্ম্ম ও ভাবের আদান প্রদানে বর্দ্ধিত হয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে রাজা হয়ে বসবেন। তাকে দেখলেই সমস্ত সমাজের আদর্শ বোঝা যায়।

তাঁর মতে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে বিশেষত্ব হল অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণুতা। শিক্ষাব্যবস্থায়, ব্যবসায়ে, চিকিৎসায়, অন্নসংস্থান ও সংসার-যাত্রা নির্বাহে ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট।

'ভাবুকতা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন—"মানুষ ভালবাসে কিন্তু তার অর্থ কি? কেবল আঁখি ভরা জল, ভগবানের আরাধনা আর পরোপকারের অর্থ সংযম ও কঠোরতা। লোকে বড় হয়—কেবল ছোট হয়ে। স্বাধীনতার অর্থ নিয়ম ও ধর্মের অধীনতা।" (পৃঃ ৯৩)

"ধর্ম্মের প্রকৃতি অসীমের উপলব্ধি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, ধর্ম্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্যে প্রকৃতি-নিরীক্ষণ ও প্রকৃত অর্থ খুঁজতে হবে। মানুষের ধারণা শক্তি তিনপ্রকার (১) ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, (২) যুক্তি-বিজ্ঞান, (৩) ধর্ম্ম-জ্ঞান ইত্যাদি। ধর্ম্মের বিশিষ্ট বিষয় হচ্ছে 'অসীম'।

"সাহিত্যশ্রেষ্ঠী" প্রবন্ধে বলেছেন—জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান। জাতীয় সাহিত্যে বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রভাব এবং জীবনে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য শিক্ষাপদ্ধতির বহুমুখীনতা থাকলে সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়। তাঁর মতে, বিদ্যালয়ের সকল স্তরে মাতৃভাষা প্রচলিত হলে, শিক্ষাপদ্ধতি স্বাভাবিক হবে। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় বিনয় সরকার বহুকাল পূর্বে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির কথা অনুভব করেছিলেন।

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা তাঁর গভীর মননশীলতা, বিপুল তথ্য ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় **"নিগ্রোজাতির কর্মবীর"** (পৃঃ ২৭৬)। আমেরিকার প্রসিদ্ধ টাস্কেগী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের 'আত্মজীবনচরিত' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থ। একে যে কোন দেশের যে কোন কর্মবীরের আত্মজীবনচরিতরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই অনুবাদ প্রথমে 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ পায়।

টাস্কেগীর প্রতিষ্ঠাতা বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির অন্যতম জননায়ক। ইনি স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা-প্রচার, বাগ্মিতা এবং মানব-সেবা সর্ব্বত্র সুবিদিত। গ্রন্থ-প্রণেতার জন্মভূমি রিচমন্ড নগর—গোলামী প্রথার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানেই লেখকের জীবন শুরু হয় দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে। লেখক জীবনে সাফল্য লাভ করেন অনেক সংগ্রামের মধ্যে। এই আত্মজীবন চরিতের সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেন আচার্য সরকার। সেই সময় বিভিন্ন পত্রিকায় এই গ্রন্থের যে সমালোচনা বেরিয়েছিল তার কিছু উদ্ধৃত করা যায়—

বাঙ্গালী পত্রিকা বলে—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরকে আমাদের 'কর্ম্মবীর' বলিয়া মনে হয়।" আনন্দবাজার বলেছে—"এই মহাপুরুষের জীবনের আখ্যায়িকা উপন্যাসের চিত্তাকর্ষী সরল বঙ্গভাষায় অনুদূতি হয়েছে।" ভারতবর্ষ-এর কথায়—'বিনয়বাবু নিজে প্রচারক, যাহাতে দেশের লোক সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের যুবকগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বিভূষিত হয়, তাহারই জন্য বিনয়বাবু এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং চেষ্টার ফলই তাহার এই পুস্তক।"

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর **"বিশ্বশক্তি"** (পৃঃ ৩২৪) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা এবং তার প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনাই হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ, বিদেশী কোন মহানায়কের জীবনকাহিনী প্রচার, বিদেশের কোন উন্নয়নমূলক প্রচারের কথা দেশের লোকের সামনে তুলে ধরা, বিদেশে গিয়ে দেশের সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালান, বিদেশের গ্রহণীয় বিষয় শিক্ষা করা ইত্যাদি কাজকে বিনয় সরকার 'বিশ্বশক্তির' সদ্ব্যবহার মনে করতেন।

তাঁর মতে, মানবজীবনের ভাঙ্গা-গড়া, রাষ্ট্রিক গড়নের রদ-বদল, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ বা সভ্যতার বিবর্তন—এর কোনটাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল নয়, এদের সবগুলিই 'বিশ্বশক্তি'র সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি—মানবিক ও প্রাকৃতিক যে পরিবেশ—এর সবগুলি আর্থিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রিক ও যৌন ইত্যাদি একত্র করে যে পটভূমি দাঁড়ায় তারই নাম দিয়েছেন 'বিশ্বশক্তি'। কোন জাতির উন্নতি বা অবনতির পেছনে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পরোক্ষ প্রভাব থাকে। কোন দেশের সভ্যতা, জাতীয় চেষ্টা এবং বৈদেশিক চিন্তা—কর্ম আন্দোলনের প্রভাবে গড়ে ওঠে। জাতীয় উন্নতির জন্য 'বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের' গুরুত্বের কথা স্বীকার করতেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় 'বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের মন্ত্র বিশেষ উঁচু স্থান দখল করেছে।

দেশ ভ্রমণকালে তাঁর লেখনী ক্ষান্ত ছিল না। তিনি যে দেশ ভ্রমণ করতেন সেই দেশের আর্থিক, সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন, ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা "বর্তমান জগৎ" নাম দিয়ে লিখতেন। তাঁর এইসব রচনা বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত এবং পরে সেগুলি গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। এইসব রচনার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠা।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী **"কবরের দেশে দিন পনের"** (পৃঃ ১৭৮)। এই গ্রন্থের দুটি অধ্যায় (১) মিশরের পথে, (২) কবরের দেশে দিন পনের। প্রথম অধ্যায়ে লেখক জাহাজের জীবন, বিদেশযাত্রার সরঞ্জাম, জাপানী ও পার্শী সহযাত্রী, এডেন, লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন। জাহাজের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে লেখক মোহিত হয়েছেন। "জাহাজ জল কাটিয়া দুই একটা তরঙ্গরেখা সৃষ্টি করিতেছে। এই রেখার উপর অসংখ্য প্রতিফলিত চাঁদ কতকগুলি বিদ্যুৎ প্রদীপের মালার মত দেখা গেল।" (পৃঃ ১১)

লেখকের দার্শনিক মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে—"জ্ঞানে আমরা যতই বড় হইতে থাকি না কেন, ভক্তি দ্বারা আমরা নিজকে সর্ব্বত্র ছোট করিতে শিখিব। হৃদয়কে বড় করিতে পারিলেই কীটপতঙ্গ, পশু, পক্ষী, তরুলতা সকলের মধ্যে মহত্ত্ব দেখিতে পারিব। আত্মার উদারতা জন্মিলেই অসীম-অনন্ত-ঐশ্বর্য্য দেখিতে সমর্থ হইব"। (পৃঃ ১৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কাইরো নগরের রূপ বর্ণনা করেছেন। কাইরো নগরে অসংখ্য প্রকার ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসী জাতিপুঞ্জের বাস। ডাচ, গ্রীক, ইতালীয়, ব্রিটিশ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গৃহ নির্মাণ প্রণালীর প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু এ সবের মধ্যে একটা মুসলমানী রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কাইরোকে তিনি জগতের সর্বপুরাতন রাষ্ট্রকেন্দ্র বলেছেন। এই শহরের অতীত সম্বন্ধেও কিছু তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। পর্ব্বত-গুহার মিশরীয় শিল্প সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন এবং কাইরো দেশের বিচারব্যবস্থা বা আইন সম্পর্কেও তিনি তথ্য পরিবেশন করেছেন।

লেখক মিশরের অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি দেখেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্যদৃঢ়তা ছাড়া বাহ্য সম্পদের পিছনে তিনি গভীরতর জীবনশক্তির পরিচয় পাননি। অন্যান্য জাতিরা মিশরবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, রাষ্ট্র, সমাজ চিন্তাপ্রণালীকে যে আকার দিতে চেয়েছে, সেরকমই সাধিত হচ্ছে। তাই মিশরে অন্যান্য জাতির কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়—সেখানে মিশরবাসীর সুর অতি ক্ষীণকণ্ঠে প্রচারিত হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'যুবক বাংলা' মোটামুটি প্রভাবিত ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে। **"রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী"** গ্রন্থটি আচার্য সরকারের রচিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রবন্ধাকারে 'গৃহস্থ' মাসিকে বেরোয়।

একালের অনেকেই জানেন না যে, বিনয় সরকার ছিলেন রবীন্দ্রচর্চায় এক দিকপাল মনীষী। ১৯০৫ সনের 'যুবক বাংলা' তার জীবন প্রভাব শুরু করেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অগ্নিরস আকণ্ঠ পান করে। রবীন্দ্রনাথ সেই 'যুবক বাংলার' অন্যতম স্রষ্টা।

অনেকের ধারণা যে 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বিরাট স্বীকৃতি পাবার পূর্বে রবীন্দ্র প্রতিভা বাঙালীর কাছে ছিল অবহেলিত, তাই 'নোবেল' পুরস্কারের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিলাভের পর যখন কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বাঙালীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল শান্তিনিকেতনে যান, তখন অভিমান ভরে কবি যে তাঁর অনাদরের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি করেন, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই বলে বিনয় সরকার সুস্পষ্ট মন্তব্য করেন। তিনি বলেছেন ১৯০৫ সনের 'যুবক বাংলা' রবীন্দ্রনাথকে মাথায় করে রেখেছিল। ১৯১১ সনে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিনয় সরকার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র হাতে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করে একটি তহবিলের সৃষ্টি করেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডারের থেকে বাছাই করা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

বিনয় সরকার রবীন্দ্র সাহিত্যকে—বিশ্বকোষ বুঝেছিলেন। তাঁর মতে, "কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত ভক্ত, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত শাক্ত, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত প্রেমিক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের ন্যায় অসীমের ও ভূমানন্দের উপাসক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ন্যায় স্বদেশভক্ত,—সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের পূজা-প্রবর্ত্তক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের প্রতিমূর্তি, প্রকৃতি রাজ্যের প্রজা, পল্লীরাণীর ভৃত্য, স্বাধীনতার চারণ।" (পৃঃ ১৪৬) আচার্য সরকার মনে করতেন, ভারতবাসী কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথকে একই আসনে বসিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে।

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় কাব্যরচনা ও স্বদেশসেবা, স্বদেশের স্বর্ণসিংহাসন, রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণবের ভক্তিযোগ, ভক্তিতত্ত্বে প্রকৃতি পূজা, কবিবরের শাক্তভাব, পরং ত্যাগবলং বলম্, কাব্যে বিপ্লব তত্ত্ব, প্রকৃতি পূজা, মিষ্টিসিজম, অধ্যাত্মবাদ, কালিদাসের হিন্দুত্ব, রবীন্দ্রনাথের হিন্দুজগৎ, রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রথম কথা ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। স্বাধীনতার গান ও গল্প রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষত্ব। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভগবান আত্মীয় ও মানুষময় বেশী।

রবীন্দ্রসাহিত্যের দুর্বলতাও লক্ষ্য করেছেন বিনয় সরকার। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাঁর সজাগ বিশ্লেষণের অভাব দেখা যায়। এছাড়া মুসলমান নরনারীর ব্যক্তিত্বও কম আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রগদ্যে।

ঐ সালেই অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে **"ইংরাজের জন্মভূমি"** (পৃঃ ৫৮৬) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি যখন এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন ভারতবর্ষ ইংরাজ সরকারের অধীন ছিল। তিনি বৃটেনের ভাল-মন্দ দুই দিকই পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি বৃটেনের সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক সূত্রে ভারতের বিরাটত্ব বা বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন।

বক্ষ্যমান গ্রন্থে বৃটেনের নগরজীবন, শাসনব্যবস্থা, পল্লীজীবন, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক জীবন, স্বদেশসেবা, আইরিশ জাতি ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। বিনয়কুমারের মতে, ইংরাজের উন্নতি নেপোলিয়নের পতনের পর হয়েছে। বৃটেনের যাদুঘর থেকে শিল্পী, ব্যবসায়ী, মহাজন, ব্যাঙ্কার, বৈজ্ঞানিক, ধনবিজ্ঞানবিৎ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ বৈষয়িক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধাগুলি বুঝে নিতে পারেন। এর ফলে ইংরেজের ধনশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি বেড়েছে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী ইংরেজের বাহ্যগুণ পেয়ে বিস্মিত হত। ভারতবাসী ইংরাজমাত্রকেই হর্তা-কর্তা-বিধাতারূপে দেখে, কিন্তু বিলাতে গিয়ে ইংরেজকে ভৃত্যরূপে এবং ভৃত্যোচিত নম্রতা দেখে ভারতীয়রা বিহ্বল হয়ে পড়েন।

সেকালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিলাতী কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করা যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে বিশেষ সম্মানের বিষয় মনে করা হত। কিন্তু বিনয় সরকার এই ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করতেন। কারণ তাঁর কাছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলিকাতা বা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কেম্ব্রিজে যে ধরণের প্রশ্নপত্র করা হয় তা চির পরিচিত। সেখানে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে কোন নিকট সম্পর্ক বা ভাবের আদান-প্রদান অতি অল্প হয়।

বিলাতের জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয়দের ধারণা ছিল, বিলাতে গরীব নেই। কিন্তু এ ধারণা ভুল ছিল। বিনয়কুমার লিখেছেন যে—"বিলাতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরল নয়, ভিক্ষুক সংখ্যাও কম নয়। প্রতিদিনই ভিখারী দেখতে পাই।" (পৃঃ ৩৮১) ভারতীয়দের থেকে ইংরাজরা কারিগরী বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিল না।

এডিনবরার ব্যারাক-জীবন প্রসঙ্গে ভারতবাসীর প্রকৃতিপূজার কথা উঠিয়ে তুলনামূলকভাবে তিনি বলেছেন যে, "ব্যারাকের মানব জীবন অতি বিচিত্র। স্বামী স্ত্রী মিলিয়া একটি পরিবার গঠিত। কাহারও বা দুই একটি সন্তান আছে, কাহারও নাই। - - - - অনেক স্থলে একটি রমণী মাত্রেই পরিবার কোথাও বা একজন মাত্র পুরুষই কামরার অধিবাসী।" (পৃঃ ৪৬৬) "ভারতের কুটীরে গোশালা হইতে তুলসী গাছ পর্য্যন্ত, শালগ্রাম শিলা হইতে খুড়তুত ভাইয়ের মাসতুত ভাই পর্য্যন্ত বাস করে। সুতরাং পরিবারের মধ্যে বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য, জীবনসত্তা, সরলতা আছে। - - - - হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মেই প্রকৃতিপূজা স্থান পাইয়াছে। - - - ইহাদের (ইউরোপের) সাধারণ জীবন নিতান্তই অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ।" (পৃঃ ৪৬৭-৪৬৮)

এই গ্রন্থটি—পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিল্প জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা, ভাবধারা, সভ্যতা, শিল্প জীবনযাত্রা প্রণালীর এক তুলনামূলক আলোচনা। এরকম ভ্রমণকাহিনী পূর্বে আর লেখা হয়নি।

ইংল্যাণ্ডকে নিয়েই আর একটি গ্রন্থ **'বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র'** (১৯১৪ খৃঃ) (পৃঃ ১২৬) রচিত হয়েছিল। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে যে সকল বিষয় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তা তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ এই গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায়শ্চিত্ত, শত্রুতা কাকে বলে, লড়াইয়ের খরচ, যুদ্ধকালে টাকার বাজার, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের হুজুগ; লড়াইয়ের সময়ে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, আমদানি, রপ্তানী ও দালালি; যুদ্ধারম্ভে নগর দৃশ্য, শত্রুপক্ষীয়গণের সামরিক ও সাধারণ লড়াইমণ্ডল ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বিলাতে স্বদেশ রক্ষার আন্দোলন, বর্তমান কুরুক্ষেত্রের যুযুৎসু, লড়াই মণ্ডলের নিয়ম, দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রয়াস, যুদ্ধকালে সমাজসেবা, ত্রিধাবিভক্ত পোল্যাণ্ড, শ্রমজীবী সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

"চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" গ্রন্থটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চীনদেশে অবস্থানকালে সেই দেশের সভ্যতা, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অধ্যয়ন করে ভারতের সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ের তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতাবলী প্রবন্ধাকারে 'ভারতবর্ষ', 'উপাসনা', 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি একত্র করে গ্রন্থের আকার ধারণ করে। যে সকল প্রবন্ধ এই গ্রন্থে আছে সেগুলি হল—চীনের রাজবংশ, চীনাদের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের চীনা অনুবাদ, চীনা শিল্পশাস্ত্র, চীনাদের কালিদাস লী-পো, চীনা কাব্যের ত্রি-বীর, পো চুই-এর বীণাওয়ালী, চীনাদের প্রেম সাহিত্য, কল্পান্তস্থায়ী অত্যাচার, চীনা কবিদের প্রকৃতিনিষ্ঠা, তাও-সাধক কবিবর হুকুও ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের রাজবংশের কার্য্যাবলীর সঙ্গে চীনের রাজবংশের তুলনা করা হয়েছে 'চীনের রাজবংশ" প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন "ভারত সাম্রাজ্য চীন সাম্রাজ্য অপেক্ষা শতবর্ষ প্রাচীন। বস্তুতঃ কাল হিসাবে আমাদের চন্দ্রগুপ্ত দুনিয়ার সর্বপ্রথম সম্রাট।" (পৃঃ ১৯)।

চীনাদের ইতিহাস, সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য আলোচনা করেছেন। অবশ্য ভারতবর্ষের দোষত্রুটি তাঁর কাছে অগোচর থাকেনি। এই প্রবন্ধে বিনয় সরকারের বিদ্যাবত্তা, স্মৃতিশক্তি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয়লভ্য।

যুদ্ধ সম্পর্কে 'চীনা কাব্যের ত্রিবীর" প্রবন্ধে বলেছেন—"জগতের ইতিহাসে কোনদিন যুদ্ধ থামে নাই—থামিবেও না। কিন্তু চিরকালই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে।" (পৃঃ ১৩৩) যুদ্ধে যে প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, তাতে তার আত্মীয়কে সেই আঘাত জীবনব্যাপী বয়ে বেড়াতে হয়। কিন্তু এই অগ্নিপরীক্ষাতেই চরিত্র গঠিত হয়।

চীনাদের প্রেম-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিনয়কুমার বলেছেন যে, কাব্যের আসরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান পার্থক্য করা যায় না। মানবচিত্ত দুনিয়ায় সর্বত্র একইভাবে সাড়া দিয়েছে। জগতের মানুষ এবং মানুষের হৃদয় এক। "এই কারণে হোমরও হিন্দু, বাল্মীকিও গ্রীক, কালিদাসও জার্মান, গ্যেটেও হিন্দু, রবীন্দ্রনাথও পশ্চিমা, হুইটম্যানও পূরবী"। (পৃঃ ১৬৮)

এই গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধে বহু চীনা কবিতার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনূদিত কবিতাগুলি পড়লে মনে হয় না যে এগুলি অনুবাদ করা হয়েছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়কুমারের **"পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"** (পৃঃ ৩৫৫) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জার্মান লেখক 'এঙ্গেলস্'-এর জার্মান গ্রন্থের অনুবাদ এটি।

এই গ্রন্থে মান্ধাতার আমলে মর্গ্যানের প্রাচীন সমাজ, মানবজাতির সহজ এবং বার্ব্বার যুগের কথা, পরিবারের ইতিহাস ও বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা, জোড় পরিবার, ইরোকোআদের গ্রীকসমাজের গোষ্ঠীপ্রথা, কেল্টিক্ ও জার্মান জাতির গোষ্ঠীপ্রথা, আথেনিয় এবং জার্মান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বার্ব্বার জীবন ও উৎকর্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।

"এঙ্গেলস তাঁর রচনাকে 'পরিবার নিজস্ব বা ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামে প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই গ্রন্থে প্রথম বিবৃত হইয়াছে পরিবার বা বিবাহপদ্ধতি ও যৌনসম্বন্ধের ইতিহাস। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়, গেন্স্ বা গোষ্ঠী প্রথার সমাজ শাসন। এঙ্গেল্সের তৃতীয় কথা, গোষ্ঠীর ভাঙ্গন বা রাষ্ট্রের জন্ম। ইণ্ডিয়ান সমাজের লোকেরা গোষ্ঠীকেন্দ্র ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের সমাজে রাষ্ট্রের চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের জন্মকথা, টুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক, রোমান, কেল্টিক্ এবং জার্ম্মান জাতির স্মৃতিশাস্ত্র ও সংহতিগুলা আলোচনা করা হইয়াছে। নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই গ্রন্থের মুখ্য কথা নয়। মুখ্য কথা পরিবার গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র—এই তিন জীবনকেন্দ্রের ইতিহাস। এই কারণে বাংলা ভাষায় এঙ্গেলসের রচনা 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের জন্মকথা' নামে প্রচারিত হইল।"

এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয় সরকার এঙ্গেলসের উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলেছেন। আর্থিক ইতিহাসের কোন স্তরে ব্যক্তিগত ধনদৌলতের সৃষ্টি হয়েছে সে কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। প্রাচীন মানব-জীবনে যে সমাজ দর্শন ও সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই কথাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বিনয় সরকারের **"দুনিয়ার আবহাওয়া"** (পৃঃ ২৬৮) গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই বছর জার্মানি অষ্ট্রিয়া, সুইটসার্ল্যাণ্ড ও ইতালি—এই চারদেশে বসবাসের আওতায় রচনাগুলির উৎপত্তি। জার্মান, ফরাসী দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলি খবরের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন সেগুলি 'শঙ্খ', 'বঙ্গবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'নব্যভারত', 'সারথি', 'শিশির ভারতী', 'বিজলী' ইত্যাদি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত। এই সকল প্রবন্ধগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে "দুনিয়ার আবহাওয়া" গ্রন্থে।

সমাজের কোন্ শক্তি আদ্যাশক্তি বা জীবনের কোন রসটা সকলের সেরা—এ সকলের উত্তর অনেক রকমভাবে পাওয়া যায়। কেউ বলেন রাষ্ট্রনৈতিক রসেই সেই আদ্যাশক্তি। আবার কেউ বলেন দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প—দুনিয়ার আবহাওয়ায় আদ্যাশক্তি থেকে জন্ম নিয়েছে। আর এক ধরণের অদ্বৈতবাদী বলেন, কৃষিশিল্প বাণিজ্যের রসই মানবজীবনের সকল রসের গোড়ার কথা।

কিন্তু দুনিয়া বাস্তবিকপক্ষে একই রসে মসগুল নয়। জগৎ দাঁড়িয়ে আছে এই তিন খুঁটির জোরে। দুনিয়ায় যা কিছু বর্তমানে ঘটছে, ভারতেও তা ঘটবে। এই আড়াই বৎসরের মানবপ্রয়াসগুলো, এই গতিশীলতার এবং মানবচিত্তের উন্নতি প্রবণতার সাক্ষ্য দেবে। এইজন্য তথ্যগুলি পরস্পর সম্বন্ধহীন নয়। জগতের সনাতন কথাগুলি দুনিয়ার আবহাওয়ার প্রাণ। রক্তমাংসের "স্বধর্ম"গুলো এই গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার বনিয়াদি সমাজ দুনিয়ার সর্ব্বত্র নরনারীর জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে। এই তিন দেশের ছায়া এই লেখায় পড়েছে। জার্মানীর কথাও 'দুনিয়ার আবহাওয়া'য় আছে। এই গ্রন্থে শিক্ষাসভ্যতা, কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ঘটনা—রাষ্ট্রীয় জীবনে কত প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক যোগাযোগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

বিনয় সরকারের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলায় লেখা একটি বড় গ্রন্থ, **"হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন"** (পৃঃ ৩৬৩)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থটি। গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ে তুলনামূলক বিচার হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক গড়নের সঙ্গে।

'হিন্দু নরনারীর শাসন দক্ষতা' অধ্যায়ে—হিন্দু শাসনে ধনদৌলত, হিন্দু শাসনে পুরুষ ও নারী, ধর্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, জনগণের সমাজকেন্দ্র, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান ধর্ম, প্রতিষ্ঠানের শাসনপ্রণালী, আর্থিক জীবনের গড়ন ও শাসন, 'বিনয়' সাহিত্যে 'ধর্ম্ম' 'স্মৃতি' ও 'নীতিশাস্ত্র' ইত্যাদি কথা আলোচনা করা হয়েছে।

"হিন্দু রাষ্ট্রে স্বরাজ" অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল রাষ্ট্র শাসন, পল্লীকেন্দ্রের শাসনপ্রথা, 'লিপি' সাহিত্য বনাম 'শাস্ত্র' সাহিত্য, নগর শাসন, দেশ-সভা, বিচারব্যবস্থায় জনগণের আত্মকর্তৃত্ব, রাজসিংহাসন, জনসাধারণ এবং স্বরাজতত্ত্ব ইত্যাদি।

"সাম্রাজ্য শাসনে হিন্দু সমাজ" অধ্যায়ে—হিন্দু রাষ্ট্রের সমর বিভাগ, সাহিত্যে হিন্দু সমর শাসন, হিন্দু রাষ্ট্রের সমরাধ্যক্ষ, বিচারব্যবস্থা, কৌটিল্য দর্শনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সরকারী আয়ব্যয়, পররাষ্ট্র বিভাগ, আইন গঠন, আইনের রাজত্ব ও আধুনিকতা ইত্যাদি বিষয় আলোচ্য বস্তু হয়েছে।

"গণতন্ত্রের হিন্দুরাষ্ট্র" শীর্ষক অধ্যায়ে—দুনিয়ায় গণতন্ত্র, গণরাষ্ট্রের শেষ যুগ, আলেকজাণ্ডার বিরোধী পাঞ্জাবীগণ, গণতন্ত্র ও হিন্দু সাহিত্য এবং কালীপ্রসাদের 'হিন্দু পলিটির' যুক্তির অসারতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

বিনয় সরকার এই গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, হিন্দুজাতি 'শক্তিযোগী' এবং 'স্মৈরপ্রিয়', 'হিংসাধর্ম্মী', এবং 'বিজিগীষু'। প্রাচীনকালে হিন্দু জাতি—গ্রীক রোমান ইত্যাদি জাতির সঙ্গে সমান ছিল। এই বইয়ের মধ্যে প্রাচীন 'লিপি', সাহিত্য, মুদ্রা-বৃত্তান্তের ছাপ রয়েছে। ভারতবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বা বই প্রকাশিত হয়েছিল তার ব্যবহারও দেখা যায় এই বইয়ে। সেই যে সকল ঐতিহাসিক ভারতসম্বন্ধীয় বই প্রকাশ করতেন, সেগুলি সবই ইংরাজী ভাষায় রচিত ছিল। এই দিক থেকে "হিন্দুর রাষ্ট্রের গড়ন' বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অভাব দূর করে। এই গ্রন্থটি ঐতিহাসিক বিনয়কুমার সরকারের রাষ্ট্রনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন তথ্যের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। ইউরোপের ইতিহাস ও রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ে বিনয়কুমারের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে।

বিনয়কুমার জাপান ভ্রমণকালে সে দেশের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন তা ১৯২৭ খৃঃ **"নবীন এশিয়ার জন্মদাতা"** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বইটি পাঁচশ পৃষ্ঠার "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ড।

জাপানের ফ্যাক্টরী, রাষ্ট্রশাসন, সমাজকথা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব অভিজ্ঞতা বিবৃত করা হয়েছে, তার অনেকাংশই ১৯২৩ সালে—অতি সেকেলে কথা। ১৯১৫-১৬ সালে যে লড়াই চলেছিল, তখন জাপান—এশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে বেড়ে চলছিল। ১৯১৮ সালে লড়াই থামার পর থেকে সেই বাড়তি থেমেছিল। আবার বোলশেহিক আন্দোলনে, আন্তর্জার্তিক লেনদেনে জাপানী রাষ্ট্র অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাপানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে ইয়োরামেরিকা এশিয়ায় বাধাহীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ পেল। কিন্তু জাপানে দৈবদুর্বিপাকেও নগরের ফ্যাক্টরিগুলো খাড়া ছিল।

জাপান নবীন এশিয়ার জন্মদাতা। কারণ আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তৎভিত্তিক রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণের দিক দিয়ে বিচার করলে এশিয়া মহাদেশে জাপানকে অগ্রণী বলা যেতে পারে। জাপান এশিয়াকে পথ দেখিয়েছে। এই গ্রন্থে জাপানের পাহাড়, বন, নদী, পল্লী, শহর সবই যথাসম্ভব সিনেমা চিত্রের মতন পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাবেশ ঘটেছে এখানে, আবার রাষ্ট্রীয় বিকাশ ও সাহিত্য-সুকুমার-শিল্পেরও নানা রূপের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয়কুমার লিখেছিলেন—"নানা তরফ হইতে জাপানকে বুঝিতে চেষ্টা করা ভারতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। - - - জাপানী শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে যাহা কিছু করিয়াছে তাহার সমান যতদিন পর্য্যন্ত ভারত সন্তানেরা স্বচেষ্টায় সামলাইতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের পক্ষে ইয়োরামেরিকার গণ্যমান্য দেশের উচ্চতর মাপকাঠি চোখের সম্মুখে রাখা মার্জ্জনীয় নয়।"

১৯২৬ সালে "**ধনবিজ্ঞান পরিষৎ**" (পৃঃ ২৭) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে বাঙালীর দুর্ব্বলতা হচ্ছে—তারা ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় বিশেষ কাঁচা। কারণ ইংরাজী বা বাংলা সাহিত্যে ধনবিজ্ঞানের ছাপ পড়েনি। ধনবিজ্ঞানের কথা বলবার মত মাথা, বাঙালী সমাজে সচরাচর দেখা যায় না। ধনবিজ্ঞানের জন্মভূমি—ল্যাবরেটরী বা কারখানা। ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে গণিতের নিকট সম্পর্ক আছে। বাংলা ভাষায় এই বিদ্যা চর্চ্চা করার প্রয়োজন। আর্থিক অভিজ্ঞতার মিলনকেন্দ্র থাকা দরকার—যেখানে ব্যাঙ্কার, শিল্পনায়ক, কৃষিদক্ষ, বণিক ইত্যাদি ধনস্রষ্টা থাকবেন। বিনয়কুমার এই মিলনকেন্দ্রের নাম দিয়েছেন 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ'। এখানে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সহযোগ থাকবে নিবিড়। অর্থাৎ 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ' স্থাপনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ও কারিগরি—এই দুই বিষয়ে গবেষণা চালান।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে "**যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র**" (পৃঃ ৫২) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিনয়কুমার মনে করতেন বিদেশ থেকে পুঁজি আমদানি করে দেশের বেকার সমস্যায় এবং ধনসৃষ্টিতে সাহায্য করা স্বদেশ-সেবকের অন্যতম কর্ত্তব্য। গভর্নমেন্টকে বেশী পরিমাণে ট্যাক্স দিতে উৎসাহিত করাও স্বদেশসেবকের কর্তব্য। ভারতের বাইরে, বাঙালী ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করছে। 'যুবক বাংলা' দুনিয়ার অনেক প্রকার আধুনিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীন ও সমানভাবে জীবন বিনিময় সাধন করছে। প্রাচ্য-জাপান আর পাশ্চাত্য-ইতালি কৃষিপ্রধান অবস্থায় রয়েছে। 'যুবক ভারতের' সঙ্গে ইতালি-জাপানের আধ্যাত্মিক সংযোগ অতি কাছের। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে। দুনিয়া-নিষ্ঠা, সংসার-শ্রদ্ধা আর শক্তিপূজা নগরজীবনের বিশেষত্ব। বিংশ শতাব্দীর ভারতের সভ্যতার গতি—শহর মুখো। ভারত ক্রমশঃ ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা দরকার। রেলপথ বিস্তারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুনিয়াতে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-কান্ডের ঠাঁই খুব বড়।

এছাড়া লেখক স্বদেশের আর্থিক অবস্থা কিভাবে ভাল হতে পারে, সে সম্বন্ধেও নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। যেমন—বিদেশে বাঙালী বণিক থাকার দরকার। ছোটখাটো রেলপথ, মোটরবাস, জলপথে যাতায়াতের ব্যবসা, যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি, খদ্দরে টাকা রোজগার, রকমারি ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ইত্যাদি থাকা দরকার।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "**আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র**" (পৃঃ ৩৭) গ্রন্থ। এখানে লেখকের সমাজিক বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক লঘুভাবের উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের সৃষ্টি ও পুষ্টি, সমাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি, নবীন বাংলার মেরুদন্ড-কারখানার মজুর, বর্তমান ভারতে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন লেখক এই গ্রন্থে।

ফরাসী লেখক লাফার্গ-এর একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন বিনয়কুমার। "**ধনদৌলতের রূপান্তর**" (পৃঃ ২০৭) নামে এই অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। লাফার্গ—জার্মানির কার্ল মার্কস-এর 'ক্যাপিট্যাল' এবং মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ মর্গ্যানের "এনশ্যেন্ট সোসাইটি" (প্রাচীন সাম্রাজ্য) গ্রন্থ সামনে রেখে এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন। এছাড়া এঙ্গেলসের "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" গ্রন্থের টাকাকড়ি সম্পর্কে আলোচ্য বিশ্লেষণ করেছেন বিশদভাবে। প্রাচীন সমাজে ধনসাম্য, ও যৌথ সম্পত্তি-ব্যবস্থা যে প্রচলিত ছিল তা এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। বর্তমান জগতের ধনদৌলত, চাষ আবাদের জন্মকথা ও ক্রমবিকাশ, পরিবারের ইতিহাস ও পরিবারগত ধনদৌলত, ফিউদ যুগের ধনদৌলত, বুর্জোয়া সমাজের ধনদৌলত, বর্তমান জগৎ, আর্থিক নববিধানের সূত্রপাত ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এই গ্রন্থে।

'ধনদৌলতের রূপান্তর' গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয়কুমার বলেছেন—"- - - যে সকল অসভ্য জাতি আজও জগতের পথে-বিপথে চলাফেলা করিয়া থাকে—সেই সকল নানা দেশবাসীর নানা রক্তাক্ত নরনারীর জীবন কথা এই সকল লেখার আলোচ্য। - - - এঙ্গেলস-লাফার্গের রচনায় ধনদৌলতের 'বিশ্বরূপ' বুঝিবার পক্ষে বাঙালীর সুযোগ জুটিবে।"

এই সালেই অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে "**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**" (পৃঃ ৪৩৬) প্রকাশিত হয়। চীনদেশ পরিভ্রমণকালে সেই দেশের শহর, মফঃস্বল, অফিস-কারখানা, স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার, ক্ষেত খামার ইত্যাদি জায়গা পরিদর্শন করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা বিনয় সরকার এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

তাঁর স্বদেশের প্রতি ভালবাসা বা স্বদেশ-চিন্তা সর্বদা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই নিজের দেশের প্রতি অবমাননা হলে তিনি বেদনা অনুভব করতেন। তিনি ভারতবাসীকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ করায় সচেষ্ট ছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁর সেই মনোভাব পরিস্ফুট। বাঙ্গালীরা যেমন চীনা দেখলে মুচি ও চর্মকারের জাতি বলে মনে করেন, চীনারাও ভারতবাসীকে কুলির জাতি মনে করে। তাঁর মতে "ভারতের বহু সংখ্যক শিক্ষিত "করিতকর্মা" অথবা ধনবান হিন্দু ও মুসলমান প্রবাসী হইতে আরম্ভ না করিলে ভারতমাতার কলঙ্ক ঘুচিবে না।" (পৃঃ ১৮০)

চীনের যে সকল বিষয়ের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন সেগুলি হল—

(১) দেওয়াল বহুল মহানগর, (২) চীনের প্রধানতম বৌদ্ধ জনপদ, (৩) চীনের শিকাগো—হ্যান্-কাও, নুনকর ও রাজস্ববিভাগ, (৪) ইয়াংসি বক্ষে—৪০ কোটি নরনারীর ভবিষ্যৎ বিপ্লবকেন্দ্র নানকিং (৫) এশিয়ার নিউইয়র্ক—শাংহাই—এশিয়ার খৃষ্ঠ প্রভাব, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, (৬) সুঙ যুগের রাজধানী—মধ্যযুগের চীন প্যাগোডা, (৭) চীনতত্ত্বে হাতঘড়ি— হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম, বুদ্ধ মার্কা হিন্দু সভ্যতা, চীন ও ভারতসন্তান, (৮) চীনের তৃতীয় রাষ্ট্র বিপ্লব—চীনা স্বরাজের গঙ্গাযাত্রা।

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (পৃঃ ৩৯৯) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিনয়কুমার ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের পরবর্তী যুগকেই এই বইয়ে প্রধানতঃ 'একাল' বলে ধরে নিয়েছেন। যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব এই বইয়ে আছে তার তারিখ অবশ্য প্রায় সবই ১৯২৫ সনের পরবর্তী।

তিনি অন্যান্য বিদ্যার মতন ধনবিজ্ঞান বিদ্যার 'দুই বিভাগ' স্বীকার করেছেন। এক বিভাগের নাম—'কর্মকান্ড', আর এক বিভাগের নাম—'জ্ঞানকান্ড'। 'কর্মকান্ডকে' বলেছেন 'ধনদৌলত" আর "জ্ঞানকান্ড"কে বলেছেন "অর্থশাস্ত্র"। 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটা প্রাচীন ভারতের, মার্কামারা 'ধনবিজ্ঞান' শব্দটা ভারতের নয়া গড়া। তবে শব্দের এই মারপ্যাঁচে কিছু যায় আসে না। তাঁর মতে "মূল্যতত্ত্বই ধনবিজ্ঞানের আসল 'জ্ঞানকান্ড'। - - - - যেখানে 'ভ্যালুর' আলোচনা নাই। যেখানে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ নাই। হয়ত সেখানে ধনবিজ্ঞানের কর্মকান্ড প্রচুর পরিমাণেই আছে। ধনবিজ্ঞানকে তত্ত্বভোজী বা জ্ঞানভোজী হইতে হইলে মূল্যতত্ত্বে প্রবেশ করিতেই হইবে। - - - - ভ্যালু বা মূল্য বস্তুটা মানুষের সমাজে সহজ সরল মান্ধাতার আমলেও ছিল আর একালের জটিলতাপূর্ণ ধনদৌলতের ব্যবস্থাতেও আছে। - - - - মূল্য বিজ্ঞানের অপর পিঠে দাঁড়াইতেছে দাম বিজ্ঞান ও টাকা বিজ্ঞান (বা মুদ্রাতত্ত্ব)। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থে দুনিয়ার দারিদ্র্য ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছাপ মারিয়াছে।" এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এই সকল কথা লিখেছিলেন।

বিনয়কুমার দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিষয়গুলি হল—যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্প-গবেষণা, জমিজমা ও ঘর-বাড়ীর নববিধান, ফ্রান্সে দুধের দর, একালের গৃহস্থালী ও নারী সমাজ; মজুর আইন ও মজুর আন্দোলনের ধারা, লোক চলাচল, পুঁজি চলাচল ও মাল চলাচল; ব্যাঙ্কের দৌলত, ব্যাঙ্কের ঝুঁকি ও ব্যাঙ্ক শাসন; মুদ্রা সংস্কার, সোনার টাকা আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইংরাজের নয়া শুল্ক নীতি; রকমারী সরকারী অর্থসাহায্য; বিলাতী রাজস্বের একাল সেকাল; ব্যাঙ্কযোগে যুবক বংলা সম্পদ বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল ইত্যাদি।

সুইস নরনারীর ধরন-ধারণ সম্বন্ধে বা সুইশ দেশের বিবরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ **"সুইট্‌সার্ল্যান্ড"**। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি (পৃঃ ৬৭) প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯২৪ সালের মে'র মাঝামাঝি পর্যন্ত সুইস নরনারীর সঙ্গে ঘরকন্না করেছিলেন। এই ছয়মাসের অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে।

সুইস দুধ, সুইসদের জার্ম্মানি বিদ্বেষ, ধর্মশালায় মতভেদ, সুইট্‌সার্ল্যান্ডের সংবাদপত্র, ঘড়ির ব্যবসা, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন, দারিদ্র্যের সীমানা, সুইস সমাজে বিদেশী, রাষ্ট্র শাসনে সুইস আবিষ্কার, ফ্যাক্টরী সম্পদ, সুইস আল্পসের প্রাকৃতিক গৌরব, ভাষা সমস্যা, সুইস দেশের স্বাস্থ্য-নিবাস, ভারতের স্বাস্থ্য-তীর্থ, শিল্প-সাহিত্যে ভারত প্রকৃতি বসন্তোৎসব ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্টাংসে জার্মানি নাট্যকার শিলারে'র 'হিল হেল্মটেল' নাটকের কথাবস্তু ঘিরে তিনি একটি কবিতা রচনা করেছেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সরকারের **"নয়াবাংলার গোড়াপত্তন"** গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯২৫ খৃঃ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে "নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে ছয়টি বক্তৃতা দেন। এই "আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ" শীর্ষক বক্তৃতাগুলির আলোচ্য বিষয় ছিল—ব্যাঙ্কগঠন ও দেশোন্নতি, ব্যাধি, বার্ধক্য-দৈবলীলা, জমি-জমার আইন-কানুন, মজুর দুনিয়ার নবীন স্বরাজ, ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ, আর্থিক জগতে আধুনিক নারী। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র "যৌবনের দিগ্বিজয়" নামে এক বক্তৃতা

দেন। আবার ঐ বছরই কলিকাতা হিন্দু হস্টেলের বার্ষিক মিলনোপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ দেন এবং 'বৃহত্তর ভারত পরিষৎ' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'বৃহত্তর ভারত কাহাকে বলে'' শীর্ষক বক্তৃতা দেন।

এই সব বক্তৃতাগুলি এবং বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা [যেমন হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র; নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, দুনিয়ার আবহাওয়া এই সকল গ্রন্থের ভূমিকার কিছু অংশ] এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'আমার নাম ১৯০৫ সন', 'আমার নাম যুবক এশিয়া' শীর্ষক বক্তৃতা যুক্ত করে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়।

"নয়া বাংলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ঐ সালেই।

১৯২৭ সালে বিনয়কুমার হাওড়া জেলার শিক্ষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে যে ভাষণ দেন, তার বিষয় ছিল স্কুল শিক্ষকদের পরিবারের সুখ-দুঃখ, স্কুল শিক্ষকদের বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষাক্ষেত্রে যুবক ইউরোপ, শিল্পবাণিজ্য শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা, স্কুল গন্ডীর সীমানা ইত্যাদি।

মাজুতে 'বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনে'র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দেন। এই ভাষণে বাংলার যৌবনশক্তি, যৌবনদর্শন, বল্কানচক্র ও যুবক বাঙালী, যুবক বাংলার কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সম্মেলনে 'মগজ মেরামতের হাতিয়ার' নামে একটি ভাষণ দেন। দেশচর্চ্চায় নব্যন্যায়, চাউলের জাত পরিবর্তন, ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা, যুবক ভারতে পাশ্চাত্য আধুনিকতা, সমাজ গঠনে চুক্তিযোগ ইত্যাদি এই ভাষণের আলোচ্য বিষয় ছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে 'স্বদেশ সেবার নব্যন্যায়'' শীর্ষক ভাষণে—মানুষের মুড়োর ব্যাপারী, ন্যায়শাস্ত্রের জন্ম, স্বদেশ সেবা ও স্বরাজ সাধন, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতন, অনৈক্যের রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ঢাকা জেলার যুবক সম্মেলনে—''অর্থশাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন'', কৃষ্ণনাথ কলেজে—''বাঙালী ভারত ও দুনিয়া'' শীর্ষক ভাষণ দেন।

১৯৩২ সালে, জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ্জ ওয়াশিংটন, স্বামী বিবেকানন্দ; রবীন্দ্রনাথ, জার্মান কবি গ্যেটে ইত্যাদি মনীষীদের জন্মদিন উপলক্ষে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেন। এইসকল বক্তৃতা, প্রবন্ধ কবিতা একত্র করে, নয়া বাংলার গোড়াপত্তনের দ্বিতীয় ভাগ তৈরী হয়।

এই গ্রন্থে ভাবপ্রবণতার গন্ধ নেই, নৈরাশ্যের কথা নেই—আছে আশা উদ্দীপনার বাণী। মানুষের জীবনধারণের যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, সেগুলি সংগ্রহ ও বন্টনের উদ্দেশ্যে তিনি গাইডের মত পথ দেখিয়েছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৯২৫-৩০ খৃঃ মধ্যে বাঙালী কৃষিশিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে উন্নতি করেছিল, তাকে বিনয়কুমার ভাবী কালের উন্নতির গোড়াপত্তন বলে মনে করতেন।

১৯৩২ সালে তাঁর **'স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি'** (পৃঃ ২০৩) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফ্রীডরিশ লিষ্ট-প্রণীত ''ডাস নাট্‌সিওনালে সিস্টেম ড্যর পোলিটেশেন-য়্যেকনোমী'' অর্থাৎ ''স্বদেশী ধনিবজ্ঞান'' জগৎ প্রসিদ্ধ। ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আসরে, দুনিয়ায় যে কয়জন জগদগুরু জন্মেছেন—জার্মানি সন্তান লিষ্ট্ তাঁদের অন্যতম।

লিষ্টের এই গ্রন্থ চারভাগে বিভক্ত। ইতিহাস, তত্ত্ব, চিন্তাপদ্ধতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম ভাগ ঠাঁই পেয়েছে। এই তর্জ্জমা কার্য্যে মূলের রচনারীতি বজায় রাখেননি। লিষ্টের পরিভাষিক শব্দগুলি রেখে, বাক্যগুলোকে ছোট করে বিনয়কুমার নিজের মনের মত সাজিয়েছেন। তবে প্যারাগ্রাফগুলি যথাস্থানেই রেখেছেন।

তিনি লিষ্টের কর্ম্মক্ষেত্র, একাল-সেকাল তলিয়ে দেখার অনেক সুযোগ পেয়েছেন। শক্তিকেন্দ্রের দর্শন দুনিয়ার নানা বাণিজ্যনীতি খাটালে, সংসারে আর্থিক ধারা কেমন হয়—তাই রয়েছে এই বর্ত্তমান তর্জ্জমায়। ইতালি, হান্সা নগরাবলী, ওলন্দাজ, বিলাত, স্পেনিশ ও পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মানী, রাশিয়া, ইয়াঙ্কিস্থান—ইত্যাদি দেশের শিল্প-বাণিজ্যে স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি এবং কোন অবাধ বাণিজ্যনীতি অবলম্বনের ফলে কখন-কোথায়-কিভাবে উন্নতি বা অবনতি হয়েছিল—তাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

লিষ্ট—নানা যুগের নানা জাতির আর্থিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু তিনি অতীতমুখো প্রত্নতাত্ত্বিক নন। তিনি আগাগোড়া স্বদেশযোগী ও বর্ত্তমাননিষ্ঠ। জার্মান নরনারীকে তাদের কর্তব্য জানিয়েছেন।

এই গ্রন্থে বিনয় সরকার নিজস্ব মতও প্রকাশ করেছেন স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি এবং অবাধ বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে। গ্রন্থের ভূমিকায় লিষ্টের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন।

"জর্জ্জ ওয়াশিংটন, হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত" গ্রন্থের বিষয়বস্তু লেখা হয়েছিল মার্কিন মুল্লুক পর্যটনের সময়। এই লেখাগুলো 'গৃহস্থ', 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পরে এই সব 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'ইয়াঙ্কিস্থান' বইয়ে ঠাঁই পেয়েছে। ১৯২৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে 'জর্জ্জ ওয়াশিংটন তিথি' পড়ার জন্য, 'ইয়াঙ্কিস্থান' বই থেকে কিছু বিষয় নিয়ে এই বইয়ের আকার করেছেন।

এই গ্রন্থে মার্কিন সমাজের অলিগলি খুলে ধরা হয়েছে। 'ক্যাপিটল'-ভবন এবং লাইব্রেরী-ভবন উভয়ই ওয়াশিংটন ক্লাবের তাজমহল স্বরূপ। এই স্থাপত্যকর্ম্মে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াঙ্কিদের চরিত্র বুঝানো হয়েছে। ইয়াঙ্কিদের এক মহলের নাম 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভ', অপর মহলের নাম 'সেনেট'। দুই মহলের জন্য জনগণ বিভিন্ন ধরণের প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। মার্কিনাত্মার বাণীমূর্তি কবিবর হুইটম্যান। বিনয়কুমার হুইটম্যান বিষয়ক কবিতাটি বাংলায় লেখেন এই গ্রন্থে।

১৯৩২ সালে বিনয়কুমারের **"প্যারিসে দশমাস"** (পৃঃ ২৯০) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বার খন্ডে সম্পূর্ণ 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থাবলীর অন্যতম খন্ড। প্যারিসে বসবাস ঘটেছে দুবার। প্রথমবার ১৯২০-২১ সনে, দ্বিতীয়বার ১৯২৯ সনে। এই বইয়ে মাত্র প্রথমবারের অভিজ্ঞতার কিছু অংশ বিবৃত আছে।

ফরাসী ভাষা আয়ত্তে আনা ছিল তার উদ্দেশ্য। এছাড়া বাঙালীর জন্য দুনিয়া মন্থন করা আর সমাজ শাস্ত্রের মাল মশলা সংগ্রহ করাও তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। ফরাসী নরনারীকে নিজের কথা বলিয়েছেন। তাদের নিজ মতামত, তাদের নিজ দর্শন, জীবনসমালোচনা—এগুলোর সংস্পর্শে আশা ছিল তাঁর ফ্রান্স-গবেষণার কর্ম্মকৌশল। রকমারি জীবনে ভরা, বৈচিত্র্যময় ফরাসীজগতের ধর্ম, অর্থ, কর্ম্ম যাতে বাঙালী বস্তুনিষ্ঠ সমাজে কিছু কিছু পরিচিত থাকতে পারে, তার দিকে দৃষ্টি রেখে—ফ্রান্স বিষয়ক তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন। এর সঙ্গে নিজস্ব ব্যাখ্যাও যথাস্থানে প্রকাশ করেছেন। ফরাসী ভাষা, ফরাসী সাহিত্য, ফরাসী-দেশে বিদেশী, ফ্রান্সে ইহুদি বিদ্বেষ, কারখানা সম্পদ, ফরাসী সাহিত্যে ভারততত্ত্ব, সাহিত্যে-শিল্পে পল্লী ও প্রকৃতি, প্যারিসের ঐশ্বর্য্য, ভারতীয় ও ফরাসী নারী, ফরাসীদের জাতিভেদ, ফরাসী সভ্যতার বিবরণ, ভারতসন্তানের ফরাসী কর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি এবং আরও অনেক বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

ঐ সালেই অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে **"ইতালিতে বার কয়েক"** (পৃঃ ২৮৪) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমাজতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি তথ্য ছাড়াও আর অনেক তথ্য বিদেশ গবেষণায় ঠাঁই পেয়েছে। পুরানো সুপরিচিত তথ্য ও ঘটনাসমূহের বিলকুল নতুন ব্যাখ্যা এই বইয়ে অনেক পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের আগে তিনি চারবার ইতালি ভ্রমণ করেন। তিনি ইতালি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার ভ্রমণ করেন। এই পাঁচবার ভ্রমণের ভূয়োদর্শন, এই গ্রন্থে ধরে রাখা আছে। এই দেশের পথঘাট, ঘরবাড়ী, দেশবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, ইতালির অতীত ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, সঙ্গীতচর্চা, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি, নাট্যশালা ইত্যাদি তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল। দেশ ভ্রমণকালে তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার ও সজাগ এবং বর্ণনাভঙ্গী ছিল স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়কুমারের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **"বাড়তির পথে বাঙালী"** (পৃঃ ৬৩৬) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, বাঙালী ১৯০০ সনের পর থেকে অর্থসামর্থ্য, শিক্ষা, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে এগিয়েছে। তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন যে, বাঙালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় কোন বিষয়ে (যেমন সাহিত্যসৃষ্টি, শিল্পবাণিজ্য, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা, যন্ত্রনিষ্ঠা, শিল্পনিষ্ঠা, যানবাহন, আয়বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কসীমা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে) কম নয়।

জমিদারগণ যে সমাজের সকল দিকে অর্থাৎ শিক্ষা, শিল্প, ব্যাঙ্কবীমা ব্যবসা, আমদানী, রপ্তানি, স্বদেশসেবা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে—সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন, তা তিনি এই গ্রন্থে জানিয়েছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেড়েছিল, অনেক লোক টাকা জমিয়েছিল, পুঁজির পরিমাণও বেড়েছিল।

"পরাজিত জার্মানি" (পৃঃ ৮০১) গ্রন্থটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত এটি দ্বাদশ খণ্ড। অধ্যাপক সরকার দুবার জার্মানি ভ্রমণ করেন। এই দুইবারের ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে আরও কিছু রচনা যোগে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরাজিত জার্মানি বলতে ১৯১৮ খৃঃ থেকে ১৯৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত, ষোল-সতের বছরের জার্মানিকে বুঝিয়েছেন। অস্ট্রিয়াকেও তিনি জার্মানির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

প্রথম মহাসমরে পরাজিত জার্মানির যে সকল দোষত্রুটি দেখা যায়—তা সাময়িক ছিল। জার্মানির নরনারীর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন জীবনের স্রোত, যৌবনের তরঙ্গ। পরাজিত জার্মানি তার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রদর্শন করতে পেরেছিল—নতুন নতুন কর্মচেষ্টা ও কর্মকৌশল। জার্মানিকে ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙালীর কাজে লাগানোর দিকে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। তিনি জার্মানির কোথাও দুর্বলতা দেখতে পাননি। জার্মানির এই মূর্তি তাকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রত্যেকবারই জার্মানি ভ্রমণে গিয়ে সে দেশের শ্রমিক, কেরানী, কারখানার মালিক, শিল্পী, নাট্যকার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে পরিচয় করে, তাদের সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া সেই দেশে হোটেল, যাদুঘর, পাঠশালা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সব জায়গা থেকেই তিনি তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

অধ্যাপক সরকার ও অন্যান্য আরও লেখক লেখিকার ধনবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ **'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' (১ম খন্ড)** (পৃঃ ৭৫০) ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে'র গবেষকগণের পরামর্শদাতা। তিনি এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। অধ্যাপক সরকার, লেডি অবলা বসু, অধ্যাপক হীরালাল রায়, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, জগজ্জ্যোতি পাল, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ রায়, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনীয়ার বীরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস ইত্যাদি এই গ্রন্থের লেখক।

এই গ্রন্থে অধ্যাপক সরকারের আটটি রচনা আছে যেমন—(১) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, (২) সম্পদ বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল, (৩) আর্থিক উন্নতির জন্মকথা, (৪) আর্থিক উন্নতির গবেষণা প্রণালী (৫) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান ও পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত, (৬) আর্থিক উন্নতির জন্মকথা, (৭) আর্থিক উন্নতির হালখাতা, (৮) গবেষণা সহায়ক তাহেরুদ্দীন আহম্মদ।

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের প্রস্তাব ছিল যে, **'সমাজবিজ্ঞান'** নাম দিয়ে তাঁরা একখানা পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, দ্বৈমাসিক বা মাসিক) প্রকাশ করবেন। কিন্তু পরিষদের সভাপতি ও গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক হয়ে বুঝেছেন যে, বাংলাদেশে কোন একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই কারণে সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ কিছুকাল বন্ধ থাকল। তার পরিবর্ত্তে অধ্যাপক সরকার সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনাবলী গ্রন্থাকারে সম্পাদনা করার সিদ্ধান্ত করলেন। সেই অনুযায়ী অধ্যাপক সরকার নিজের সাতটি প্রবন্ধ এবং অন্যান্য গবেষক পরিচালকদের উনিশটি রচনা নিয়ে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে **সমাজবিজ্ঞান (১ম ভাগ)** (পৃঃ ৫৮৮) গ্রন্থের সম্পাদনা করেন।

তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু হল—(১) বাংলায় সমাজবিজ্ঞান—সমাজচিন্তায় বঙ্গসাহিত্য, স্বদেশীযুগের সমাজ সাহিত্য, লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগ ইত্যাদি। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের ব্যবস্থায় সমাজবিজ্ঞান বিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম বিভাগ—সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ, দ্বিতীয় বিভাগ—সমাজবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদি। এছাড়া বঙ্গসংস্কৃতির দিগ্বিজয়ও এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। (২) "দরিদ্র নারায়ণের সমাজশাস্ত্র" প্রবন্ধে শীতের সাহায্য ও আর্থিক সংগঠন, রকমারি দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ, জার্মানির শীতের দরিদ্র সেবা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। (৩) "লোকঘনত্বের সামাজিক ফলাফল" প্রবন্ধে উত্তম ও লোকঘনত্ব, অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ ও সামাজিক গতিশীলতা, বর্হিজ্জাতের সূচীসংখ্যা, লোকঘনত্ব ও আর্থিক সুযোগ, নগরীকরণ ও লোকঘনত্ব, একালের বৃহৎ পরিবার নীতি, লোকঘনত্ব ও জার্মান আয়কর ইত্যাদি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এই প্রবন্ধে অনেক বিষয় সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। (৪) "দিগ্বিজয়ের ধর্ম্ম ও সমাজ" প্রবন্ধে নবীন হিন্দু সাম্রাজ্য, দিগ্বিজয়ের ধর্ম্ম, অশেষ সংগ্রামের ধর্ম্ম, "যত মত, তত পথ", বাংলার মুসলমান, ইসলামে হিন্দুত্ব, মুসলমানদের রীতিনীতি, হিন্দুসমাজের "মুসলমান-বিধি", হিন্দুধর্ম্ম আর দেবদেবী, অপ্রিয় কথার বেপারী, বিবেকানন্দের ডাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। (৫) "উন্নতি-অবনতি ও ভাঙন-গড়নের ধরণধারণ" প্রবন্ধে অবনতির ভয়; দুঃখবাদ, সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা ও উন্নতি, বর্ণশঙ্কর ও সাংস্কৃতিক উন্নতির যোগাযোগ, ধর্ম্মবিরোধ ও শ্রেণীসমস্যা সনাতন; যন্ত্রনিষ্ঠা ও ভাঙন-গড়ন; উন্নতি-তত্ত্বে বহুত্ব-নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় তাঁর আলোচনার বস্তু হয়েছে। (৬) "অপরাধ ও শাস্তির আকার প্রকার" প্রবন্ধে অপরাধতত্ত্বের গোড়াপত্তন, অপরাধতত্ত্বে ক্লাসিক যুগ, বস্তুনিষ্ঠ অপরাধতত্ত্বের যুগ, অপরাধতত্ত্বে উদারনীতির জোয়ার, সাম্প্রতিক অপরাধতত্ত্ব ইত্যাদি তাঁর বক্তব্যবিষয়ে হয়েছে, (৭) "কথামৃতের সামাজিক কিম্মৎ" প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়েছে "বাঙালী যুগের" প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের শক্তিযোগ ইত্যাদি।

"বাংলায় ধনবিজ্ঞান" (২য় ভাগ) ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১৯৩১ খৃঃ থেকে ১৯৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে' আলোচিত রচনাবলী স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থে 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে'র মূল উদ্দেশ্য কি, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পরিষদের কাজ ধনদৌলত সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং এ সম্বন্ধে খবরের কাগজ পড়া। যেখানে যেখানে ধনোৎপাদন ঘটছে, সেইসব কর্ম্মকেন্দ্রে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত করা ইত্যাদি। বিনয় সরকারের মতে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা—বাংলা ভাষার বাহনে চালাতে হবে। বিদেশী গবেষণা পরিষদের ধরণ-ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ১৯০৫ সন থেকে বাঙালী লেখকেরা ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যা কিছু চিন্তা করেছে বা প্রকাশ করে তার একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা উচিত। আবার মাথাপিছু বাঙালীর আয়, সেই সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চালানো দরকার। লোকবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা বাঞ্ছনীয়। বিশ্লেষণাত্মক বা তত্ত্বমূলক ধনবিজ্ঞানের দিকে নজর দেওয়া দরকার। তাঁর মতে ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভের চারটি উপায়—(১) বিদেশী ভাষার আওতা থেকে ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে উদ্ধার করা, (২) দেশনিরপেক্ষ, কালনিরপেক্ষ কার্য্যকারণসমূহের গবেষণার জন্য বিদেশী টোলে-টোলে পায়চারি করা বাঞ্ছনীয়। (৩) ধনবিজ্ঞানসেবীদের সর্বদা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক ওস্তাদ মণ্ডলের আওতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে। (৪) কথায় কথায় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক মতামত, রাষ্ট্রিক স্বার্থ ইত্যাদির দোহাই না পাড়া।

সেই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। এই গ্রন্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'জাতি' বিশ্লেষণ এবং কোষ্ঠী গণনা করেছেন। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে যুক্তিযোগনীতির কথাও আলোচনা করেছেন। এই যুক্তিযোগ নীতির মধ্যে রেল ব্যবসায় যুক্তিযোগ, টাটার কারখানার যুক্তিযোগ, বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীতে যুক্তিযোগ, বিলাতী বস্ত্রশিল্পে যুক্তিযোগের অভাব, হাইড্রোইলেকট্রিক কারবারে যুক্তিযোগ, রাসায়নিক কারবারে যুক্তিযোগের অভাব, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যুক্তিযোগ, বণিক সঙ্ঘের যুক্তিযোগ ইত্যাদি ভারতে দাঁড়িয়ে আছে।

অটাওয়া সম্মেলনের শুল্ক তত্ত্বে ভারতে আমদানি ও রপ্তানি, বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। "বিশ্বসঙ্কটের অর্থশাস্ত্র" রচনায় বেকার দুনিয়া, উৎরাই-চড়াইয়ের ধারা, মজুর সঙ্ঘ ও বেকারসংখ্যা, মুদ্রার মূল্য হ্রাস, পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস, দারিদ্র্য সমস্যা, সরকারী বেকার সাহায্য, পাইকারী দরের ঘাটতি, সংরক্ষণ, শুল্ক, পুঁজি, রপ্তানির ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইটসার্ল্যাণ্ড, পর্তুগাল, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, লাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি দেশে যে সকল বিদেশী বীমা কোম্পানী আছে, তাদের ওপর সেদেশ নিজস্ব শাসন কায়েম রাখে। এছাড়া এই গ্রন্থে 'আঠার পেন্সের রূপৈয়া' সম্পর্কেও নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে **'বিনয় সরকারের বৈঠকে'** গ্রন্থের প্রথম খন্ড এবং ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে শিবচন্দ্র দত্ত, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, মন্মথনাথ সরকার প্রভৃতি কয়েকজন সুধীর সাহিত্য, দর্শন, বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্য অসংখ্য বিষয়ের কথোপকথন সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

"খ"

।। ১ ।। ধনবিজ্ঞানী বিনয় সরকার

ধনবিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় ১৯১০ সাল থেকে। ১৯১০-৪৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ধনবিজ্ঞানের ওপর মোট বই লিখেছিলেন উনিশখানা। ভারতীয় স্বার্থের খাতিরে প্রথম থেকেই বেছে নিয়েছিলেন ধনবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা। ১৯২৬ সনে 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকা ও ১৯২৮ সনে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপিত হয়। বিনয় সরকার এই পত্রিকার সম্পাদক এবং দ্বিতীয়টির গবেষণা-পরিচালকরূপে ছিলেন।

১৯৫০ সনে জার্মান শুমাখার লিখেছিলেন—**"I could not mention any one else, who had been engaged, in diverse fields of world economic problems simultaneously of Asia, America and Europe."** [১]

বিনয় সরকারের আর্থিক চিন্তায় রাজনীতির প্রভাব দেখা যায়নি। ধনবিজ্ঞানের ওপর তাঁর বাংলা বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—"পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র", 'ধনদৌলতের রূপান্তর', "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র", "নয়াবাংলার গোড়াপত্তন", "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি", "বাড়তির পথে বাঙালী", "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), "বিনয় সরকারের বৈঠকে (১ম ও ২য় খণ্ড) ইত্যাদি। এছাড়া ইংরেজী অনেক গ্রন্থ আছে, যেগুলি ধনবিজ্ঞানের ওপর লেখা।

তিনি ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক অর্থনীতির আলোচনার দিকে মূল নজর না দিয়ে, ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের দিকেই বেশী নজর দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশে ফেরার পর 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের' সভাপতি রাজা হৃষিকেশ লাহা বিনয়বাবুকে ওই বণিক সমিতির পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার দেন। ১৯২৬ সালে টাকার মূল্য হ্রাস ছিল—সারাভারতের আলোচনার বিষয়। ভারতের একদল ব্যবসায়ী টাকার মূল্য হ্রাসের পক্ষে ছিলেন, কারণ টাকার দাম কমলে তাঁরা কাঁচামাল রপ্তানি করতে পারবেন বেশী করে। ফলে বিদেশী মুদ্রা ঘরে আসবে।

কিন্তু বিনয় সরকার টাকার মূল্য হ্রাসের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে—ভারতে কাগজ, কলম, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, খাবার ইত্যাদি সবই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। টাকার দাম কমলে, বেশি দাম দিয়ে বিদেশী মুদ্রার জিনিস কিনতে হবে। ফলে জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবেন দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। সুতরাং টাকার মূল্য হ্রাস নয়। এই কথা তিনি 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের' পত্রিকায় লিখে দিলেন এবং জয় তাঁরই হয়েছিল।

তিনি বলতেন দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভব—শিল্পের প্রসার হলে। শিল্প ও কৃষিতে বিজ্ঞান প্রয়োগে দেশের উন্নতি হবে।

।। ২ ।। ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার

বিনয় সরকার এক ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে মানুষের ইতিহাস ও মানবসভ্যতার ধারা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন। ইতিহাস গবেষণার ফলাফল তাঁর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে। তবে এখানে তাঁর শুধু বাংলা গ্রন্থের সাহায্যেই এই বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে। "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা", "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ", "বিশ্বশক্তি" "বর্তমান জগৎ" (তের খণ্ড), 'হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন', 'একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র', "বাড়তির পথে বাঙালী" ইত্যাদি গ্রন্থগুলি মামুলি অর্থে ইতিহাস গ্রন্থ নয়, এতে ঐতিহাসিক তথ্য ও তথ্য বিশ্লেষণ অতি উজ্জ্বল।

সতীশচন্দ্রের 'ডন সোসাইটি' ও 'জাতীয় পরিষদের' আবহাওয়ায় বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণা শুরু হয়। এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি এই জ্ঞানচর্চায় মগ্ন ছিলেন। **"অজস্র তাঁহার অবদান, অফুরন্ত তাঁহার প্রাণশক্তির উৎস। বাঙালী সম্পূর্ণরূপে বিনয় সরকারকে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।"** [২]

তাঁর মতে ইতিহাসের আলোচনার যথার্থ বস্তু হল 'সমাজ'। তিনি রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'সমাজ'কে গ্রহণ করেছেন। মানবজীবনের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, সমাজের রূপান্তর ইত্যাদি বিশ্বশক্তির দ্বারা প্রভাবিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি **"ইতিহাস বিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসাবে দেখতেন। মানুষের ইতিহাসকে তিনি কখনো শুধু ঘটনাস্রোত বলে মনে করেননি। যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক, অনিশ্চিত, অজ্ঞাত বা অপরিচিত সুযোগ বা শক্তি বলে ধরা হয় সেগুলিও মানুষেরই সৃষ্টি।"** [৩] তাঁর "বর্তমান জগৎ"-এর মত তথ্যসমৃদ্ধ প্রাচীন-নিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা, যুগের পর যুগ ধরে দফায়-দফায় চালিয়েছেন। তাঁর গবেষণারীতির প্রধান জিনিস ছিল দুনিয়ানিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠা। জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলী কখনো 'জাতীয়তাবাদী' ইতিহাস বা 'প্রচার সাহিত্যে' পর্যবসিত হয়নি।

।। ৩।। লোকসংস্কৃতি গবেষক বিনয় সরকার

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বিনয় সরকারের দান কম নয়। মালদহ শহরে প্রতি বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয় 'গম্ভীরা' উৎসব। গম্ভীরার পূজা-পার্বণ, গানবাজনা তাঁর জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। 'বৈঠকে' বলেছেন **"গম্ভীরা অমর, গম্ভীরাই জীবনের আসল বনিয়াদ। গম্ভীরার লোকজনের জুড়িদারই পেয়েছি দুনিয়ার নানা পল্লীশহরে।"** [৪] গম্ভীরার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন গণশক্তির অভিব্যক্তি। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার প্রেরণা আসে মালদহের গম্ভীরা এবং ইউরোপের ইতিহাস থেকে। এছাড়া জার্মান চিন্তাবীর হার্ডারের চিন্তাধারা থেকেও প্রেরণা পেয়েছিলেন।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা তাঁর ইংরাজী বইয়ে ছড়ানো আছে। "আদ্যের গম্ভীরা"-বইয়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করেন—"দি ফোক্ এলিমেন্ট ইন্ হিন্দু কালচার" নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। 'আদ্যের গম্ভীরা' প্রকাশিত তথ্যের থেকেও অনেক নতুন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। "ক্রিয়েটিভ ইণ্ডিয়া", "ইনট্রোডাকশন টু হিন্দু পজিটিভিজম"; "ভিলেজেস অ্যাণ্ড টাউনস অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্নস", "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্ সিন্স 1905" ইত্যাদি গ্রন্থে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা অল্পবিস্তর করেছেন। বিনয় সরকারের বৈঠকে (১ম ও ২য় খণ্ড) গ্রন্থে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

'বৈঠকে' তিনি বলেছেন—"**অনেকবারই বলা হইয়াছে যে অনার্য, আদিম, বুনো, পারিয়া, কাক, পায়রা, পাহাড়ী ইত্যাদি নরনারীর ধর্ম বা সংস্কৃতি হইল খাঁটি স্বদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতি। এইটাই ভিত্তি বা গোড়ার কথা। তাহার পর সকল যুগেই দেশী-বিদেশীর সম্মেলনে বঙ্গধর্ম ও বঙ্গ সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ। বঙ্গসংস্কৃতি—দোঁ-আসলামির বিপুল বিশ্বকোষ।**" * তাঁর মতে বাঙালীদের আসল ধর্ম বাঙালী ধর্ম—হিন্দুধর্ম নয়। একে বঙ্গ-হিন্দুধর্মও বলা যেতে পারে। বাঙালীর দেবদেবীর পূজার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পূজার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিপ্রতিভা বাঙালী মেয়ে বা ছেলেকে দেবদেবীর আসনে বসিয়েছে। পাঁচালী, ব্রতকথা ইত্যাদি বাংলার নরনারীর জীবনকে মানুষময় করেছে। বিনয় সরকার লোকসংস্কৃতির ব্যাখ্যায় অ্যাধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে টেনে আনেননি। বাঙালীর লোকসংস্কৃতির গঠনে তিনি সংসারনিষ্ঠা বাস্তবনিষ্ঠা, মানবনিষ্ঠার প্রেরণা পেয়ে থাকেন।

।। ৪।। রাষ্ট্রবিজ্ঞান-গবেষক বিনয় সরকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে বোঝায়—সমাজজীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পর্ক। রাষ্ট্র সম্পর্কে কতগুলি দার্শনিক তত্ত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রদর্শন। বিনয় সরকার ওপেনহাইমার, পিট্রিম সোরোকিনের মত অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রদর্শনের সামাজিকতা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি রাজনীতি বলতে বুঝেছেন রাষ্ট্রদর্শনের সামাজিকতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা—এই দুটির সম্মিলিত রূপ। যুক্তি এবং আবেগকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্যসূচী বলে মনে করতেন।

রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা—তাঁর ইংরাজী, বাংলা বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থে অল্পবিস্তর ছড়ানো আছে। "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"-গ্রন্থে 'গোষ্ঠীর ভাঙনে-পররাষ্ট্রের জন্মকথা' বর্ণনা করা হয়েছে। 'দুনিয়ার আবহাওয়া" গ্রন্থে—ভারতের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক যোগাযোগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। 'হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন' গ্রন্থে—হিন্দুজাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে শুধু হিন্দুদের নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ে তাঁর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিনয় সরকারের "বর্তমান জগৎ"-এর মত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থেও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রিক অবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর আপেক্ষিক আধুনিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এশিয়ার প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন রূপ দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকটিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ইউরোপ বা আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতির সাদৃশ্য কতটা অযৌক্তিক, তা তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন।

।। ৫।। দর্শনচর্চ্চায় বিনয় সরকার

বিনয় সরকারী দর্শনের এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ হল মানবজাতির মূলগত ঐক্য—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জীবনদর্শনের সাম্য। ম্যাকস্‌মুলার থেকে রুডইয়ার্ড কিপলিং পর্যন্ত এই মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার জীবনদর্শনে ফারাক আছে। প্রথম দিকে বিনয়কুমার এই মতবাদ মানতেন। 'ডন সোসাইটি'তেও এই মতবাদ সজ্ঞানে প্রচার করা হত। প্রথমদিকে বিনয় সরকার এই মতবাদ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরে সেই পুরানো মত বর্জন করেন। তাঁর "Positive background of Hindu sociology", "Futurism of young Asia." ইত্যাদি গ্রন্থ—তার প্রমাণ।

দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বহুত্বনিষ্ঠার দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনদর্শনে ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার ঠাঁই ছিল খুব উঁচুতে। **"As a philosophy of life Sarkarism is the doctrine of the individual as the centre of the universe."** * তিনি হেগেল বা মার্কস, স্পেংলার বা সোরোকিনের মত পূর্ণতাবাদী দার্শনিক ছিলেন না। তিনি যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, ভাল-মন্দ—এই দ্বৈতবৃত্তি দিয়েই মানবজীবন গঠিত। সুতরাং মানুষের পক্ষে পূর্ণতালাভ সম্ভবপর নয়। মানুষ উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকবে, কিন্তু চরম উন্নতির স্তরে সে কোনদিনই উপনীত হবে না। তাঁর উন্নতি দর্শনে সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ বিজয় প্রতিষ্ঠা কল্পিত হয়নি।

বিনয় সরকারের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা, ইংরাজী বই ছাড়া বাংলা বইয়েও দেখা যায়। যেমন—"বিশ্বশক্তি" ও "ইতিহাস, বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধে এই দর্শনের আলোচনা দেখা যায়।

বস্তুনিষ্ঠ দুনিয়া পর্যালোচনার নিরেট বাস্তবভিত্তির ওপর 'বিনয় সরকারী দর্শন' প্রতিষ্ঠিত। এ দর্শন দেশী-বিদেশী অন্যান্য দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর চিন্তাধারাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় 'সরকারবাদ', ইংরাজীতে 'সরকারিজম'। "**বস্তুনিষ্ঠা, দুনিয়ানিষ্ঠা ও অফুরান আশাবাদ এর প্রাণ। - - - সরকারবাদের অভিব্যক্তিতে দেশী ও বিদেশী, নতুন ও পুরাতন হরেকরকম চিন্তাধারা এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু সেই মতবাদগুলিকে তিনি কোথাও বিনা প্রতিবাদে মেনে নেননি। - - - তথ্য ও যুক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক শৃঙ্খলানিষ্ঠ চিন্তার গড়ন।**" [৭] তাঁর দর্শনে রাজসিকতার প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

।। ৬।। সমাজশাস্ত্রী বিনয় সরকার

বিনয় সরকারের সমাজচিন্তা মামুলি ধরনের ছিল না। তিনি সকল প্রকার স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের যতই বিরোধ থাকুক না কেন, বাস্তবে গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ বিরাজ করে।

তিনি মনে করতেন গ্রামে কিংবা শহরে, প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্যে, অতীতে কিংবা বর্তমানে মানুষের—মনুষ্যত্ব মূলতঃ একই থাকে। মানুষের মন ভাল মন্দে মিশিয়ে গড়া। কখনো কোন বৃত্তি প্রবল হয়ে অন্য বৃত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে, কিন্তু শেষ করতে পারে না। তাই তিনি গ্রাম ও শহর বা অতীত ও বর্তমানের মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি।

তাঁর সমাজচিন্তার নিদর্শন ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে মেলে। বাংলা বইগুলি হল—"পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র", "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন", 'আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র", "ধনদৌলতের রূপান্তর", "বাড়তির পথে বাঙালী", ও "সমাজবিজ্ঞান", "নয়াবাংলার গোড়াপত্তন", "বর্তমান জগৎ" (তের খণ্ড)।

বিনয়কুমার নারীর স্বতন্ত্র সত্তার ওপর যে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁকে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিধবাদের ওপর হিন্দুসমাজে যে দুঃখজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি সমাজতাত্ত্বিক জোরালো যুক্তি রেখেছিলেন। তিনি বিবাহবিচ্ছেদকে এক "Spiritual necessity" বলে মনে করতেন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে নামে বা পুরুষদের ভূমিকায় নামে, তখন তাদের মানসিকতায় "বিপ্লব" দেখা দেয়। তাই তাঁর মতে—**"The social pattern of masculinization is intimately linked up with the sociology of divorce."** [৮]

সমাজের দুর্গত লোকেদের কথা তিনি জীবনভোর চিন্তা করেছেন। "নয়া বাংলার গোড়াপত্তন"-এ লিখেছেন—"**বাংলার নরনারী বলিলে ১৯০৫ খৃঃ যুগে আমরা যে ধরনের লোকজন বুঝিতাম, ১৯৩২ সনে একমাত্র সেই ধরনের লোকজনই বুঝি না। নতুন নতুন রঙের, নতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন নামের, নতুন নতুন ঢঙের নরনারী বাঙালী হাতের অন্তর্গত, একথা আমরা আজ বাংলা দেশের পল্লীতে-পল্লীতে, শহরে-শহরে আর কলিকাতার মতন কেন্দ্রস্থলেও অহরহ বুঝিতেছি। সোজা কথায় আমরা আমাদের চোখের সামনে বাঙালীর সামাজিক জীবনে একটা সুবিস্তৃত বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি।**" [৯] "বৈঠকে" তিনি বলেছিলেন ভবিষ্যতে অনুচ্চ শ্রেণীর নরনারী মাথা চেড়ে তুলবে এবং বঙ্গসমাজের একটা পরিবর্তন আনবে। আজ তাঁর উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত।

তাঁর সমাজদর্শনে দেখা যায় তিনি নিরক্ষরকে অশিক্ষিত মনে করতেন না। কারণ তাঁর বিবেচনায় পৃথিবীতে অশিক্ষিত লোক নেই। "**যে লোক দিনের পর দিন নিয়মিতরূপে হাল চালায়, বলদ সেবা করে, গাড়ি হাঁকায়, নৌকা বহে সে লোক হয়তো লিখিতে পড়িতে পারে না। কিন্তু তাহার মগজও আছে আর সেই মগজের ভিতর চিন্তা করিবার শক্তিও আছে।**" [১০] লিখতে পড়তে না জানলেও, তারা বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পেশা চালাতে পারে। তাই বিনয় সরকার অক্ষর জ্ঞান না থাকলে—ভোটাধিকার থাকবে না, এই ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মত সমাজসচেতন ও যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই একথা লেখা সম্ভব যে—"**হিন্দু সমাজকে মেরামত করিবে, হিন্দু সমাজকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ঢালিয়া সাজাইবে অস্পৃশ্য, পদদলিত, শিয়াল কুকুরের মতন উপেক্ষিত আর অমানুষিকভাবে অবনমিত 'ছোটলোকেরা'।**" [১১]

"বর্তমান জগৎ"-এর গ্রন্থাবলীতেও তাঁর সমাজচিন্তা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে তিনি সেই সকল দেশের সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তুলনামূলকভাবে ভারতের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তা আলোচনা করেছেন।

অপরাধতত্ত্বের কথাও আলোচিত হয়েছে তাঁর "সমাজবিজ্ঞান" গ্রন্থে।

।। ৭ ।। শিক্ষানায়ক বিনয় সরকার

বিনয় সরকারের রচনাবলী ও জীবনধারা থেকে একথা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তিনি সমগ্র জীবন ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে কাটিয়েছেন। তিনি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরও শিক্ষক ছিলেন। তিনি যে শিক্ষাব্রত অবলম্বন করেছিলেন, তা থেকে তিনি কখনও নিবৃত্ত হননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সুশিক্ষার আলোকেই ব্যক্তি বা জাতির উন্নতি সম্ভব। তিনি লোকশিক্ষার ক্ষেত্রেও জনপ্রিয় ছিলেন।

শিক্ষাপ্রচারের জন্য গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষানায়ক বলা যেতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কে ইংরাজী, বাংলা ভাষায় বারখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলা গ্রন্থগুলি হল—"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা", "শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা", "শিক্ষাসোপান", "শিক্ষা সমালোচনা", "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা", "ভাষা শিক্ষা" ইত্যাদি। তিনি শব্দের পরিবর্তে বাক্যকে ইউনিট ধরে ব্যাকরণের সাহায্য ছাড়াই ভাষাশিক্ষার অভিনব পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন। দেশবাসীর কাছে তিনি শিক্ষার যে আলোকশিখা জ্বালিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে শিক্ষানায়ক বলা যেতে পারে।

।। ৮ ।। সাহিত্যিক বিনয় সরকার

অধ্যাপক সরকারের বাংলা ভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগের জন্যই বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ধনবিজ্ঞান পরিষদে'র গবেষকরা ধনবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি নিজের মনের ভাব প্রকাশের জন্য, ইংরেজী বা বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরী করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে সারাজীবন ব্যাপৃত থাকলেও, বিশুদ্ধ সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পচর্চায় তাঁর উৎসাহ প্রচুর ছিল। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ও সমালোচনা—তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থের দুই খণ্ডে-ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়েছেন। তারাশংকর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু ইত্যাদি কবিদের **"কাব্যরীতির নয়া ঢঙ দেখে বাড়তির পথে বাঙালী দর্শনের নতুন ইঙ্গিত পেয়েছেন।"** [১২] **"সেকালের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যরীতি সম্বন্ধে বিনয়কুমারের মধ্যে যে দরদ ও সজাগতা লক্ষণীয়, সেই দরদ ও আন্তরিকতা নিয়ে তিনি রবীন্দ্র নজরুল কাব্য থেকে সাম্প্রতিককালের গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।"** [১৩] রবীন্দ্র সাহিত্য—তাঁর কাছে বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহুত্বময়, রকমারি স্বাদে ভরা লেখালেখি। কাজী নজরুলের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর "বৈঠকে" গ্রন্থে। তাঁর বিচারে, নজরুল কাব্যের প্রথম জিনিস হল 'বিপ্লব' আর দ্বিতীয় জিনিস হল 'ভালবাসা'।

তাঁর বিশ্বপর্যটনের ফল, তের খণ্ডে সমাপ্ত "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থমালা—বাংলা সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ। এই সকল গ্রন্থ মামুলি ধরনের ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থগুলি ইতালি, ফরাসী, জার্মানি, ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা তো আছেই। তিনি যখন যে দেশ ভ্রমণ করেছেন, তখন সেই দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, আর্থিক, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এই সকল বিষয়ের সঙ্গে ভারতের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তুলনামূলকভাবে বিচারও করেছিলেন। কাজেই "বর্তমান জগৎ" সম্বন্ধে গবেষণা সাহিত্য—সংসারের বিলাস-সামগ্রী মাত্র নয়। এই গ্রন্থের মূল বিষয় ছিল বর্তমান জগতের গতি ও প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা। এই গ্রন্থ রচনার পেছনে তাঁর দেশাত্মবোধের প্রেরণা সক্রিয় ছিল।

স্বজাতির কাছে মাতৃভাষায় গবেষণার ফল প্রচার করা ছিল বিনয় সরকারের এক সাধনা। তিনি বাংলায় মূল গ্রন্থ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদের দিকে সজ্ঞানে প্রচেষ্টা চালান। ১৯১১ সনে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র হাতে পাঁচ হাজার টাকা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষোপলক্ষ্যে তুলে দেন। এর শর্ত ছিল—অনুবাদ সাহিত্যের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হবে।

অধ্যাপক সরকার ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষা থেকে কতগুলি মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় ভাবানুবাদ করেন, যেমন—'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' (বুকার টি ওয়াশিংটনের 'আপ ফ্রম শ্লেভারী'), "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি' (জার্মান অর্থশাস্ত্রী ফ্রেডারিক লিস্টের জার্মান গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশের বঙ্গানুবাদ), "নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত' (ট্রটস্কির জার্মান

গ্রন্থের তথ্য), 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' (এঙ্গেলস-এর জার্মান গ্রন্থের তথ্য) ও 'ধনদৌলতের রূপান্তর' (লাফার্গের ফরাসী গ্রন্থের তথ্য)। এই গ্রন্থগুলি—বিশ্বের নানা তথ্য বাঙালীর কাছে পরিবেশন করেছে। **"আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে—সাম্প্রতিককালের যে সব চিন্তা লইয়া, মতবাদ লইয়া দেশে আজ এত মাতামাতি চলিতেছে, তাহার অনেকটুকুই আমাদের ভাষায় প্রথম আমদানী করেন বিনয় সরকার। অন্য বহু বিষয়ের মত এবিষয়েও তিনি দেশের অগ্রগামী ভাবুক ও নায়ক স্বরূপ।"** [১৪] এই অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে তাঁর স্বদেশচেতনা কাজ করেছে। তিনি মনে করতেন বিদেশী ভাষা দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কারণ বর্তমান পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষার ওপর অধিকার থাকা দরকার।

।। ৯ ।। ধর্মচর্চ্চায় বিনয় সরকার

"Of all the instruments created by man in order to minister to the needs of individual and group life neither the most nor the least effective is the instrument conventionally known as religion. It is the creations by man that count and religion is but one of the thousand and one expressions of his creative power." [১৫]

বিনয় সরকার ধর্ম সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে বাংলা ভাষায় লিখিত 'সাধনা' গ্রন্থে—'ধর্মের প্রকৃতি অসীমের উপলব্ধি' প্রবন্ধ, সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থে—'দিগবিজয়ের ধর্ম ও সমাজ' প্রবন্ধ এবং 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে—'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের ধর্ম' সম্পর্কে যে তথ্য বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন, তা অতি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। এছাড়া বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে তিনি সেই দেশের ধর্ম সম্পর্কে যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেগুলি তিনি "বর্ত্তমান জগৎ" নামক গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

'ধর্ম' কোন প্রকৃতি, এলাকা বা ভৌগোলিক অবস্থান নয় বা মানুষের চরম লক্ষ্যের কোন গন্তব্যস্থল নয়, এটা হচ্ছে মানুষের শক্তি—যা মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে এবং পৃথিবীকে আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। "সাধনা" গ্রন্থে—'ধর্মের প্রকৃতি অসীমের উপলব্ধি' প্রবন্ধে বলেছেন যে—"ধর্মের প্রকৃতি নিরূপণে দুরূহতা আছে। কারণ ধর্ম বললে যে ভাবের উপলব্ধি হওয়া উচিত, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।" (পৃঃ ১০২) "ধর্মজীবন, ধর্মশিক্ষা, ধার্মিকের লক্ষণ প্রভৃতি ধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানবের ধারণার বৈচিত্র্য জন্মিয়াছে।" (পৃঃ ১০৪) অর্থাৎ ধর্মের অসংখ্য অভিব্যক্তি থাকার জন্য ধর্ম সম্বন্ধে একমত উপনীত হওয়া উচিত।

তাঁর মতে অতীতে দেবদেবী, পূজা-উপাসনা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যেও করা হত। আধুনিককালে সেই একই ভাবে দেবদেবী, পূজা-উপাসনা করা হলেও, দুই কালের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সে কালের ধর্মের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগ কম ছিল, আর আজকের ধর্ম অনেক বেশী মানুষময়।

এই গ্রন্থে আরও বলেছেন যে, নানা জাতির মধ্যে ধর্ম্মের নানা অভিব্যক্তির দ্বারা যে বিরোধ সৃষ্ট হয়েছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের নানা মতবাদের দ্বারা সেই বিরোধ আরও জটিল হয়ে পড়েছে। ধর্মের বিশিষ্টতা হচ্ছে 'অসীম'। 'অসীম' বলতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও যুক্তিজ্ঞানশক্তির অতীত বিষয়ই বুঝতে হবে।

তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মপ্রভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। "সমাজবিজ্ঞান" গ্রন্থে বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মের দিগবিজয়ের কথা বলেছেন। হিন্দুধর্ম তাঁর কাছে শক্তিযোগের, আশার, দিগবিজয়ের ধর্ম। হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন অনৈক্য আছে। কিন্তু এই দুই জাতির মধ্যে একটি স্বাভাবিক ঐক্যও আছে। খৃষ্টিয়ানি বিদ্বেষে এই দুই জাতিই এক।

তাঁর মতে উপনিষদ, বেদান্ত, গীতার ভেতর আছে ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠ করার মন্ত্র।

"অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো র্মা অমৃতম্‌গময়...."

অধ্যাপক সরকার উপনিষদের এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মন্ত্র সর্বকালে সর্বজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটাই একমাত্র প্রকৃত মন্ত্র, যা সংগ্রামী মানুষকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরাজিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বিজয়লাভের আশায়।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। সেই উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে 'আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভা' অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেই অনুষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হন। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা ধর্মমহাসভার সবরকম কাজে থাকতেন। **প্রমথনাথ পাল** এই প্রসঙ্গে বলেছেন—**"নীরব কর্মযোগী, জ্ঞানতপস্বী, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক সন্তান বিনয়কুমার গেরুয়াবসন পরিহিত না হইলেও, মঠের সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে তাঁহাদেরই একজন সমধর্মী- সহকর্মী বিবেচনা করিতেন আর তাঁহার নির্দেশ ও পরামর্শ একান্ত মূল্যবান জ্ঞান করিতেন এবং মানিয়াও চলিতেন।"** [১৬]

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অর্থশাস্ত্র পত্রিকা, ১৯৮০, পৃঃ ৬১।

২. 'দেশ'পত্রিকার মন্তব্য, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৩।

৩. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 'ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার', ১৯৫৮, পৃঃ ১১।

৪. 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম ভাগ), ১৯৪৪, পৃঃ ৩৭৩।

৫. 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম ভাগ), ১৯৪৪, পৃঃ ৫৮০-৫৮১।

৬. বাণেশ্বর দাস, "The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar", 1940, Page. 260.

৭. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 'অ্যাকাডেমি পত্রিকা', ১৯৮৮, পৃঃ ৯৯।

৮. বেলা দত্তগুপ্ত, 'বিনয়কুমার সরকারের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনায় নারী' (প্রবন্ধ)/আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৬।

৯. বিনয় সরকার, 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন', ১৯৩২, পৃঃ ৩৭২।

১০. তদেব, পৃঃ ৩৯০।

১১. বিনয় কুমার সরকার, 'সমাজবিজ্ঞান', ১৯৮৮, পৃঃ ১৩১-১৩২।

১২. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, "অ্যাকাডেমি পত্রিকা", ১৯৮৮, পৃঃ ১০৭।

১৩. তদেব, পৃঃ ১০৬-১০৭।

১৪. "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনা, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৯৫।

১৫. Tryon Edwards, The New Dictionary of Thoughts, 1965, P. 340.

১৬. প্রমথনাথ পাল, মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১২০।

—ঃ—

—ঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ—

সাধু গদ্যের রূপ



ক) শব্দ নির্বাচন ও ইডিয়ম ব্যবহার
খ) অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, অনুচ্ছেদ, প্রত্যয় ইত্যাদির বিশ্লেষণ
গ) প্রসঙ্গানুযায়ী শব্দ ব্যবহার

।। ক।। শব্দ নির্বাচন ও ইডিয়ম ব্যবহার

মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। মুখের কথায় যেমন মানুষ চেনা যায়, তেমনি লিখিত শব্দের মাধ্যমে লেখককে চেনা যায়। শব্দ ভাষার হৃদয়ভাবকে প্রাণময় করে, রসসঞ্চালনের মত ভাষাঙ্গে ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ভাষার শক্তিশালী উপাদান রূপে শব্দের কথা বলেছেন—"কোঠাবাড়ীর প্রধান মসলা ইঁট, তারপরে চুনসুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।"[১]

"ভাষাই মানুষের Communication-এর প্রধান অস্ত্র। শব্দের প্রয়োগে সেই Communication সৃষ্টি করা দরকার। Non-communicable words'-এর ব্যবহারে ভাষার স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়। এইজন্য Halliday প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাকে 'social semiotic'-রূপে নতুন করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন।"[২]

কোন রচনার শব্দাবলী নির্ভর করে লেখকের নিজস্ব শিল্পরুচি বা ইচ্ছার ওপর। আবার বিষয়বস্তুর ওপরও শব্দ-নির্বাচন নির্ভর করে। অর্থাৎ **"বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের ভাষারীতি নিয়ন্ত্রণ করে—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ভাষা সেজন্যে আলাদা হয়।"**[৩] বিষয়ানুবোধে ভাষার এই পার্থক্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছেন **বঙ্কিমচন্দ্র** :— **"অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয়ানুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। —আমরা দেখিয়াছি যে সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে।"**[৪]

বিনয় সরকারের রচনায় ভাষার চাল কেমন করে বিষয়ের প্রয়োজনে পৃথক হয়েছে তা এই অধ্যায়ের 'গ' অংশে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায়, লঘু বিষয়কে হাস্যরস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, শিক্ষামূলক বিষয়ে তৎসম শব্দ প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু তাঁর ভাষাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লৌকিক শব্দে কার্যোদ্ধার হলে তিনি তৎসম শব্দের ওপর বেশী নির্ভর করতেন না।

বাংলাতে গদ্যের দুটি চাল আছে। যথা—'সাধু ভাষারীতি' ও 'চলিত ভাষারীতি'। সাধু ও চলিতের পার্থক্য স্থূলের যে মুখ্য সূত্র আছে তা সর্বনাম ও সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তৎসম শব্দগুলি সাধুরীতির মধ্যে বেশী ব্যবহৃত হয়। বিনয় সরকার লেখগদ্যের এই কেতাবি দুরূহতাকে পছন্দ করেন নি। তিনি সাধুরীতিকে অক্ষুন্ন রেখেই শব্দনির্বাচনের মাধ্যমে গদ্যরীতিকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) লিখেছিলেন—**"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফারসী, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"**[৫] বঙ্কিমের এই ভাষানীতি—গদ্যরীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। পূর্বযুগের সাধুভাষা ছিল সংস্কৃতানুসারী অর্থাৎ জীবনের চেয়ে ব্যকরণের প্রতি পক্ষপাত। কিন্তু বঙ্কিম যে ভাষারীতির অনুমোদন করলেন সেই ভাষায় সংস্কৃতের সঙ্গে যে কোন শ্রেণীর অবাধ মিশ্রণের অধিকার পেল। অর্থাৎ কেতাবি আদলের চেয়ে বাস্তব প্রয়োজনের দিকে বেশী জোর দেওয়া হল। বিনয় সরকার এই জীবনমুখী গদ্যের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সরকারী গদ্যের ভাষার ব্যবহার নীতি সম্পর্কে এই প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১. "লোক ও জায়গার নাম ছাড়া এই সকল কিচ্ছার ভিতর আছে বিলকুল হিন্দুত্ব। বুঝিতে হইবে যে, খাঁটি ইসলাম সাহিত্যের প্রাণের কথাগুলো হিন্দুয়ানিতে ভরপুর। কাজেই মুসলমানদের ধর্ম্মে আর হিন্দুধর্ম্মে আসমান-পাতাল ফারাক মালুম হয় না।" **(সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১১৬)**

২. "সত্য জিনিষটা সনাতনও নয়, সার্বজনিকও নয়। আমি সত্যকে ব্যক্তিগত পেটেন্ট সমঝিতে অভ্যস্ত। এ চিজ্ হইতেছে যার-যার নিজ রক্তমাংসের অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি।" **[নয়া বাংলার গোড়াপত্তন (১ম ভাগ), পৃঃ ৮৮]**

৩. "অধিকন্তু টাকা-পয়সার জোরে সমাজে যে শ্রেণীর সরকারী বেসরকারী মানসম্ভ্রম, ইজ্জৎ, খ্যাতি ইত্যাদি পায়দা হয় তাহার লোভ দেখানোও পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ফুসলাইয়া লোক জড় করা বা ভিড় জুটানো এই পরিষদের মুরোদে কুলাইবে না।" **[বাংলায় ধনবিজ্ঞান (২য় ভাগ), পৃঃ ২৩]**

৪. "—মৌর্য্যরা মেইনের "প্রাচীন" আদমি নয়, চোলেরা ও মেইনের প্রাচীন দুনিয়া হইতে বহু দুরে সরিয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই মৌর্য্য-চোল ভারতের হিন্দু নরনারী কট্টর "আধুনিক।" (**হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন**, পৃঃ ২৮২)

৫. "—যুবক ভারত দুনিয়াখানাকে উত্তম-পুত্তম করিয়া ছাড়িতেছে। জগতে সর্ব্বত্র একটা বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিতেছে। একরোকা, একবগ্‌গা, একচোখো ভাবে এই বিপুল জীবন বাড়িয়া চলিতেছে।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ২৮১)

৬. "কখনও বা চাষীকে আবার কখনও বা মজুরকে তোয়াজ করা তাহাদের স্বার্থ মোতাবেক বা যুক্তি-মাফিক দাঁড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন দাগ দেওয়া বিশিষ্ট মতকে স্বদেশসেবার মত প্রচার করা গা-জুরি মাত্র।" (**যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ৪)

৭. "কোন শহরে পৌঁছিয়া এই ধরণের একটা শস্তা হোটেল ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেও গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। গরীবের জন্য ব্যবস্থা দুনিয়ায় কুত্রাপি নাই। এই জন্যই 'বোলশেহ্বিজম্' দেখা দিয়াছে।" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ৪১)

৮. "চীনাদের ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা আন্দাজ করিতে পারি। তথ্য সঙ্কলনে এবং তথ্য নির্ব্বাচনে চীনা লেখকগণ খুবই মজবুদ। অবশ্য ইহাদের রচনায় বাজে ভূষিমালও রাশি-রাশি আছে।" (**চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ**, পৃঃ ৬২)

৯. "জমির হিস্যায় প্রথম প্রথম পরিবারের কর্ত্তারাই একমাত্র অধিকারী বিবেচিত হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদেশীরা পল্লীতে বসবাস করিবার একতিয়ার পাইলে জমির হিস্যায় তাহারাও অধিকারী হইয়াছে।" (**ধনদৌলতের রূপান্তর**, পৃঃ ৬২)

১০. "বড়-বড় কারখানার মালিক চালকেরা মার্শ্যালকে 'আনাড়ি' বিবেচনা করিত। বই লেখালেখি আর বই মুখস্থ করা জিনিষটাকে 'কেজো' লোকেরা যে নেহাৎ তুচ্ছজ্ঞান করে বিলাতী ফ্যাক্টরির গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে এই তথ্য জবররূপে মালুম হইয়াছিল।" (**একালের ধনদৌলতের ও অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ১৪)

উদ্ধৃত রচনাংশগুলিতে দেখা যায় বক্তব্যকে জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আচার্য সরকার এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, যেগুলি তাঁর আগে অন্য সাহিত্যিকরা ব্যবহার করেননি। এই শব্দগুলির পরিবর্তে অলংকারমন্ডিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করলে ভাষার এই স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হত। **"Thousands words will not leave so deep an impression as one deed."**[৩] ইবসেনের এই উক্তিটি বিনয় সরকারের রচনার ক্ষেত্রে সক্রিয়।

তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ বসিয়ে এক নতুন ভাষারীতির সৃষ্টি করেছিলেন। উপরের রচনাংশগুলি তার প্রমাণ। বিশ্লেষণের সাহায্যে বিষয়টি প্রত্যক্ষতর হবে। ১ম অংশে—'কিচ্ছা' (কি.সহ্), 'আসমান' (ফারসী), 'বিলকুল' (হিন্দী), 'মালুম' (আরবী/মব্লূম); ২য় অংশে—'পেটেন্ট' (ইংরাজী), 'চিজ' (ফারসী/চীজ্), 'সমঝিতে' (দেশী); ৩য় অংশে—'ইজ্জৎ' (ফারসী/ই'জ.জ.ত্), 'পায়দা' (ফারসী/পয্দা), 'মুরোদ' (আরবী); ৪র্থ অংশে—'আদমী' (ফারসী/আদ্মী), 'দুনিয়া' (আরবী/দুন্‌য়া), 'কট্টর' (দেশী); ৫ম অংশে—'দুনিয়া' (আরবী), 'উত্তম-পুত্তম' (দেহাতী শব্দ), 'একবগ্‌গা', 'একরোকা' (দেহাতী); ৬ষ্ঠ অংশে—'মজুর' (ফারসী/মজ্দুর), 'তোয়াজ' (ফারসী/তব্রাজ.উ'),'মোতাবেক'(আরবী/মুতাবিক্), 'মাফিক' (আরবী/মব্রাফি.ক্), 'জোর-জবরদস্তি' (ফারসী/জোর + আরবী/জ.বর্‌দস্‌তী), 'গাজুরি' (লৌকিক শব্দ); ৭ম অংশে—শস্তা (হিন্দী/সস্তা), 'ঢুঁড়িয়া' (দেশী), 'দুনিয়া' (আরবী); ৮ম অংশে—'মজবুদ' (আরবী), 'ভূষিমাল' (হিন্দী/ভূসী + আরবী/মাল্); ৯ম অংশে—'হিস্যা' (আরবী), 'একতিয়ার' (ফারসী); ১০ম অংশে—'আনাড়ি' (সং জ্ঞানী > প্রাণানি > নাড়ি > আনাড়ি) শব্দ দেশীকরণের প্রবণতা, 'কেজো' (লৌকিক), 'জবর' (আরবী/জ.বর্), 'মালুম' (আরবী/মব্লুম)— ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে তৎসম, তদ্ভবের সম্পৃক্ত ব্যবহার শব্দ সম্পদের একটি বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য।

এই গুরুচন্ডালি, দো-আঁসলা শব্দকে ভাষার দিক থেকে গুণ বলে তিনি মনে করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত হল—"এই দো-আঁসলামি আমার বিবেচনায় বাংলা রচনাবলীর পক্ষে অতি স্বাভাবিক, বাঙালী লেখকদের অতি প্রিয় বস্তু। সংস্কৃত শব্দগুলাকে বাংলামির ভেতর এনে যথাসম্ভব সহজ করে তোলার দিকে প্রায় সব বাঙালীর ঝোঁক।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড)। ভাষার কেতাবি পূর্বসংস্কারের চেয়ে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ভাষাপ্রয়োগের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ব্যবহারিক ছিলেন।

আচার্য সরকারে গদ্যরীতির মধ্যে একটা নিজস্ব চিন্তাধারা কাজ করত। তিনি কি ধরণের ইডিয়ম প্রয়োগ করতেন

তার কিছু নমুনা না দিলে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। বক্তব্যকে নানা রকম ভাবসংকেতের দ্বারা উপস্থিত করার উপায় হচ্ছে ভাষার মধ্যে ইডিয়ম প্রয়োগ করা। **"বাক্যের বিশিষ্ট অর্থ যা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে ব্যঞ্জিত তথা ইঙ্গিতময় হয়ে প্রকাশিত হয়—তারই নাম ইডিয়ম।"**[৭] **" ইডিয়ম ভাষার অলংকার বিশেষ। যে ভাষায় যত বেশী ইডিয়ম সেই ভাষা তত বেশী সমৃদ্ধ।"**[৮] অর্থাৎ ইডিয়মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকিয়ে থাকে একটা অলংকারিকতা। বিনয় সরকারের ইডিয়মগুলি বাস্তবনিষ্ঠ। বক্তব্যকে সুচারুরূপে রসাল করে প্রকাশ করেছেন ইডিয়মগুলির সাহায্যে।

"যে কোন বিজ্ঞানশীল লোক আসিয়া তাহাদিগকে **পাঁচজুতা লাগাইতে** পারে।" (বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, পৃঃ ৮৫), "একবগগা, একচোখো ভাবে বিপুল জীবন বাড়িয়া চলিতেছে না" (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ২৪০), "ঠেঙ্গা খাইয়াছে" (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ৪০), "হাড়ে-হাড়ে বুঝিল" (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৯), "বাপ-কা-বেটা" (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৩২), "নাকে দড়ি দিয়া টানিতেছে" (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৪০), "দুঃখবাদের সামাজিক কিম্মৎ লাখ টাকা" (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১৪১) প্রভৃতি বাক্যাংশ বা শব্দগুলো বেশ জোরালো—বিশেষণগুলোও বেশ ঝাঁঝালো।

আবার মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে ইডিয়ম রচনার অনেক নিদর্শন সরকারী গদ্যে মেলে। যেমন—"হাতমক্স" (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ৮), "চিত্রাবলীতে হাতদিবার পূর্বে" (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ৩৭), "মাথা পরিষ্কার" (হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ৫৫), "মাথায় বসিবে" (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৮), "মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছে না" (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ১১), 'মাথা তুলিয়াছে' (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ২৩), 'মগজওয়ালা লোকেরা' (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১৩৮), "হিন্দুর মুড়োয় নতুন ঘী" (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১১৩), "চোখ টাটাইতেছে", "বুক চড়-চড় করিতেছে" (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৪২), "পর্তুগাল গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল" (স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি, পৃঃ ১০৯), প্রভৃতি ইডিয়মের সংখ্যা তার রচনায় নেহাৎ কম নয়।

পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রকে বা সামাজিক ইতিহাস কেন্দ্র করে ইডিয়ম—তাঁর রচনায় দু একটি ছাড়া দেখা যায় না। যেমন—"প্রচন্ড ভীমমূর্তি" (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ২০), 'মান্ধাতার আমলে' (হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ৭), 'ইয়াঙ্কিবাসীরা ঘরকুনো' (হিন্দুরাষ্ট্রের পড়ন, পৃঃ ১৪) প্রভৃতি।

বিনয় সরকারের বাকধারাগুলি এক চমকপ্রদ সৃষ্টি। নানারকম শব্দের মিশ্রণে অর্থাৎ দেশী, বিদেশী, তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে সেই বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে যেমন ঃ—

"**ওস্তাদিচালে**" মাঞ্চুবংশীয় সম্রাটকে সিংহাসন প্রদান করিতে উদ্যত হইতে পারেন। (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ৬৭)

"সমগ্র **দুনিয়াকে হেভন্** বলা হইয়াছে" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ৩৫)

"তড়িতের বাতিতে রাত্রি **গুলজার** হইয়া আছে" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ৩৫)

"জাহাজটা নিতান্তই **চোঁথা** ও পুরাণা" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ১)

"তুমি আমার উপর **কর্ত্তামি** করিয়াছ" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ৫)

"**দিলদরিয়া মেজাজ**" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ৪৫)

"যুবক ভারত এরোপ্লেনে চড়িয়া **জান্ দিতেছে**।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ২৪১)

"আমি **এক দামড়িও** পাই নাই।" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ২৫)

"জাহাজের সঙ্গে **টক্কর দিবার** জন্য জলের ভিতর ছুটিতেছে" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ১৪)

"সমাজশাস্ত্রীদেরও মাঝে-মাঝে **পাঁয়তারা ভাঁজিতে** হয়।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ৪২)

"দারিদ্র্য নিবারণের আরও বেশী **সেকেলে দাওয়াই** যথা বদান্যতা পরহিতৈষণা- - -।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ৬৪)

" সেইদিন **আলটপকাভাবে** - - -।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১১৪)

"ধর্মপালের নাম **হোমিওপ্যাথিক ডোজে** ছড়ানো আছে মাত্র।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ৩২)

"ভাইফোঁটা জামাইষষ্ঠী' ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মুসলমানদের **দিল্ কম নাচে না**।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১৪৮)

"**নিরেট** তথ্য- - -।" (**হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন**, পৃঃ ৯)

"**ব্যক্তিত্বজ্ঞান** ছিল **টনটনে**।" (**হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন**, পৃঃ ৪৩)

"অকৃতকার্য্যতার খবর **উড়ু-উড়ু** ভাবে একটু আধটু আসিয়াছে।" (**দুনিয়ার আবহাওয়া**, পৃঃ ১০)

"**ফ্যাল-ফ্যাল** করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।" (**নিগ্রোজাতির কর্মবীর**, পৃঃ ৯৭)

"এ কয়দিন খাটিতে হইতেছে না। **হাড় জুড়াইল**।" (**নিগ্রোজাতির কর্মবীর**, পৃঃ ১৪৭)

" শ্বেতাঙ্গদিগের '**ভালবাসার অত্যাচারে**' পড়িয়াছিলাম"। (**নিগ্রোজাতির কর্মবীর**, পৃঃ ১৮০)

" ইঁহারা কত **হাল্কা ও ফাঁপা জীবন** যাপন করেন।" (**কবরের দেশে দিন পনের**, পৃঃ ১৯)

এই সকল ইডিয়মগুলি বিনয় সরকারের ভাষার জান্। এই ইডিয়মগুলি লক্ষণার্থক মনোভাবে ভাবিত হয়ে গড়ে উঠেছে। বিনয় সরকারের বাক্‌নৈপুণ্যের প্রকাশ ভঙ্গিমা অপরূপ। তাঁর ইডিয়মগুলি একটা বিশিষ্ট রূপ ও রসের সৃষ্টি করেছে। ভাষাভঙ্গীটি কথোপকথনের বা সহজ সংলাপের। **"অতি পরিচিত গ্রাম্য, দেশী, দৈনন্দিন ভাব প্রকাশের মুখের শব্দ মুক্তাকে তিনি সাধুরীতির বিন্যাস সূত্রে মালার মত গেঁথে দিয়েছেন।"**[৯] সুতরাং বিভিন্ন জাতের শব্দের এবং ইডিয়মের ব্যবহারে বিনয় সরকারের ভাষা বাংলা গদ্যে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে সন্দেহ নেই। তাঁর দীর্ঘতর ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি দৃষ্টান্তে তাঁর গদ্য একালের বিচারে সাধুগদ্য হলেও, সেই সাধুতার আবরণ বাইরের খোলসমাত্র, ভেতরে ভেতরে তিনি কথাভাষার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' (শতবার্ষিকী সংস্করণ, খন্ড-১৪), পৃঃ ৪৪৩।

২. M. A. K. Halliday. Language as social semiotic 1978. Edward Arnold-London. Introduction. P. P. 1-5.

৩. পবিত্র সরকার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, ১৯৮৫, পৃঃ ৭৭।

৪. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ডঃ, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৭১, পৃঃ ৩৭৩।

৫. তদেব, পৃঃ ৩৭৩।

৬. Tryon Edwards. The New Dictionary of Thoughts. 1966. P. 740.

৭. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা ভাষার ভূমিকা; পরিবর্ধিত সং, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ২৪৬।

৮. তদেব, পৃঃ ২৪৬।

৯. ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, 'আচার্য বিনয় সরকারের বাংলা গদ্য শৈলী' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৭১।

।। খ ।। সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ, প্রত্যয় ইত্যাদির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

মানুষ নিজের মনোগত ভাব সমাজস্থ লোকের কাছে প্রকাশ করার জন্য কতগুলি ইঙ্গিত ব্যবহার করে। এই ইঙ্গিত সমূহের দ্বারা ভাষা গঠিত হয়। ভাষা উপায় মাত্র; লক্ষ্য ভাব ব্যক্ত করা। অর্থ আছে বলেই বাক্যের প্রয়োজন। পদবিশিষ্ট বাক্যই ভাষার মৌলিক উপাদান।

রামমোহন "বেদান্তগ্রন্থ"[১]-এর (১৮১৫ খ্রীঃ) ভূমিকায় বাংলা বাক্যগঠনবিধি সম্পর্কে তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। যেমন—(১) বাক্যের আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার, (২) বাক্যের বিভিন্ন বাক্যাংশের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আবশ্যক। (৩) বাক্যের কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার এবং বাক্যের ক্রিয়ার অবস্থিতি আবশ্যক। বাক্যের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মত— **"A complete sentence nust contain, at least, one noun & one verbal attribute expressed or understood"** বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ—**"A sentence generally commences with a noun or pronoun in the nominative case unless that noun has an adjective prefixed with & always ends with verb. The other parts of speech consisting of participles, adverbs, prepositions, conjunctions, & interjections require no particular rules for their relative position in a sentence."**[২] তবে রামমোহনের এই নিয়ম সর্বব্যাপী বলে মনে করা যায় না।

বাক্যের বিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণে **Swift** বলেছেন—**"Proper words in proper places, make the true definition of a sentence"**[৩] আবার সাধারণ লোকের মত বলা যায় বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পদে গঠিত বাক্যটি জটিল, না যৌগিক, না সরল। বলা বাহুল্য, এই দুটিই উত্তর হিসাবে সঠিক না স্টাইলিস্টিক্সের পারিপ্রেক্ষিতে। ভাষার সৌন্দর্য নির্ভর করে রীতির ওপর যদিও ভাষা ব্যাকরণ আশ্রয়ী। অর্থাৎ ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চললেই যে রচনার শ্রী জন্মায় বা ব্যাকরণ মেনে না চললেই যে রচনার 'স্টাইল' জন্মায়, এমন মনে করার কোন কারণই নেই।

নোয়ম চোমস্কির মতে— **"সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বাক্য হল, যেগুলো সহজে প্রস্তুত করা যায়, সহজে বোঝা যায় এবং সর্বোপরি স্বাভাবিক। বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার সাবলীল উচ্চারণ করার সুবিধার ওপর, সংক্ষিপ্ততার ওপর।"**[৪] এইগুলি কাগজ কলম দ্বারা বিশ্লেষণের দরকার পড়ে না। কোন বাক্য ব্যাকরণগত দিক দিয়ে ঠিক হলেও সেটি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠবে।

(১) আমি সেই ব্যক্তিটিকে ডেকেছিলাম, যিনি এই বইটি লিখেছিলেন, যাঁর কথা তুমি আমাকে বলেছিলে।

(২) এই বইটির লেখক, যাঁর কথা তুমি আমাকে বলেছিলে তাঁকে আমি ডেকেছিলাম।

বাক্যগুলি ব্যাকরণগত বৈধতার মাপকাঠিতে যথেষ্ট উচ্চমানের। কিন্তু যোগ্যতার বিচারে দ্বিতীয় বাক্যটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অগ্রহণযোগ্য বাক্যগুলি সাধারণত বাতিল করা হয়—তার জটিলতর গঠন এবং stylistic factor এর জন্য।

চোমস্কি বিশেষ জোর দিতে চেয়েছেন বক্তা-শ্রোতা সম্পর্কের ওপর এবং এই ভিত্তিতেই বাক্যগঠনের উপর তিনি আশাবাদী। প্রাঞ্জলতা ও সহজবোধগম্যতা বাক্যগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাঁর মতে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক প্রকারের বাক্যগঠন সম্ভব; সেগুলো সমস্তই একটি অর্থ বহন করে কিন্তু তাদের structural formation বা গঠনরীতি ভিন্ন প্রকারের।

যেমন ঃ (১) আমি রামকে পরীক্ষা করতে একজন চিকিৎসককে অনুরোধ করেছিলাম।

(২) আমি রামকে একজন চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হতে অনুরোধ করেছিলাম।

এখানে দুটো বাক্য একই ভাব প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'রাম' প্রত্যক্ষ কর্মকারক, যদিও প্রথম বাক্যে 'চিকিৎসক' প্রত্যক্ষ কর্মকারক। 'আমি' উভয়ক্ষেত্রেই কর্তৃকারক। একই অর্থের এই দুটি বাক্যের গঠনপ্রণালী ভিন্ন। প্রথম বাক্যটি বুঝাতে বা উচ্চারণ করতে অনেক সুবিধাজনক। সেই কারণে প্রথম বাক্যটি গ্রহণযোগ্য।

সাহিত্যের উন্নতির জন্য স্টাইলিস্‌টিক্‌-বাক্য একান্ত প্রয়োজন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাক্কালে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতবর্গের বাক্য রচনায় বিশেষ কোন স্টাইল তৈরী হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের হাতে বাংলা গদ্যে মেদ সঞ্চার হয়। বাক্যের চরিত্রের সৃষ্টিতে এঁদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিনয় সরকার পূর্বসূরীদের পথে স্বাভাবিক নামই রক্ষা করেছেন। তিনি সব সময় ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে বাক্য রচনা করেননি! বাক্যগঠনের যে গুরত্বপূর্ণ দিক 'প্রাঞ্জলতা ও সহজবোধগম্যতা'—তা তাঁর রচনায় স্পষ্ট। বাক্যরচনায় বিনয় সরকারের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর কিছু গদ্য রচনা অবলম্বনে সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে। বাক্য সংযোজক অর্থাৎ 'যত - - - তত', 'যাহা হইতে', 'তাহা হইলে', 'যেরূপ', 'সেরূপ', 'যে - - - সে' ইত্যাদি দ্বারা বাক্যগঠনের দক্ষতা—তাঁর রচনায় শৈল্পিক গুণ আনয়ন করেছে। যেমন ঃ—

(১) "যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার, ভিন্ন স্বরূপের, প্রতিকৃতি মানসনেত্রে প্রতীয়মান হয় না, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের প্রতিষ্ঠান বৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য, আদর্শবৈচিত্র্য, রাষ্ট্রবৈচিত্র্যের ও সমাজবৈচিত্র্যের উপলব্ধি হয় না, সেই জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।" (**ভাষাশিক্ষা,** পৃঃ ৪)

(২) "যদি মালের মূল্য অনুসারে শুল্ক বসাইবার রীতি থাকিত তাহা হইলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর এবং মূল্যবান বিলাস দ্রব্যের প্রভেদ লক্ষ্য করা কঠিন হইত।" (**স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি,** পৃঃ ১৫৬)

(৩) "আমাদের দেশে বর্ষাকালে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ, কখনও গুঁড়ি-গুঁড়ি কখনও মুষলধারা বৃষ্টি পড়িতেছে।" (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা,** পৃঃ ২০৫)

(৪) "তাহা হইলে, হিন্দুধর্মের দিগ্বিজয়ই সঞ্চিত হইবে আর হিন্দুসমাজেরই শক্তিবৃদ্ধির সুযোগগুলা আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে"। (**সমাজবিজ্ঞান,** পৃঃ ১১৬)

(৫) 'টাকা পয়সার মাপে পৃথিবীতে যতদিন ছোটলোক বড়লোক থাকিবে ততদিন জগতের কল্যাণ নাই,—ততদিন মানবসমাজে শান্তি স্থাপিত হইবে না;—এই মত অনুসারে রুশিয়ার জননায়কেরা কাজ চালাইতেছেন।" (**দুনিয়ার আবহাওয়া,** পৃঃ ৭)

(৬) "এইরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই ইয়োরোপে রাজতন্ত্র শাসন বা মনার্কি রক্ষা পাইবে;—প্রজাবৃন্দকে দাবিয়া রাখা যাইবে, বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে তাহা নষ্ট করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে।" (**জর্জ ওয়াশিংটন, হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত,** পৃঃ ১৫)

(৭) "আর আমরা যদি গায়ে পড়িয়া জাপানীদের সঙ্গে দুসমনি চাগাইয়া তুলি তাহা হইলে আমরা নিজ বাজারটা নিজেই খোয়াইয়া বসিব।" (**যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র,** পৃঃ ১৯)

(৮) "কুতুবমিনারের শিরোদেশ হইতে ৪০/৫০ মাইল বিস্তৃত ভূমি যেরূপ প্রাচীন ও আধুনিক দিল্লী নগরের যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস-কথা বুঝাইয়া দেয়, গাড়ীতে বসিয়াও সেইরূপ মেম্ফিস-কাইরো-হেলিয়োপোলিসনগরের যুগান্তরব্যাপী ঐতিহাসিক পরিবর্তন সমূহ কল্পনা করিয়া লইলাম।" (**কবরের দেশ দিন পনের,** পৃঃ ৯৯)

বিনয় সরকার গদ্যে সিদ্ধান্তসূচক শব্দ যেমন—'কেননা', 'সুতরাং', 'কাজেই', 'অতএব' ইত্যাদি শব্দগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই শব্দযোগে জোরালো ও সিদ্ধান্তসূচক বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে। উদাহরণ সহযোগে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠবে।

(১) "সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়ে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ-বিশেষ সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা উচিত।" (**ভাষাশিক্ষা,** পৃঃ ২)

(২) "কেননা ক্রিসম ঋষির তেলধূপ - - - বে-ইজ্জত করা যে সে কথা নয়।" (**ধনদৌলতের রূপান্তর,** পৃঃ ১০৭)

(৩) "কেননা সরকারী তাঁবে শিল্প কারখানা চালাইয়া লাভবান্ হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী।" (**একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ২৩০)

(৪) "কাজেই ইতালি আর হাঙ্গারি স্বাভাবসিদ্ধ মিত্র"। (**দুনিয়ার আবহাওয়া**, পৃঃ ৪)

(৫) "কাজেই মফঃস্বলের ফরাসী নরনারীকে একদম স্পর্শ করা হয় নাই বলিতে হইবে।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ২৭৫)

(৬) "কাজেই সমাজে অনৈক্য দেখা দিতে বেশীদিন লাগে নাই"। (**ধনদৌলতের রূপান্তর**, পৃঃ ১১০)

(৭) "সুতরাং বিশেষ কোন সূচীসংখ্যার বলে কোনো জনপদের সমৃদ্ধি; মানবমঙ্গল বিষয়ক কার্য্যকলাপ বা ভদ্র জীবনযাত্রা ইত্যাদী সম্বন্ধে মত প্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ৯৭)

(৮) "সুতরাং ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারের জন্য বসিয়া না থকিলেও 'ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার' হওয়া যায়"। (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ১৯৮)

(৯) "সুতরাং পৃথিবীর আধ্যাত্মিক আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক এবং স্বাধীন শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনের আকার ধারণ করেছে।" (**ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**, পৃঃ ১৩০)

(১০) "সুতরাং ছাত্রীরা লেখাপড়া শিখিয়া নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে না"। (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ১৩১)

(১১) "কাজেই বড়-বড় প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ টাকার দিকে লোভ রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।" (**ধনদৌলতের রূপান্তর**, পৃঃ ২৯)

(১২) "অতএব ইংরেজরাই আধুনিকেরও আধুনিক,—পাশ্চাত্যেরও পাশ্চাত্য"। (**জর্জ ওয়াশিংটন, হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত**, পৃঃ ১৯)

(১৩) "কাজেই বিশ্ববাণিজ্যের জটিলতা যার পর নাই বাড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।" (**যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ২৫)

(১৪) "কাজেই রাষ্ট্রটা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী আর্থিক শ্রেণীর কর্ম্মকেন্দ্র।" (**পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র**, পৃঃ ২৯৩)

বাক্যরচনা-শ্রী সৃষ্টিতে অব্যয় পদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। দুটি পদ যুক্ত হয় অব্যয় পদের দ্বারা, আবার দুটি independent utterance-এর যোগসূত্রও এই অব্যয়পদ। বাক্য সংযোজক অব্যয় 'and', 'but' দিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ্য-বিশেষণের বাক্য-বিন্যাস করা হয়। দীর্ঘ বাক্য–বিন্যাসে এই অব্যয় পদের গুরুত্ব কম নয়। বিনয় সরকার বাক্য-বিন্যাসের এই নিয়ম সব ক্ষেত্রেই মেনে চলেছেন। তবে সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শুরু করা তাঁর রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ—

(১) "আর তুরস্ক ও মিশরের ত কথাই নাই।" (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ২৪)

(২) "এবং এই পরিবর্তশীলতার জন্য ইতিহাসের ও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না।" (**ভাষাশিক্ষা**, পৃঃ ৩)

(৩) "বরং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চতর সোপানে উঠিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে"। (**স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি**, পৃঃ ৯৪)

(৪) "কিন্তু বাতাসের গতি আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছি।" (**স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি**, পৃঃ ১৬)

(৫) "কিন্তু এখন সকলের রাজনৈতিক শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে।" (**প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা**, পৃঃ ১২০)

(৬) "কিন্তু এ ধারণা অনেকটা কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত খেয়ালমাত্র"। (**বাংলায় ধনবিজ্ঞান, ২য় খন্ড**, পৃঃ ১২৪)

(৭) "বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভিনব জাতীয়তার গৌরবের সামগ্রী, আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি, সমস্তই আমরা ইউরোপরে সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিযাছি।" (**ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**, পৃঃ ১২২)

(৮) "অথবা বর্তমান জগতে কোন প্রকার অত্যাচার, দুর্নীতি, পরনিপীড়ন, গোলাম নির্য্যাতন বা দরিদ্র্য নিপীড়ন, চলিতেছেই না এইরূপ বুঝিবার এবং বুঝাইবার লোকও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।" (**পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র**, পৃঃ ৩০৩)

(৯) "অথবা বহুকাল, শাগরেতি করিবার পর কোন-কোন লোক গিল্ডের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিত।" (**ধনদৌলতের রূপান্তর**, পৃঃ ১৬৯)

(১০)"আর বাতাইয়ের মতন শিল্পীও জগতের নাট্যসংসারে অনেক জন্মে নাই।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ২৩৫)

(১১) "অথবা গুমোট, মেঘ আর ঝড়-বৃষ্টি।" (**ইতালিতে বারকয়েক**, পৃঃ ১৬৯)

রচনার স্টাইল এই সকল শব্দের উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি বাক্য বয়নে সার্থক যতিস্থাপনও—রচনাশ্রী সৃষ্টির সহায়ক। যতির গতিতেই ভাষার দৃপ্ত গতি দেখা দেয়। পরিমিত যতিস্থাপনে বিনয় সরকারী গদ্যে ধ্বনি প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বাক্যরচনায় কমা, '—' , সেমিকোলন, ইত্যাদি যতিচিহ্নের স্বাভাবিক ব্যবহার লক্ষিত হয়। যতি চিহ্নের যথার্থ প্রয়োগে তাঁর ভাষার ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য অতি যতি ব্যবহারও তাঁর রচনায় দেখা গেছে। বাক্যের দীর্ঘত্ব বিধানের অসংখ্য উপায়ের মধ্যে একটি উপায় হচ্ছে যতিচিহ্নের প্রয়োগ। দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাপারটি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন :—

"কাজেই ভারতীয় কোম্পানীকে খানিকটা নাচ, খানিকটা বাজনা, খানিকটা গান, খানিকটা ক্রীড়াকৌতুক, ব্যায়াম, খানিকটা ছবি, খানকটা রসিকতা, খানিকটা ভেন্ট্রিলোকিজম ইত্যাদি মিলাইয়া প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিতে হইবে।" (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ২২)

"ক্রমশঃ বিজ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ক্রমশই লোক পরোপকার, স্বার্থত্যাগ এবং ভগবদ ভক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমশই বাহ্য ও মনোজগতের নিয়মগুলি মানুষ করতলগত করিতেছে এবং মানুষের কাজ চিন্তার মধ্যে জাতীয়তা, প্রজাতন্ত্র শাসন, সামাজিক জীবনে শ্রমজীবীদের উচ্চতর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভাবে বিচিত্ররূপে উন্নতির পন্থা পরিষ্কার হইতেছে।" (**ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**, পৃঃ ১০)

"পরিচিত পদার্থসমূহের দ্বারা চিত্তের উপর যে যে কার্য্য হইয়াছে, এবং তাহার ফলে পৃথিবীর স্বরূপ সম্বন্ধে, পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই চিন্তাকার্য্যসমূহ ও জ্ঞানের সহিত তুলনা সাধন করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া এবং তাহাদের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া, অপরিচিত নূতন পদার্থের জ্ঞান জন্মে; এই নূতন পদার্থের দ্বারা চিত্তের উপর যে কার্য্য হয় তাহার প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়, এবং নূতন লক্ষণ ও গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (**ভাষাশিক্ষা**, পৃঃ ৫২)

"তাহার পর বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন অভ্যাস ও ভাবগতিকসমূহ পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে; প্রকৃতি ও জড়জগতের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাব-ভাব, কার্য্যপ্রণালী ও প্রকাশের লক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যাইবে; এবং প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া তাহার ভিতরকার কথাগুলি, অন্তর্নিহিত সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে।"(**শিক্ষা সমালোচনা**, পৃঃ ৪১)

প্রথম বাক্যটিতে—৭টি কমা, দ্বিতীয় বাক্যটিতে—৬টি কমা, তৃতীয় বাক্যটিতে—৬টি কমা ও একটি সেমিকোলন, চতুর্থ বাক্যটিতে—৩টি কমা এবং দুটি সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে। এই অতি যতিব্যবহারে ভাষার ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়েছে। তবে এই অতি যতি ব্যবহার বিনয় সরকারের সব রচনায় প্রকট নয়। ইতিহাস সম্পর্কিত এবং শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধে এই জাতীয় যতি ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়।

আবার একাধিক independent utterance যতিচিহ্নের দ্বারাও গ্রথিত হয়েছে। ফলে মাঝে মাঝে বৃহৎ বাক্যও সৃষ্টি হয়েছে। এরকম দৃষ্টান্ত বিনয় সরকারের রচনায় অমিল নয়। যেমন—

(১) "অসংখ্য অনার্য আর্যে পরিণত হইয়াছে, অসংখ্য অহিন্দুকে হিন্দু করা হইয়াছে; অসংখ্য অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের ইজ্জৎ দেওয়া হইয়াছে।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১০৯)

(২) "জুয়াড়িরা কখনও টাকা জমাইতে জানে না—তাহারা রোজ আনে রোজ খায়—সর্ব্বদা বিলাসে ও অতিব্যয়ে ডুবিয়া থাকে।" (**স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি**, পৃঃ ১০৪)

(৩) "প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে বহু পদার্থের পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়, বহু বস্তু গণনা করিতে হয়, বহু জিনিষ ওজন করিতে হয়।" (**ভাষাশিক্ষা**, পৃঃ ৩৪)

(৪) "তাহারা ধেনু চরাইতেছে না, চরাইতেছে ছাগলের পাল।" (**সুইটসার্ল্যান্ড**, পৃঃ ৪৬)

(৫) "তাও বংশের একুশ জন সম্রাট হন—তাঁহাদের অধিকাংশই দুর্বল ও নগণ্য ছিলেন।" (**চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ**, পৃঃ ৩৩)

(৬) "এরূপ উদ্ভিদ ত ভারত মহাসাগরে দুই চারিটা দেখিয়াছি—কিন্তু লোহিত সাগরে দেখিতে পাইতেছি না।" (**কবরের দেশে দিন পনের**, পৃঃ ৩১)

(৭) "তাঁহারা বিবেচনা করিলেন—এই খাল কাটা সম্ভবপর হইবে না— কারণ লোহিত সাগরের তলদেশ ভূমধ্যসাগর অপেক্ষা উচ্চতর—ব্যবধান প্রায় ৩৬ ফিট্।" (**কবরের দেশ দিন পনের**, পৃঃ ৬০)

(৮) "কয়েক বৎসর হইল জার্মানি প্রবাসী চীনাছাত্রেরা প্রথম উদ্যম করে; পরে জাপান প্রবাসী ছাত্রেরাও এদিকে নজর দেয়; কিন্তু অর্থাভাবে তাহাদের কার্য্য সফল হয় নাই।" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ১৩৫)

(৯) "এজন্যই ইতিহাসের উপদেশে আমাদের মনে উৎসুক্য জন্মাইতে পারে না, ভূগোল অতি শুষ্ক নীরস বলিয়া মনে হয়, সংস্কৃত শিক্ষার দরকার নাই অনেক ছাত্রেরই এরূপ ধারণা হইয়াছে।" (**শিক্ষা সমালোচনা**, পৃঃ ৭)

(১০) "বর্ষাকালে নদীর জলবৃদ্ধি একেবারেই ক্রমাগত হইতে থাকে না, কিছুদিন বৃদ্ধির পর হঠাৎ হয়ত দুই চার দিন কিছু হ্রাসই হয়, কিন্তু তারপর আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে।" (**ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**, পৃঃ ১৩)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে—প্রথম, তৃতীয়, নবম, দশম বাক্যগুলি দুটি কমা ও পূর্ণচ্ছেদে সম্পন্ন এবং বাক্যগুলি বস্তুতঃ তিনটি স্বাধীন বাক্যের সমাহার। দুটি '—' চিহ্ন ও একটি পূর্ণচ্ছেদে সমাপ্ত দ্বিতীয় বাক্যটি—তিনটি স্বাধীন বাক্যের সংযোজন। পঞ্চম, ষষ্ঠ বাক্যগুলি একটি '—' চিহ্ন এবং একটি পূর্ণচ্ছেদে সম্পূর্ণ। বাক্যগুলিতে দুটি স্বাধীন বাক্য বর্তমান। অষ্টম বাক্যটি দুটি সেমিকোলন এবং একটি পূর্ণচ্ছেদে সমাপ্ত। তিনটি স্বাধীন বাক্য গ্রথিত করেই এক বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভাষাশিল্পীরা বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সুনির্দিষ্ট স্থানের বিপর্যয় ঘটিয়ে বা অন্তিমে, মধ্যে বা আদিতে স্থাপন করে, কোথাওবা ক্রিয়াপদটি সম্পূর্ণভাবে লোপ করে দিয়ে বা তার হ্রস্বরূপ ব্যবহার করে বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছেন। এই কলানৈপুণ্যের প্রতিফলন বিনয় সরকারের রচনায় পাওয়া যায়।

রামমোহন বাক্যের সমাপ্তিতে ক্রিয়ার উপস্থিতির প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। যেমন—"তাহাকে প্রিয় পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়।" কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের বাক্য স্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে ক্রিয়া উহ্য থাকে। ইংরাজী ভাষায় বাক্যের Norm—S. V. O (কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম), বাংলা ভাষায়—S. O. V (কর্তা, কর্ম,ক্রিয়া)। বিনয় সরকার সাধারণত বাংলা ভাষার ক্রম অনুযায়ী বাক্য রচনা করেছেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি বাংলা ভাষার ক্রম থেকে সরে এসে সুন্দর effect সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ক্রিয়াহীন বাক্যগুলিতে বিচ্যুতিই—বাক্যবয়নের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছিল উদাহরণ—

(১) "এই মীমাংসা শুনিয়া মার্কিন নরনারী এবং গর্বমেন্ট জাপানের শান্তিপ্রিয়তা সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত।" (**দুনিয়ার আবহাওয়া**, পৃঃ ২১)

(২) "দুঃখবাদের সামাজিক কিম্মৎ লাখ টাকা।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১৪১)

(৩) "প্রায় সকলেই ছোকরা-যুবা আর প্রত্যেকেই নূতন দুনিয়ার সকল শক্তি শুষিয়া লইয়া স্বদেশকে বৃহত্তর করিবার মতলবে ব্রতবদ্ধ।" (**কবরের দেশে দিন পনের**, পৃঃ ২৭১)

(৪) "ভারতবর্ষের সকল বস্তুই চীনাদের বিবেচনায় বুদ্ধমার্কা"। (**চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ**, পৃঃ ২৪)

(৫) "স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাহাদের জন্মগত।" (**স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি**, পৃঃ ৯২)

(৬) "তথাপি ইহারা সবাই বিশেষত্বওয়ালা ওস্তাদের মার্কামারা পেটেন্ট করা মাল।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ৯৪)

(৭) "আমার কাছে তার মাপও বাস্তব।" (**আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র**, পৃঃ ২৮)

(৮) "গৃহের চারিদিকে বাগান—অট্টালিকা আধুনিক ধরণের।" (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ৯২)

এই ক্রিয়াহীন বাক্যগুলি আধুনিক সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। রচনায় ব্যাকরণ বিদ্রোহ যে ভাষায় ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করতে পারে—তা এই ক্রিয়াহীন বাক্যগুলি দেখলে বোঝা যায়।

"বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ সত্যের আবিষ্কারকেরা যে ভাবে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রমসংশোধন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া একটি দুইটি করিয়া খন্ড সত্য সংগ্রহের পর শেষে সম্পূর্ণ সত্যের দুর্গ করতলগত করেন, ছাত্রকেও ঠিক সেইভাবে আবিষ্কার করিতে করিতে, অজানা পথের ভিতর দিয়া অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।" (**প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা**, পৃঃ ১৮)

এই অনুচ্ছেদের ১০টি ক্রিয়াপদের মধ্যে ৯টি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। ধরা যাক, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ x এবং সমাপিকা ক্রিয়াপদ y। তাহলে অংশটি হয় x x - - - x - - x y, xx - - -x - - x y অর্থাৎ একই জিনিষের আবর্তনে একটি Pattern সৃষ্টি হয়েছে। একই Pattern-এর ক্রিয়ার একাধিকবার ব্যবহারে ভাষার মধ্যে ধ্বনির উত্থান-পতন ঘটেছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এই ধরণের নুমনা নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

"চলিয়া-চলিয়া হাঁটিয়া-হাটিয়া যে লোকটা - - - নাই।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১০৯)

"পথে যাইতে-যাইতে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়।" (**নিগ্রোজাতির কর্মবীর**, পৃঃ ১২৭)

"সঙ্গীত চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয় গল্প করিতে-করিতে - - হইলাম।" (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ১৭৯)

" দেখিতে-দেখিতে - - - খোলা হইল।" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ২১)

"খুঁটিয়া-খুটিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।" (**হিন্দুরাষ্ট্রর গড়ন**, পৃঃ ৯৪)

"পান চিবুতে-চিবুতে হেঁদো - - গল্প গুজব।" (**আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র**, পৃঃ ৮)

বাংলা পদবন্ধ সংস্থানের ক্রমটি তিনি নানা ভাবে ভেঙ্গেছেন তাঁর রচনাতে। সরকারী গদ্যে inversion-এর অভাব নেই। যেমন ঃ—

(১) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ঃ—

"নেপোলিয়ন ছিলেন বিলকুল ক্লাসিক।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ১৩২)

"বিবেকানন্দের ঝুলিতে ছিল বেদান্ত।" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ২৯৪)

"তিনি অবশ্য ছিলেন সামরিক নৌবিভাগের কাপ্তেন।" (**ইতালিতে বারকয়েক**, পৃঃ ৪৪)

(২) ক্রিয়া-অধিকরণ ঃ—

"স্বরাজ চলিতেছে সকল স্বাধীন দেশে।" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ৫)

"এই নীতি পরিবর্তনের আবশ্যকতাটা সমঝিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে হরদম লোকের স্রোত চাই নগরে-নগরে।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ১১১)

"এইরপে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইতেছে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশে।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১০৭)

"গাড়ো আড্ডা বিদেশে।" (**আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র**, পৃঃ ৩৭)

"গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল হেরোনায়।" (**ইতালিতে বারকয়েক**, পৃঃ ১১)

"থাকা হয় ফরাসী হোটেলে।" (**ধনদৌলতের রূপান্তর**, পৃঃ ১৭১)

(৩) ক্রিয়া-বিশেষণ ঃ—

"কিন্তু এই দস্তুরে গলদ আছে বিস্তর।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ৮১)

"সংখ্যায় হইলেন তাঁহারা ছয়জন।" (**চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ**, পৃঃ ১১০)

"সুইসরা রাঁধে ভাল।" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ৬)

"ব্যক্তিত্বজ্ঞান ছিল টনটনে।" (**হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন**, পৃঃ ৩৩)

(৪) ক্রিয়া-কর্তা ঃ—

"পথে পড়িল রাখাল বালক।" (**সুইটসাল্যান্ড**, পৃঃ ৪৬)

"- - - ধুরন্ধর ছিলেন কুস্তীগীর লাঠিয়ালেরা।" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ৬৯)

"ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রিন্স ইতো।" (**নবীন এশিয়া জন্মদাতা**, পৃঃ ২১৩)

অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে ভাষার ছন্দোস্পন্দ তরঙ্গায়িত হয়। গদ্যছন্দের যাদু তার অনিয়মে। **Aristotle** যথার্থই বলেছেন— **"The form of style must be within metrical or yet without rhythm - - -Prose style must have form, but not metre."** [৫] অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের নির্মাণ যে কত স্বচ্ছন্দ ও বেগবান্ হতে পারে—তার উদাহরণ সরকারী গদ্য থেকে চয়ন করলে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষতর হয়ে ওঠে। অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যারম্ভ করার প্রবণতা তাঁর রচনায় কম নয়। যেমন ঃ—

"দেখিলেই মঙ্গোলীয় জাতির মুখশ্রী বোঝা যায়।" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ১৩)

"হাঁটিয়া উঠিতে লাগে তিন-চার ঘন্টা।" (**সুইটসার্ল্যান্ড**, পৃঃ ১৭)

"খাটিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা অর্জন করা যায়।" (**জর্জ্জ ওয়াশিংটন হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত**, পৃঃ ২)

"মাপিয়া-জুকিয়া - - -অসম্ভব।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ১০২)

"দেখিয়া মনে হইতেছে - - -করিয়াছে।" (**কবরের দেশে দিন পনের**, পৃঃ ১৩৯)

"দেখিয়া অবাক হইলাম - - - নাই।" (**নিগ্রোজাতির কর্মবীর**, পৃঃ ১২৬)

"চলিলে তাহা পরিমাণ - - - নয়।" (**একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ১৯৩)

"দেখিয়া-শুনিয়া - - - হইল না।" (**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ৮২)

"দেখিতে-দেখিতে - - - পাইল।" (**পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র**, পৃঃ ২১২)

আবার অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্য সম্পূর্ণ হবার উদাহরণও তাঁর রচনায় মেলে।

"এদিকে ফ্রান্সে ইতালিতে - - -উপকূল লইয়া।" (**দুনিয়ার আবহাওয়া**, পৃঃ ৪)

"তাহার ঠাঁইয়ে চায় - - - কায়েম করিতে।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ১১)

"যদি চক্ষু থাকিত তাহা হইলে লজ্জিত হইতে।" (**নিগ্রোজাতির কর্মবীর**, পৃঃ, ২১৯)

"তাহার নামটা আসিয়াছে মার্কিন মুল্লুক হইতে।" (**একালের ধনদৌতল ও অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ৩৭)

"ঠিক এই পরিমাণ টাকা - - - সেলামি করিয়া।" (**ধনদৌলতের রূপান্তর**, পৃঃ ১০৬)

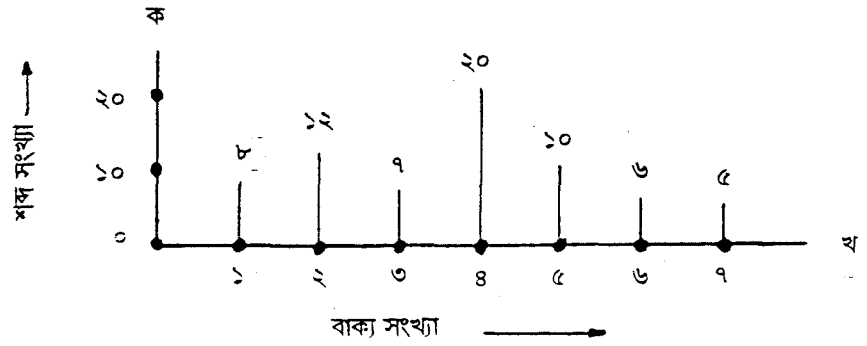
"ফিও (ফুল) ফিও" বলিয়া এক পাঁচ-ছয় বৎসরের ইতালীয় বালিকা প্রায়ই আসে ফুল বেচিতে।" (**সুইটসার্ল্যান্ড**, পৃঃ ৪৭)

"তাহাদের তহবিলে কাঁচা-টাকা অনেক মজুত হয় বলিয়া।" (**যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ২৩)

বাক্য দীর্ঘ হয় সাধারণতঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, বিশেষ্যের প্রতি নির্দেশক, অসমাপিকা ক্রিয়া, বাক্য সংযোজক অব্যয়, পদবন্ধ (অর্থাৎ, 'যে.....সে', 'যখন.....তখন', 'যার.....তার', 'যেমন.....তেমন' ইত্যাদি জুড়ে বিশেষ্যের সম্বন্ধে information বাড়ানোর উপায়) এবং বিশেষণ জাতীয় বাক্যালংকার ইত্যাদি যোগ করে। সরকারী গদ্যের ভাষার স্বভাবে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন—

"একটি নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই কোন্ সত্য প্রচারের জন্য কবি অভিনয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন বোঝা যায়, কিন্তু বিশ্বকবিবরের কোন্ মহামন্ত্র জগতের ইতিহাস রচনার মূলে, সভ্যতার শেষ অঙ্ক কোথায়, শেষ দৃশ্যে কোন্ সত্য, কোন্ বিদ্যা প্রচারিত হইয়া কোন্ অসত্যকে দলন করিবে, তাহা অবধারণ করা অসম্ভব।" (**ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**, পৃঃ ৪২)

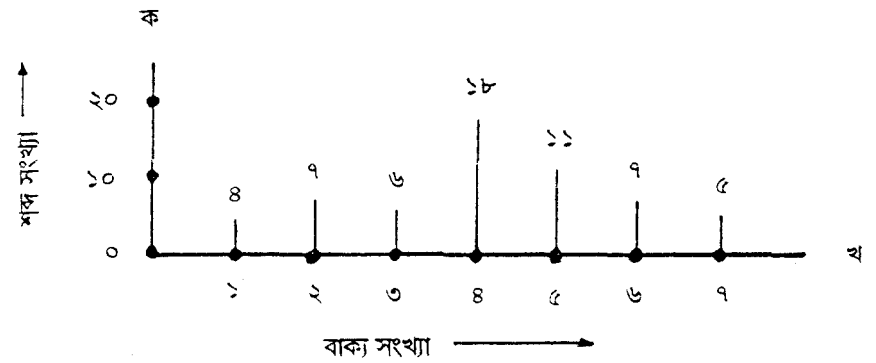
এই ধরণের বাক্য বিস্তৃতি বিনয় সরকারী গদ্যে "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থ ছাড়া আর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়—একই দৈর্ঘ্যের বাক্য একই অনুচ্ছেদে বার-বার ব্যবহৃত হয় নি। গদ্যছন্দের যে নিয়ম অর্থাৎ বিসম মাপের বাক্য—তা বিনয় সরকারের রচনায় মেলে। ছোট-বড়-মাঝারি মাপের বাক্যের মিশ্রণে সাম্য আসে। সরকারী গদ্যে একই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন মাপের বাক্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বিনয় সরকারের কয়েকটি গ্রন্থের যে কোন অনুচ্ছেদের রেখাচিত্র থেকে ব্যাপারটি দেখা যেতে পারে।



[লী আজও.....ভবঘুরের জীবন।]

চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, (পৃষ্ঠা - ১২৬)

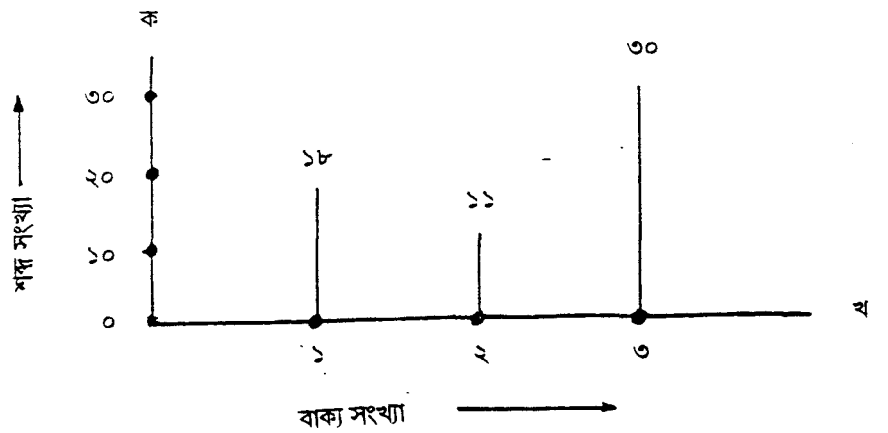
রেখাচিত্র - ১



[ভিয়েৎ আধুনিক ..... আবিষ্কারে।]

প্যারিসে দশমাস (পৃষ্ঠা - ১৫২)

রেখাচিত্র - ২



[দ্বিতীয়তঃ সমাজের ..... হইয়াছে।]

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (পৃষ্ঠা - ৫২)

রেখাচিত্র - ৩

১নং রেখাচিত্রটি বিনয় সরকারের "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" গ্রন্থের "লী আজও - - - ভবঘুরে জীবন" (পৃঃ ১২৬) অংশটিতে মোট ৭টি বাক্য আছে। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ সংখ্যক বাক্য যথাক্রমে ৮, ১২, ৭, ২০, ১০, ৬, ৫, ইউনিট দৈর্ঘ্যের। ১ ও ২, ২ ও ৩, ৩ ও ৪, ৪ ও ৫, ৫ ও ৬, ৬ ও ৭ এর পারস্পরিক দৈর্ঘ্য পার্থক্য যথাক্রমে ৪, ৫, ১৩, ১০, ৪, ১, অর্থাৎ বাক্যগুলি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে সমান নয়। এখানে বাক্যদৈর্ঘ্য ২০ এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। একই ভাবে 'প্যারিসে দশমাস' গ্রন্থের "ভিয়েৎ-আধুনিক- - - আবিষ্কারের" (পৃঃ ১৫২) অংশটি রেখাচিত্র অঙ্কন করলেও দেখা যায় এখানেও বাক্যদৈর্ঘ্য ১৮-র মধ্যে ওঠা নামা করেছে। বাক্যগুলির পারস্পরিক দৈর্ঘ্যেও সমান নয়। আবার "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" গ্রন্থের (পৃঃ ৫২) "দ্বিতীয়তঃ সমাজের - - -হইয়াছে" অংশটির রেখাচিত্র অঙ্কন করলে দেখা যায় অনুচ্ছেদটি মাত্র তিনটি বাক্যে সমাপ্ত। ১ম বাক্যটি ১৮ ইউনিট দৈর্ঘ্যের, ২য় বাক্যটি ১১ ইউনিট দৈর্ঘ্যের, এবং ৩য় বাক্যটি ৩০ ইউনিট দৈর্ঘ্যের। অর্থাৎ এখানে লেখকের লেখার প্রবণতা দীর্ঘবাক্যের প্রতি। তবে ১ম ও ২য় রেখাচিত্র থেকে বোঝা যায় তাঁর সেখানে ক্ষুদ্রবাক্যের প্রতি প্রবণতা। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অনুচ্ছেদের ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এগুলি সাধুরীতির অন্তর্ভূক্ত এবং এতে দুধরণের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি সহজ হাল্কা বাক্‌রীতি আর একটি তৎসম শব্দবহুল দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা। ভ্রমণ সাহিত্যমূলক গ্রন্থের বাক্‌রীতির তুলনায় শিক্ষামূলক গ্রন্থের বাক্‌রীতি দীর্ঘবিস্তারী। অর্থাৎ বিষয়ের পরিবর্তনে বাক্যগঠন হাল্কা কিংবা দীর্ঘ হয়েছে।

সংস্কৃত 'তব্য'-প্রত্যয় বিনয় সরকার বেশ কৌতুকপ্রদ ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন। ফেলে দেবার মত অর্থে 'ফেলিতব্য' ধরণের প্রয়োগ ব্যবহার করেছেন। "সমাজবিজ্ঞান" ও "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থে এই 'তব্য'-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন—'সমাজবিজ্ঞান' গ্রন্থে—"অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মাত্রই বাসি মাল বলিয়া ফেলিতব্য নয়।" আবার "বিনয় সরকারের বৈঠকে"(১ম খন্ড) গ্রন্থে—"ছোকরা ভারতের কীর্তি ফেলিতব্য চিজ্ নয়" (পৃঃ ৫৫৭), "গবেষণা বর্জনীয় বা ফেলিতব্য" (পৃঃ ৫৫৭) ইত্যাদি।

'দেখিতব্য' (ইতালিতে বার কয়েক, পৃঃ ৮), 'রূপান্তরিতব্য' (বাংলায় ধনবিজ্ঞান, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪২) ইত্যাদি ধরণের শব্দপ্রয়োগ খুব বেশী নেই।

'ওয়ালা'-হিন্দুস্থানী প্রত্যয় যোগে অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই ধরণের শব্দ তাঁর প্রায় প্রতি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। যেমন—'গড্ডাওয়ালা', 'পয়সাওয়ালা', 'টাকাওয়ালা', 'খাদওয়ালা', 'খনিওয়ালা', 'চিন্তাওয়ালা', 'মাথাওয়ালা', 'নীলমলাটওয়ালা', 'কলওয়ালা', 'নরনারীওয়ালা', 'খোরাকওয়ালা', 'সঙ্ঘওয়ালা' ইত্যাদি ধরণের বহু শব্দ সরকারী গদ্যে মেলে। তিনি 'মি'-প্রত্যয়ের প্রয়োগে শব্দ ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। 'গোঁড়ামি', 'কর্ত্তামি', 'হেতেরেমি', 'বেয়াড়ামি', 'তাঁদড়ামি', 'বাংলামি', 'আর্য্যামি', 'কুড়েমি' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁর রচনায় মেলে।

ফারসী 'তদ্ধিত'-প্রত্যয় বাংলায় প্রবেশ করেছে। বিনয় সরকার তাঁর রচনায় ফারসী-প্রত্যয় অর্থাৎ 'গিরি', 'আনি', 'দারি'-প্রত্যয় যোগে শব্দ প্রয়োগ করেছেন। 'গিরি'-প্রত্যয় (ব্যবসায় বা শীল অর্থে) 'মন্ত্রীগিরি', 'দারোগাগিরি', 'ডেপুটিগিরি', 'বাবুগিরি', 'চেয়ারম্যানগিরি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'দার'-প্রত্যয় (ধারক বা কর্তা অর্থে প্রসারে ভাবার্থে) 'দারি', 'ব্যবসাদারি' ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'আনি'-প্রত্যয় যোগে 'হিঁদুয়ানি', 'সাধুয়ানি' শব্দ তৈরী করেছেন।

বিনয় সরকারের ভাষা সহজ সরল, যে ভাষা সর্বজনের বোধগম্য সেই ভাষাতেই তিনি লিখতেন। তাঁর মর্মভেদী শক্তিশালী ভাষার ওজঃশক্তি ছিল অসাধারণ, যা সাধারণ মানুষের মনে দাগ কেটে যায়। তাঁর রচনায় ছোট বাক্যের প্রাধান্য দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত হল—"আমি চাই পাঁচ, সাত, দশ শব্দের বাক্য। লম্বা-চওড়ায় আমি বেশ কিছু ভয় পাই। - - - যেখানে যেখানে ছোট বাক্যের সমাবেশ দেখতে পাই সেখানে সেখানে আমার নজরে পড়ে তাঁদের রচনারীতির জোর। সেই সব জায়াগায় আমি পাকড়াও করি তাঁদের ভাষার ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য।"

ভাষার রীতি-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যা ভেবেছিলেন, সর্বদা তা তাঁর রচনার মধ্যে মেনে চলতে পারেন নি। তাঁর "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ", "শিক্ষাবিজ্ঞান" ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে দীর্ঘবাক্যের সমাবেশ দেখা যায়। তবে এই দীর্ঘবাক্যেও তাঁর বক্তব্যের পারম্পর্য হারিয়ে যায়নি। তাঁর সাধুগদ্যের রচনাবলীতে— **"প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, ইংরেজীতে যাকে 'Clarity of thought' এবং ফরাসীতে 'Lucidite francaise' বলে—চিন্তার সেই স্বচ্ছতা ও সুমিষ্টতা তাঁর রচনাবলীতে ছিল।"**[৬]

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. রামমোহন রায়, বেদান্তগ্রন্থ, ১৮১৫ খৃঃ, পৃঃ ১৩-১৪।

২. নির্মল দাশ, ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৩।

৩. Tryon Edwards. The New Dictionary of Thoughts. 1966. P. 641.

৪. Noam Chomsky. Aspects of The Theory of Syntax. 1994. P. 11.

৫. F. L. Lucas. The Harmony of Prose is Style. 1964. P. 190.

৬. ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা গদ্যে বিনয়কুমার সরকারের দান' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৫৩।

।। গ ।। প্রাসঙ্গিক শব্দ

প্রাগ-এর ভাষাতাত্ত্বিকগণের বিশ্লেষণ থেকে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রসঙ্গ-উপযোগী শব্দচয়ন বা Contextual use of words—বাক্যের বাচনিক এবং নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র বাচনিক ক্ষেত্রে, ভাষার শব্দ যুক্তি নির্ভর ও তাত্ত্বিক বিষয়ের উপযোগী হয়। কিন্তু লক্ষ্য যখন নান্দনিক হয় তখন প্রাসঙ্গিক শব্দের একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই প্রসঙ্গানুযায়ী শব্দ নানারকমের হতে পারে। রচনারীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ উপযোগী শব্দচয়ন।

সাধারণভাবে গদ্যরচনায় লেখকের চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত থাকে ধ্বনিগত, শব্দ বা পদপ্রকরণগত ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গানুযায়ী শব্দচয়ন চিন্তাধারা আসে পরবর্তী ভাবনায় বা after thought হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'জল' কেটে 'বারি' বসান তখন এই after thought প্রক্রিয়াটি সচেতন হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে লেখক কোন শব্দ বসাবেন, তা নির্ভর করে Context-এর ওপর।

গদ্য এবং কবিতা-সাহিত্য—এই দুই ধারার মধ্যে লেখক যে ধরণের রচনায় প্রবৃত্ত হন—তার ওপর প্রাসঙ্গিক শব্দচয়ন নির্ভর করে। কারণ গদ্যে বা মুখের ভাষায় যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, কবিতায় সেই পরিচিত শব্দ ব্যবহৃত হয় না। তাই সেই ভাষা কাব্যিক। শ্রুতিমাধুর্য্য বা ধ্বনিসঙ্গতি রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'শিশিরজল', 'অশ্রুবারি', 'তরুশাখা' ইত্যাদি ধরণের শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই শব্দগুলি গদ্যে খুব একটা দেখা যায় না। কারণ গদ্যের ভাষায় কবিতার মত ছন্দমিলের প্রয়োজন হয় না। গদ্যের ছন্দ তার অনিয়মে। কিন্তু কবিতার সৌন্দর্য্য কতগুলি নিয়মকানুনে আবদ্ধ থাকে। গদ্যে তাই 'শিশির' বা 'অশ্রু' বসালেই তার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয়।

আবার, লেখকের শব্দ নির্বাচন নির্ভর করে রচনার বিষয়বস্তুর ওপরও। ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক বা শিক্ষামূলক আলোচনায় আবির্ভূত হয় যুক্তিতর্কের সমাবেশ এবং স্বাভাবিক কারণেই শব্দচয়ন হয় তার্কিক সুলভ। আবার বিষয় যখন সাহিত্যে রূপান্তরিত হয় তখন শব্দচয়ন হয় ভাবমূলক বা রোমান্টিকতাপূর্ণ। এটা একটা সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বা style, যেখানে একই রকম আলোচনায় অন্য লেখকের শব্দচয়ন এক হয় না। এই প্রসঙ্গে শোপেনহাওয়ারের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে— **"Style is the Physiognomy of mind."**[১] আবার, লেখকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর পছন্দ অপছন্দও পরিস্ফুট হয় শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে।

শব্দ—ভাষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক রীতিবিজ্ঞানের বিখ্যাত সমালোচক **Sir Herbert Read** বলেন— **"words are the units of the composition, and the art of prose —In prose the primary function of the sound of the isolated word is its expressiveness, it must mean the thing it stands for."** [২]

এবারে বিনয় সরকারের গদ্যে এই শব্দ ব্যবহার কিভাবে সার্থক বা ব্যর্থ হয়ে উঠছে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর বিভিন্ন রচনাগ্রন্থ থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি।

(ক) "কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য্যদেব আরব্ধ হইল। মেঘের পশ্চাতে পর্ব্বতের পশ্চাতে অরুণ তপনের লাল গরিমা সমস্ত পূর্ব্বাকাশকে উদ্ভাসিত করিল। যখন মেঘ ছাড়াইয়া সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, সমস্ত পাহাড় সুবর্ণমন্ডিত বোধ হইল—এমনকি স্বর্ণগঠিতই মনে হইতে লাগিল। সমস্ত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া গলান সোনার রং সৃষ্টি করিল। আমাদের সমগ্র পূর্বদিকই সোনালি সুবর্ণরচিত, স্বর্ণময় হ্রদের দৃশ্য ধারণ করিল, পূর্বভাগের পর্ব্বতশ্রেণীও জনপ্রাণীশূন্য, তরুশূন্য, তৃণশূন্য।" **(কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ৪৪)**

(খ) "শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের নাম নিই বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব বাঙালী নন, বাঙালী বাদশা ধর্মপালের প্রভাব? বাংলার বাহিরের আবহাওয়ায় ধর্মপালের নাম হোমিওপ্যাথিক ডোজে ছড়ানো আছে মাত্র। অধিকন্তু ধর্মপাল খাঁটি বাঙালী কিনা সন্দেহ। এর সঙ্গে গবেষণার বস্তু বাঙালী কাহাকে বলে। বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্করের নাম করিতে পারি। বলিতে চাই

যে দীপঙ্কর বাপকা-বেটা বটে। তিব্বতের উপর তাঁহার প্রভাব জবরদস্ত ও বিস্তর। অতীশ দশম শতাব্দীর লোক। আজও তিব্বতে অতীশের নাম-ডাক জবর।" (**সমাজবিজ্ঞান**, পৃঃ ৩১)

(গ) "এই স্বাধীনাবস্থার ক্রমিক পরিস্ফুটতায় এবং এই স্বাধীনতার উপলব্ধিতেই ব্যক্তির বিকাশ, আনন্দ ও মুক্তি। ইহাতেই জীবনের সফলতা, মনুষ্যত্বের সার্থকতা, মানবের দেবত্ব প্রাপ্তি। সুতরাং ব্যক্তির জীবনের চরম উৎকর্ষই ভারতবর্ষের আদর্শ হইয়াছিল। এই সত্যের উপলব্ধি করিবার ফলেই তাহারা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অধিকার খর্ব্ব করিয়া ব্যক্তিকে সকলের ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিল। এজন্যই তাহার ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন ভাগ করিয়া সেই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় স্বরূপ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সহিত ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।" (**ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**, পৃঃ ৩৭)

(ঘ) "ব্যয় সংক্ষেপ, প্রতিযোগিতা-মাফিক পণ্য দ্রব্যের মূল্য সমগ্র দুনিয়ার বাজারে মাল বিক্রয় সম্বন্ধে সহকারী শিল্প সমূহ গড়িয়া তোলা, যে কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা টাটা-সন্স লিমিটেড বিশেষরূপে সমঝিয়া লইয়াছে। একমাত্র হাইড্রোইলেকট্রিক প্রচেষ্টার বেলাতেই যে তাহাদের এই ব্যবস্থা নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য শিল্প প্রচেষ্টায়ও দেখা যাইতেছে যে, তাহারা নিজেরাই নানারূপ নয়া-নয়া শিল্প কায়েম করিয়া চলিতেছে। তাহাদের নিজের এলাকার ভিতর বহু এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা কায়েম হইয়াছে যেখানে টাটা কোম্পানীর ইস্পাত কুদরতী মালরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।" (**বাংলায় ধনবিজ্ঞান, ২য় খন্ড**, পৃঃ ১২৫)

(ঙ) "বিশ্বামিত্র যে বস্তু, প্রমিথিউসও সেই বস্তু, লুসিফারও সেই বস্তু, সয়তানও সেই বস্তু। ঐক্যটা অতি মোটাভাবে ধরিয়া লইতেছি। তথাপি ইহারা সবাই বিশেষত্বওয়ালা ওস্তাদের মার্কামারা পেটেন্ট করা মাল। যখনই কোন চিত্রকরের বা ভাস্করের গড়া একই মূর্তি দশ-বিশটা স্বতন্ত্র কাজে নজরে আসে তখন আর মুখশ্রী আসে না বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকটা মনে রাখি না।

তখন দেখি কেবল কারিগর কোন রং কোথায় কতখানি ব্যবহার করেছেন। তখন বুঝি কেবল যে, খাড়াটা বাঁকাইয়া না গড়িলে চেহারাতে চিন্তার রেখা পড়িত না তখন রঙের সমাবেশে টুঁড়িয়া পাইবেন ইমারত তৈয়ারী করার কৌশল; আর বাটালির আঘাতে চোখে ভাসে আলোক ও ছায়ার লুকোচুরি। এই ধরণের দেখতে পারাটাই আসল শিল্প দেখা।" (**প্যারিসে দশমাস**, পৃঃ ৯৬)

(চ) "চাষীরা আবাদের সময় ও ধান্য কর্তনের সময়ে ধর্মস্নান করিয়া চিত্তকলেবর পবিত্র করিয়া শুদ্ধান্তকরণে ধর্মভূমিতে পদার্পণ করিত। এমনকি খন্তা, কোদাল, খুরপি, ধামা, বস্তা, বাসনকোসন সবই পবিত্র উৎসবের নিয়মানুসারে যথাবিধি শোধন করিয়া লইতে ভুল হয় নাই। সুতরাং ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের জন্য না বসিয়া থাকিলেও 'ফাস্ট ক্লাশ-পাওয়ার' হওয়া যায়।" (**বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, পৃঃ ১৯৮)

(ছ) "বিদেশী ব্যাঙ্কগুলাতে যে সব বাণিজ্য কাগজ আসে তাহার পশ্চাতে বন্ধক থাকে বিদেশী মাল। সেই মাল খালাসের জন্য টাকাও খাটে বিদেশী। কাজেই বিদেশী বাণিজ্য কাগজের জন্য টাকা ঢালিতে বসা হল্যান্ডের পক্ষে অতিমাত্রায় মুদ্রা চালানোর সমান হইয়া পড়িতে পারে। এই ভয়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হাত গুটাইয়া রী- ডিস্কাউন্ট করিতেছে। অর্থাৎ স্বদেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার ব্যাঙ্ককেই যখন তখন টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কাজেই কি স্বদেশী, কি বিদেশী উভয় প্রকার ব্যাঙ্কই এখন অনেক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাণিজ্য কাগজ কিনিতেছে।" (**একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র**, পৃঃ ১৬৭)

'ক' থেকে 'ছ' পর্যন্ত রচনাংশ ক'টি অধ্যাপক সরকারের বিচিত্র বিষয়ক ভাবনার নিদর্শন। এখানে একটি অনুচ্ছেদের পাশে আর একটি অনুচ্ছেদের ভাষার প্রকাশশীলতার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। অনুচ্ছেদগুলির বর্ণনীয় বিষয়ের স্বতন্ত্রতার জন্য ভাষার পার্থক্য ঘটেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় অনুচ্ছেদেগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের গোত্র অনুযায়ী শতকরা হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

অনুচ্ছেদ	তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ	দেশী শব্দ	বিদেশী শব্দ
ক.	৭৪%	২৪%	০%	২%
খ.	৩৫%	৪০%	১৩%	১২%
গ.	৭৩%	২৭%	০%	০%
ঘ.	৪০%	৩৭%	০%	২৩%
ঙ.	৩০%	৫৪%	৩%	১৩%
চ.	৫০%	৩৬%	৬%	৮%
ছ.	৩৫%	৪০%	৬%	১৯%

দেখা যাচ্ছে বিষয় অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ পরিবর্তিত হয়েছে। 'ক', 'গ', 'ঘ', 'চ' সংখ্যক চারটি অনুচ্ছেদ যথাক্রমে—প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক, রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক, অর্থনীতিবিষয়ক এবং ইতিহাস বিষয়ক। 'খ', 'ঙ', 'ছ' সংখ্যক অনুচ্ছেদগুলি যথাক্রমে—ধর্ম, দর্শন এবং সমাজবিষয়ক। অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে তৎসম শব্দের পার্থক্যের হিসাব করলে দেখা যায় যে 'ক' অংশে তৎসম শব্দের সংখ্যা 'খ' অংশের তুলনায় ৩৯% বেশী। আবার 'গ' ও 'ঙ' এর তৎসম শব্দের পার্থক্য ৪৩%। 'চ' অংশের তুলনায় 'ছ' এর তৎসম শব্দের ব্যবহার ১৫% কম। 'ঘ' এর তৎসম শব্দ ব্যবহার কিছু কম। এই অনুচ্ছেদটিতে তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের শতকরা পার্থক্য মাত্র ৩%। 'খ', 'ঙ' এবং 'ছ' এর তদ্ভব শব্দ-ব্যবহার বেশী হয়েছে। দেশী শব্দের ক্ষেত্রে 'খ' বেশী। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ শুধু 'গ'-তেই হয়নি।

এই সংখ্যাগুলিই অধ্যাপক সরকারের প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দের নিপুণ প্রয়োগের সমর্থন। 'Contextual use of words'-এর উপরে একজন লেখকের লেখার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। সমাস, সন্ধি সমাকীর্ণ পদগুলি 'ক' অনুচ্ছেদে সবচেয়ে বেশী ববহৃত হয়েছে। যেমন—'পূর্বকান্ত', 'সুবর্ণমন্ডিত', 'স্বর্ণগঠিত', 'সূর্য্যকিরণ', 'সুবর্ণরচিত', 'স্বর্ণময়', 'জনপ্রাণীশূন্য', 'তরুশূন্য', 'তৃণশূন্য' ইত্যাদি ধরণের সন্ধিযুক্ত বা সমাসবদ্ধ পদগুলি অন্য অনুচ্ছেদগুলিতে অনুপস্থিত। Context-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ব্যাপারটি পরিষ্কৃত হবে। 'ক' অনুচ্ছেদের বিষয় 'প্রকৃতি'—তাই এখানে তৎসম শব্দের ব্যবহার স্বাভাবিক। 'খ' অনুচ্ছেদের বিষয় ধর্ম বিষয়ক। এর উদাহরণগুলি অলংকার বর্জিত যুক্তিনির্ভর। বড়-বড় সমাসবদ্ধ পদ সৃষ্টি করে জটিলতা সৃষ্টি করেন নি। এখানে 'জবরদস্ত' (আরবী/জ.বর্‌দস্‌ত্‌), 'হোমিওপ্যাথিক ডোজ' (ইংরাজী), 'জবর' (আরবী/জবর্‌) ইত্যাদি বিদেশী শব্দ সুচারুরূপে প্রয়োগ করার ফলে বক্তব্যে সরসতা এসেছে। এই ধরণের শব্দগুলি 'ক' অনুচ্ছেদে প্রয়োগ করলে ভাষার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হত। অর্থাৎ বিষয় অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগের ফলে ভাষার মধ্যে স্বচ্ছন্দতা এসেছে। 'গ' অনুচ্ছেদের ভাষার সঙ্গে অন্য অনুচ্ছেদগুলির ভাষার পার্থক্য লক্ষণীয়। 'স্বাধীনাবস্থা', 'স্বাধীন উপলব্ধি', 'ভারতবর্ষের আদর্শ', 'ব্যক্তির বিকাশ', 'মনুষ্যত্বের সার্থকতা', 'মানবের দেবত্ব প্রাপ্তি', 'ব্যক্তি', 'রাষ্ট্র', 'সমাজ' ইত্যাদি তৎসম শব্দগুচ্ছ রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক।

শব্দ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বিনয় সরকারী স্টাইলের একটি বৈশিষ্ঠ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি তাঁর সাধু-গদ্যরীতিতে—তৎসম শব্দের সঙ্গে চলতি, বিদেশী, দেশী বা গ্রাম্য শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ অর্থাৎ গুরুচন্ডালির সজ্ঞান ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার 'খ', 'ঘ', 'ঙ', 'ছ' অংশে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা গেছে। 'ক' ও 'চ' অংশে তুলনামূলক ভাবে এই ব্যবহার কিছু কম হয়েছে। তবে 'গ' অংশে এই ব্যবহার একেবারেই নেই। বিষয়ের পরিবর্তনের জন্যই এই ব্যবহার কম বেশী হয়েছে। 'ঙ' অনুচ্ছেদে 'বিশেষত্বওয়ালা,' 'মার্কামারা', 'পেটেন্ট করা মাল', 'টুঁড়িয়া', 'ইমারত' ইত্যাদি ধরণের বিদেশী শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলি শব্দ সম্পদের একটি বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্য। 'ঘ' অনুচ্ছেদে 'ব্যয় সংক্ষেপ',

'পণ্যদ্রব্য', 'শিল্পসমূহ', 'ব্যবসা', 'নৈপুণ্য' ইত্যাদি তৎসম শব্দের সঙ্গে বিদেশী শব্দ 'হাইড্রোইলেক্ট্রিক' (ইংরাজী), 'মাল' (আরবী), 'দুনিয়া' (আরবী/দুন্‌যা, হিন্দী/দুনিয়া), 'নয়া-নয়া' (হিন্দী), 'কুদরতী' (আরবী/কুদ্‌রত্‌), 'এঞ্জিনিয়ারিং' (ইংরাজী) যুক্ত হয়েছে। এই শব্দগুলি অর্থনীতিবিষয়ক। এই ধরণের শব্দপ্রয়োগ 'ক' ও 'গ' অংশে করলে ভাষার প্রকাশশীলতা নষ্ট হত। অর্থাৎ বিষয়ের পরিবর্তনের জন্য—ভাষার চালও পরিবর্তিত হয়েছে। কেবল তৎসম শব্দের ব্যবহারেই রচনার চলৎশক্তি যেমন বিনষ্ট হয় না, তেমনি বিদেশী শব্দের ব্যবহারেও রচনা গতিবিমুখ হয় না। উপরোক্ত উদাহরণগুলি তার প্রমাণ। বিষয় অনুযায়ী দেশী, বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁর রচনার বৈভব বৃদ্ধি করেছে। শব্দের এই বিচিত্র ব্যবহারে ভাষা গতিময় ও অন্তরঙ্গ হয়েছে।

'ছ' অনুচ্ছেদে 'কাজেই', 'অর্থাৎ' শব্দের একাধিকবার ব্যবহার ঘটেছে। এই শব্দগুলি কল্পনা অনুভূতিপ্রবণ বা বর্ণনাত্মক রচনায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনিবার্য নয় কিন্তু তর্কবিতর্কমূলক, যুক্তি ও সিদ্ধান্তসূচক রচনায় অনিবার্য 'ছ'-এর বক্তব্য-বিষয় অর্থনীতি সম্পর্কিত। যতটা যুক্তি ও বুদ্ধিজাত—ততটা আবেগের নয়। অতএব শব্দের প্রয়োগও তদনুরূপ। এই Contextual সফলতা বড় লেখকদের আয়ত্তাধীন বিষয়। বিনয় সরকারের তা ছিল।

তৎসম শব্দের যে ব্যবহার সরকারী গদ্যে লক্ষিত হয় তার কয়েকটি বিশেষ মাত্রা আছে। সেগুলিকে একের পর এক বিশ্লিষ্ট করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, প্রকৃতি বর্ণনায় স্বাভাবিক ভাবেই অলংকরণের ডাক পড়ে। 'ক' অনুচ্ছেদের বিষয় 'প্রকৃতি', এখানে চিত্রকল্পের যোগে ভাষা অলংকৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, লঘু বিষয়কে তৎসম শব্দের আবরণে মুড়ে Contrast সৃষ্টি করার রীতিটি, সজ্ঞান হাস্যরস বিধানের জন্য গ্রহণ করেছেন। এই রীতিটি 'চ' অনুচ্ছেদে লক্ষিত হয়। এই অনুচ্ছেদ বিষয় যদিও ইতিহাস সম্পর্কিত, কিন্তু এখানে ইতিহাসের যে বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে তা লৌকিক।

তৃতীয়তঃ, বিষয় যখন গম্ভীর হয়েছে, তখন ভাষার চালও গম্ভীর হয়েছে। তৎসম শব্দে ভাষার গাম্ভীর্য অনেক বেশী বৃদ্ধি করেছে। 'গ' অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক—এই জাতীয় রচনায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

আলাপ আলোচনায় ভাষার স্বভাব বজায় রাখতে হলে—তার বয়নরূপ ও পদ্ধতি জটিল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। Conversation mood বা কথোপকথনের সময় বিদেশী ও লৌকিক বা দেশী শব্দ প্রয়োগের ফলে ভাষায় স্বচ্ছন্দতা এসেছে। নমুনা সহযোগে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

(ক) "স্বামীজিরা চোপর দিনরাত দেশ বিদেশে লোকজনের সঙ্গে খোলামাঠে সহযোগ চালিয়ে পড়ে উঠ্‌ছেন। অনেকেই জবরদস্ত কর্মবীর, খাঁটি ভক্তিযোগী আর পাকা জ্ঞানযোগী, তাঁদের মাথায় নিত্য নতুন তাজা-তাজা ঘিলু এসে জুট্‌ছে। সেই ঘিলুতে আছে পাড়াগেঁয়ে ভিটামিন, শহুরে ভিটামিন, শক্তিধর নরনারীর ভিটামিন"। (**বিনয় সরকারে বৈঠক, ১ম খন্ড,** পৃঃ ১৯৮)

(খ) "বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির ইজ্জদ হবে কিসের জোরে, গবেষণা-ঠবেষণার জোরে নয়। যদি তের মাইনে হয় (ভারতীয় অবস্থা মাফিক) কম-সে-কম হাজার দেড়েক বা দুই টঙ্কা আর তার ঠিক নিচের গবেষকের মাইনে থাকে মাত্র শ' দুই বা আড়াই। তাতে আর দ্বিতীয়তে কারণ থাকা চাই বিপুল।" (**বিনয় সরকারের বৈঠক, ১ম খন্ড.** পৃঃ ১৯৮)

স্টাইলের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এই দুই রচনা বৈঠকী মেজাজের। উদ্ধৃত রচনাংশের 'ক' অংশে 'চোপর দিনরাত', 'জবরদস্ত কর্মবীর', 'পাকা জ্ঞানযোগী', 'খাঁটি ভক্তিযোগী', 'নতুন তাজা-তাজা ঘিলু', 'পাড়াগেঁয়ে ভিটামিন', 'শহুরে ভিটামিন', 'শক্তিধর নরনারীর ভিটামিন' ইত্যাদি বিদেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম বা তদ্ভব শব্দের সম্পৃক্ত ব্যবহার—এখানে ব্যবহৃত শব্দ সম্পদের একটি বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য। 'খ' অনুচ্ছেদে দেশী শব্দের সঙ্গে বিদেশী, তদ্ভব শব্দের ব্যবহার লক্ষিত। যেমন—'কম-সে-কম হাজার দুই টঙ্কা', 'ফারাক থাকা', 'গবেষণাগুলির ইজ্জদ' ইত্যাদি ধরণের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'খ' অনুচ্ছেদে অনুকার-শব্দের ব্যবহারে, যেমন—"গবেষণা-ঠবেষণা"—কথ্যধর্মের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে। 'হাজার দেড়েক', 'দুই টঙ্কা' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের মাধ্যমেও কথ্যধর্মের বৈশিষ্ট্য নজির হয়েছে। এই দুটি অনুচ্ছেদের ভাষা অন্তরঙ্গ বা

Colloqual হয়েছে। প্রথম অংশের শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে বিদ্রুপাত্মক লঘুভাব অথচ স্যাটায়ারের জ্বালাধরা উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর ভাষার শব্দবৈশিষ্ট্য, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। ইংরেজী, ফারসী, আরবী, হিন্দী, দেশী শব্দ ব্যবহারে—ভাষার গতিস্পন্দন কখনো ব্যাহত হয়নি, তার স্বাভাবিকতা অক্ষুন্ন রেখে ভাষার একটি স্বচ্ছন্দ শিল্পশোভন রূপ সৃষ্টি করেছে। **"নতুন-নতুন শব্দ প্রয়োগের ও গুরুচন্ডালির পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় বিনয় কুমারের রচনাশৈলীর পরিণত প্রকাশ দেখতে পাই 'বিনয় সরকারের বৈঠকে'।"**[৩]

ভাষার effect সৃষ্টিতে—শব্দ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারী গদ্যে Context অনুযায়ী ভাষার রূপ বদলেছে। ভাষার চাল, বিষয়ের প্রয়োজনে পৃথক হয়েছে। তাঁর রচনায় তৎসম শব্দ অপেক্ষা তদ্ভব শব্দ প্রয়োগ বেশী। তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের হিসাব দেখে মনে হয়, তাঁর ভাষা মুখের ভাষার নিকটস্থ। বিষয় অনুযায়ী তাঁর সাধুরীতিতে তৎসম শব্দ প্রয়োগ থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাত—কেতাবী ভাষার চেয়ে ব্যবহারিক বা লৌকিক ভাষার দিকে। তাঁর রচনায় শব্দগুলো এমন ভাবে সজ্জিত যে পাঠকের মন ও চোখ উভয়কে তৃপ্তি দেয়। শব্দ সজ্জায় ভাষা এত স্বাভাবিক, যে তা একটু এদিক-ওদিক হলে তা আহত হতে পারে। তাই শব্দ নির্বাচনে লেখক সার্থক। ফলতঃ 'বিনয় সরকারী স্টাইল' নামে একটি বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যশীল রচনা-কৌশল বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছে।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১। Ullmann. 1964. P-154.

২। Herbert Read. English Prose Style (London. 1963). P-3.

৩। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ আকাদেমি পত্রিকা, ১৯৮৮, পৃঃ ১০৭।

— ঃ —

—ঃ পঞ্চম অধ্যায় ঃ—

বিনয় সরকারী " ফ্রেজ "



* * * * *

বিনয় সরকারী "ফ্রেজ"

একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যদি বাক্যের মধ্যে একটা পদের অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে Phrase বলে। Phrase-এ যে কোন উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকে না এবং সেটা একটা Part of speech-এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

Phrase একটি ভাষা প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গী বা রীতি। অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে—Phrase হল ভাষার প্রকাশ ঘটানোর সময় দুই বা তার অধিক শব্দের বা পদগুচ্ছের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ভঙ্গিমাপ্রদর্শন—যা সম্পূর্ণ রূপে ব্যাকরণগতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে বাচ্যার্থের প্রকাশটাই বেশী করে দৃষ্ট হয়। অনেক লেখকই সচেষ্ট হয়েছেন Phrase সহযোগে ছন্দময় গদ্যরচনার এবং চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখনীর একটা বিশেষ ভঙ্গী বা রীতি সহযোগে মনোভাব প্রকাশ করার। অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন Phrase কথাটির আসল অর্থ এবং বিভিন্ন সংজ্ঞা বা definition-এর মাধ্যমে নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন তার সঠিক আকার। উদ্দেশ্য হল, Phrase কথাটির আরও গভীর ও ব্যাপক পর্যালোচনা করা এবং অনেক বেশী সঠিক এবং ব্যাকরণ সম্মতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বেশী উন্নতমানের এবং শ্রুতিমধুর বাক্য রচনার কলাকৌশল আয়ত্ব করা।

Phrase কথাটিকে অনেকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন—**"A Phrase is—**

(1) an expresssion, consisting usually of but a few words, denoting idea or, forming a separate part of a sentence specially, a group of two or more associated words, not containing subject and predicate, distinguished from clause.

(2) a Concise, sententious expression.

(3) a characteristic mode of expression.

(4) a fragment of a melody, having well determined motion and repose but incomplete sense.

(5) a group of words conveying a single idea and forming a distinct part of a sentence." [১]

সমস্ত Phrase-এর গঠন প্রায়শঃ অপরিবর্তনীয় এবং তাদের এক শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করা চলে না। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর শ' বাক্যের গঠন বা Construction of sentence আলোচনাকালে Phrase বা পদগুচ্ছ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত দিয়েছেন। তাঁর মতে—**"বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যকে ভাষার বৃহত্তম একক বা unit ধরে তাকে ধাপে ধাপে ক্রমশ বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিশ্লেষণ করা হয়। বাক্যের এই বিশ্লেষণে তার গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজনীয়।"** [২]

'Random House of Dictionnary'তে Phrase-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—**"A sequence of two or more words arranged grammatically and not having a subject and predicate, as a preposition and a noun or pronoun an adjective and a noun verb and adverb etc."** [৩]

Webster's New Collegiate Dictionary-তে বলা হয়েছে—**"এটা একটা অল্প কথার প্রকাশ ভঙ্গিমা অথবা দু একটা শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা (a brief expression, esp catch word)".** [৪]

Chamber's twentieth Century Dictionary-তে Phrase সম্পর্কে বলা হয়েছে—**"ভাষার প্রকাশভঙ্গী বা অভিব্যক্তি প্রকাশের এক রীতি বা ধরণ (manner of expression in language)."** [৫]

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু নিজস্বতা আছে। নিজস্বতা যেমন থাকে দেহে, মনে—তেমনি থাকে চরিত্রে। এই নিজস্ব স্বতন্ত্র ভঙ্গীর নামই 'style'. সমগ্র মানুষের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি প্রযোজ্য হলেও, মুখ্যত বাচন এবং লেখন ভঙ্গীতেই শব্দটির অধিকতর প্রসিদ্ধি। একটি বিখ্যাত ল্যাটিন প্রবাদে উক্তি আছে—**"The style shows the man. Whether in speaking or writing, a gentleman is always known by his style."** [৫] **Buffon** বলেছেন—**"Style is a man's own, it is a part of a nature."** [৬] কোন লেখকের লেখনভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর বাচ্যের তথ্য-ব্যক্তিত্বের মিলনই যেন একের মধ্যে যুগলরূপ। এই যুগলরূপের তারতম্যের জ্বলন্ত উদাহরণ সমসাময়িক লেখকত্রয়—বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যশৈলী তথা রচনারীতি বা style-এর পার্থক্য।

রচনাকালে বাক্যের মধ্যে Phrase সংযোজন এবং সেরূপে বক্তব্যের বলিষ্ঠতা এবং লাবণ্যতা বৃদ্ধি যে কোন লেখকের একটা স্বকীয় মনোভাব বা Style-এর পরিচয় বহন করে। উপযুক্ত জায়গায় Phrase ব্যবহারের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে রচনার সৌন্দর্য। কারোর রচনায় Phrase ব্যবহৃত হয় বিচ্ছিন্নভাবে, কারোর বা প্রতিনিয়ত। বিনয় সরকার Phrase ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনবোধে। **Swift** বলেছেন—**"Style may be defined as proper words in proper places"** [৮] উক্তিটি বাস্তবিক সবরকমভাবে প্রযোজ্য বিনয় সরকারের ক্ষেত্রে। তাঁর Phrase-গুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী শব্দ সম্বলিত এবং সর্বোপরি সৃজনশক্তির অপূর্ব উদাহরণ। তাঁর কথোপকথন মূলক গ্রন্থ "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম ও ২য় খন্ড) Phrase-এর ব্যবহার—সাধু গদ্যে রচিত গ্রন্থগুলির তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে।

"এ সমস্তের কিস্মৎ লাখ টাকা (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫)—এখানে 'কিস্মৎ লাখ টাকা' Phrase-টি এবং 'দাম লাখ টাকা' কথাটি একই অর্থ বহন করে। তথাপি 'কিস্মৎ' শব্দযোগে বিনয় সরকার এখানে বক্তব্যের মধ্যে বলিষ্ঠতার সৃষ্টি করেছেন। 'কিস্মৎ' শব্দটি আরবী 'কী.মত' থেকে সৃষ্ট এবং এই বিদেশী শব্দসম্বলিত Phrase-টি তাঁর রচনার একটি বিশেষ রীতি। এখানে এই শব্দটির পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করলেও বাক্য রচনা সম্ভব হত কিন্তু তাতে বিনয় সরকারী গদ্যের সাবলীল ছন্দের দিকটির উন্মোচন ঘটত না।

কথোপকথন মূলক গ্রন্থ 'বিনয় সরকারের বৈঠকে'—অধ্যাপক সরকার বিপুল Phrase সংযোজন করেছেন। তবে তাঁর সাধুভাষায় রচিত গ্রন্থেও কিছু Phrase-এর ব্যবহার দেখা গেছে। চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সঙ্কল্প তাঁর এই পদগুচ্ছগুলির মধ্যে চরম প্রতিফলিত হয়েছে। **Smith** বলেছেন—**'Writing reflects the character".** [৯] নমুনা সহযোগে বিষয়টি প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠবে।

(১) "তাছাড়া আমার মতামতের দাম এক-দামড়িও নয়।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫)—"এক -দামড়ি" (Phrase)

(২) 'দুনিয়ার সকল দেশেই লোকের ক্যার্দ্দানি জরিপ করা হয় তার বাইরের চটক দেখে'। (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৯)—'ক্যার্দ্দানি জরিপ করা' (Phrase)

(৩) "সমাজতন্ত্রের ঝাঁজাল মগজ নিয়ে কেশব সেন, বাংলায় ফিরে এসেছিলেন।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৪)—'ঝাঁজাল মগজ' (Phrase)

(৪) "বাঙালী জাতের ভেতর নয়া-নয়া হাড়মাসের নরনারী খানিকটা মাথা চেঁড়ে তুলবে।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০০)—'নয়া-নয়া হাড়মাসের নরনারী' (Phrase)

(৫) "আমার বিশ্বাস বিবেকানন্দকে দু-এক কথায় চুমড়ে নেওয়া সোজা নয়।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৩১)—"চুমড়ে নেওয়া" (Phrase)

(৬) "শিল্প বাণিজ্যের মোল্লাগিরি করা এক চিজ্ আর শিল্প বাণিজ্যে ধুরন্ধর হওয়া আর এক চিজ্।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৩)—"মোল্লাগিরি করা" (Phrase)

(৭) "তাঁদের ভেতর জবরদস্ত কর্মবীর দেখেছি গন্ডা-গন্ডা" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭)—"জবরদস্ত কর্মবীর" (Phrase)

(৮) "কেজো লোকেদের মগজটা চষা হয়ে যায়।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪৯)—"মগজটা চষা" (Phrase)

(৯) "আমরা নিজ মাতৃভাষা ছাড়া একটা দ্বিতীয় ভাষা ইস্তামাল করিতে অভস্ত," (সুইটসার্ল্যান্ড, পৃঃ ৩৭)—"ইস্তামাল করিতে অভ্যস্ত" (Phrase)

(১০) " সে ধাঁ করিয়া বলিয়া দেবে।" (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, পৃঃ ৫৬)—"ধাঁ করিয়া" (Phrase)

(১১) 'দুনিয়ার ঘাড় খাড়া রাখতে পারা হচ্ছে বীরত্ব।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৩)—'ঘাড় খাড়া রাখা' (Phrase)

(১২) 'মধ্য এশিয়ার হাটে আদার ব্যাপারী হইতে আধ্যাত্মিক মালের আড়তদার পর্য্যন্ত সকল ব্যবসায়ীরই লেনদেন চলিত।" (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, পৃঃ ২৪)—"আধ্যাত্মিক মালের আড়তদার" (Phrase)

(১৩) "কলিজাওয়ালা কবির দরদ ছন্দকে ছুটিয়েছে বিনা লাগামে অথচ সংযত ও সরসভাবেই" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩০)—'কলিজাওয়ালা কবির দরদ' (Phrase)

(১৪) 'সমাজে ও হৃদয়ে জোরসে ধাক্কা লাগাইতেছ।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৯)—'জোরসে ধাক্কা' (Phrase)

(১৫) "মানুষের হাড়মাসে কাম-কাঞ্চন কীর্তির দাগ, পশুত্বের চিহ্নোৎ থাকবেই।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৬৩)—'হাড়মাসে - - - - দাগ', 'পশুত্বের চিহ্নোৎ' (Phrase)

(১৬) 'ইউরোপে এই ধরণের একটা বড় সামাজিক-খিঁচুড়ি নেপোলিয়ন সমরে সাধিত হইয়াছিল।" (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, পৃঃ ৫৫)—"সামাজিক-খিঁচুড়ি" (Phrase)

(১৭) "বুদ্ধদেবের দাঁতের-ইজ্জদ যাহারা বুঝে তাহারা এই হৃৎপিন্ডের পুজাটা হজম করিতে পারিবে।" (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ৩৭)—"দাঁতের-ইজ্জদ" (Phrase)

(১৮) "বিংশ শতাব্দীর মাপকাঠিতে চীনাজাতির মূল্য কিছুই নয় কে কোন বিজ্ঞানশীল লোক আসিয়া ইহাদিগকে পাঁচজুতা লাগাইতে পারে।" (বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, পৃঃ ৮৫)—"পাঁচজুতা লাগাইতে পারে" (Phrase)

(১৯) 'অসভ্য জাপান ম্লেচ্ছ বিজ্ঞানে হাত মক্স করিতে না করিতেই আমাদের প্রবল শক্তিতে পদানত করিল।" (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ১৭৭)—"হাতমক্স করিতে না করিতেই" (Phrase)

এখানে বিনয় সরকারের ব্যবহৃত 'ফ্রেজ'-গুলির মধ্যে বিদেশী, দেশী, গ্রাম্য বা দেহাতি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন— 'জরিপ' শব্দ আরবী শব্দ 'জরীব্' থেকে সৃষ্ট। এর সঙ্গে চলতি শব্দ 'ক্যার্দ্দানি' যুক্ত করে একটি পদগুচ্ছ সৃষ্টি করেছেন। আবার আরবী 'জবরদস্ত' শব্দের সঙ্গে বাংলা 'কর্মবীর' শব্দের মিলন ঘটিয়েছেন। সরস, সহজ, খাঁটি বাংলা শব্দের 'হাড়মাসের" পাশে হিন্দী 'নয়া-নয়া' শব্দকে বসিয়েছেন। তাঁর এই ভাষাশৈলীর মধ্যে কেবল একটি লিখন রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং সমগ্র মানুষটির অবিকল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

অধ্যাপক সরকার adjective বা বিশেষণ Phrase বেশী ব্যবহার করেছেন। তবে noun phrase বা adverb phrase-এর ব্যবহারও পাওয়া যায় তাঁর রচনায়।

Noam Chomsky, তাঁর "Aspects of the theory of Syntex" গ্রন্থে বলেছেন যে—**"Though phrase is a part of sentence, totally excluded from subject and predicate, yet they have their structures well defined within a certain boundary."** [১০] তিনি আরও বলেছেন যে,—**"A phrase can represent a meaning of it's own when considered isolately or, can modify the meaning or the main theme of the sentence when added to it."** [১১] তিনি Phrase এর কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

যেমন ঃ—

(১) Nested Construction of phrasing—যখন একটি Phrase অপর আর একটি Phrase-এর মধ্যে আবদ্ধ বা অবস্থিত থাকে, তখন সেই অবস্থাকে Nested construction of phrasing বলে।

(২) Self embedded construction of phrasing—যখন দুটি Phrase—nested construction সৃষ্টি করে এবং সেই Phrase-দ্বয় প্রায় একই অর্থ বহন করে, তখন তাকে Self embedded construction of phrasing বলে।

(৩) Multiple branching Construction of phrasing—পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন, স্বতন্ত্র, একাধিক Phrase যখন একটি বাক্যে সম্পূর্ণ হয় তখন তাকে Multiple branching Construction of phrasing বলে। এই phrase-এর আকার অনেকটা এইপ্রকার—[(- - -) (- - -) (- - -)]

চমস্কির Phrase সম্পর্কে এই সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বিনয় সরকারের গ্রন্থে কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় তা দেখা যেতে পারে।

"তবে আমার মতটা নির্ভুল সমঝে রাখা আমার দস্তুর নয়।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৭) এখানে 'সমঝে রাখা আমার দস্তুর নয়'—একটি Phrase এবং "আমার দস্তুর"-ও একটি Phrase। এখানে দ্বিতীয় Phrase-টি প্রথম Phrase-এর মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ থাকার দরুন একে 'Nested Construction of phrasing'-এর শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আবার Self combeded construction-এর পরিপ্রেক্ষিতে, অধ্যাপক সরকারের "এ সম্বন্ধে আমার মতটা কিছু একবগ্‌গা, চরমপন্থী" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড) Phrase-কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ এখানে 'একবগ্‌গা, চরমপন্থী' একটি Phrase এবং 'একবগ্‌গা'-ও একটি Phrase। যেহেতু দ্বিতীয় Phrase-টি প্রথমটির মধ্যে আবদ্ধ, সেহেতু এটি Nested Construction-এর পরিপন্থী। উপরন্তু, দুটি Phrase-এর অর্থ একই প্রকার হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে Self embedded construction of phrasing।

"একতরফা, একবগ্‌গা, একচোখো মেজাজ নিয়ে এঁরা লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করত না" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৪)—Phrase-টি 'চমস্কি' বিশ্লেষিত তৃতীয় শ্রেণীর। এখানে 'একতরফা', 'একবগ্‌গা', 'একচোখো', প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র Phrase—যাদের কোন গঠনমূলক যোগাযোগ বাক্যের মধ্যে নেই এবং প্রত্যেকটি Phrase -এর অর্থ ভিন্ন এবং একযোগে সৃষ্টি হয়েছে। এই Phrase-ত্রয়কে লেখা যায় (একতরফা) (একবগ্‌গা) (একচোখো) রূপে। 'চমস্কি' বিবৃত এই ধরণের Phrase-এর কিছু উদাহরণ আচার্য সরকারের রচনায় মেলে। যেমন ঃ—

(১) "যারা কবিতা লেখে, গল্প লেখে তারা হাত-পা-ওয়ালা মানুষ, মুড়োওয়ালা মানুষ, হৃদয়ওয়ালা মানুষ।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬৮)—[(হাত-পা-ওয়ালা মানুষ) (মুড়োওয়ালা মানুষ) (হৃদয়ওয়ালা মানুষ)] (Multiple Branching phrase) (২) 'বাঙালীর-বাচ্চা, বাপ-কা-বেটা বলে দেখাবি।' (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬) [(বাঙালীর-বাচ্চা) (বাপ-কা-বেটা)] (Multiple Branching phrase)—তবে এই ধরণের Phrase-এর সংখ্যা বিনয় সরকারের রচনায় খুব একটা নেই।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যর 'বাংলা লোক সাহিত্য' (৬ষ্ঠ খন্ড) গ্রন্থে—Proverbial phrase এবং Conventional phrase সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Proverbial Phrase বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ হল একটি বিশেষ বাক্যাংশ—যার গঠন অনেকটা প্রবাদের মত কিন্তু অর্থের দিক থেকে অসম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে। এই ধরণের Phrase-এর বিশেষত্ব হল এই যে, এদের মধ্যে কোন সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, বরং অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এই সকল Phrase অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে **"ইহারা কেহই প্রবাদ নহে, কিংবা ইহাদিগের সহযোগে প্রবাদ রচিতও হয় না, ইহারা প্রবাদাঙ্গ নহে, তবে নিজেদের গঠনভঙ্গি দ্বারা ইহারা প্রবাদ বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে মাত্র।"** [১১]

বিনয় সরকারের রচনায় এই ধরণের Phrase-এর ব্যবহার কম লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণযোগে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। "মৃত্যুকে জুতাইয়া, দুরস্ত করিয়া, মৃত্যুর তোয়াক্কা না রাখিয়া, মৃত্যুভয়ে অস্থির না হইয়া, সাহসের সহিত কাজ করিতে করিতে হিন্দু নরনারী চায় প্রতি মুহূর্তেই নতুন-নতুন অমৃত বা নতুন-নতুন জীবন চাখিতে।" (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১১১)

এখানে Proverbial Phrase হল—'মৃত্যুকে জুতাইয়া', 'দুরস্ত করিয়া', 'তোয়াক্কা না করিয়া', 'অস্থির না হইয়া', 'কাজ করিতে করিতে নতুন-নতুন জীবন চাখিতে'। এই বাক্যগুলি অসম্পূর্ণ এবং অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে বাক্যগুলির নির্মাণ হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত এই Phrase-টি বিশেষ ভাব প্রকাশে সহায়তা করেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশে অক্ষম এই Phrase-টি।

Conventional Phrase-এর প্রয়োগ বাংলায় গতানুগতিক বা ভাবার্থক উক্তি বলা যেতে পারে। কিন্তু গতানুগতিক বা প্রচলিত ভাবভঙ্গী প্রবাদ নয়। **"যাহা কিছু গতানুগতিক তাহাই প্রবাদ কিংবা প্রবাদঙ্গ নহে।"** [১৩] 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম, ২য় খন্ড) গ্রন্থে এই ধরণের Phrase-এর অজস্র সন্ধান মেলে। যেমন— বিনয় সরকারের বৈঠকে (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ঃ—

(১) 'লোকটা ডানপিটে, তাঁদর আর ভবঘুরে।" (পৃঃ ২৮৫)—"ডানপিটে তাঁদর" (Phrase)

(২) "সতীশবাবুর বাথানে বিচিলি খেয়ে বহু ছোকরা মানুষ হয়েছে।" (পৃঃ ২৭১)—"বিচিলি খেয়ে" (Phrase)

(৩) "বাংলাদেশে এই পত্রিকার কাটতি কতটা ছিল জানি না।" (পৃঃ ২৭৬)—"পত্রিকার কাটতি" (Phrase)

(৪) "সকল প্রকার মত-পথই আমার চৌবাচ্চায় ঠাঁই পেয়েছে।" (পৃঃ ৯২)—'চৌবাচ্চায় ঠাঁই' (Phrase)

(৫) "এই বইয়ের ভেতরটা কামড়াতে গেলেও চাই ঠিক সেই রকম কাঠ-খড় আর কোস্তা-কুস্তি " (পৃঃ ৮৩)—"কাঠ-খড় আর কোস্তা-কুস্তি" (Phrase)

(৬) "আমাকে যেখানেই চিবুস না কেন, পাবি দিগ্‌বিজয়, পাবি নবীন ভারতীয় সাম্রাজ্য।" (পৃঃ ১২১)—"চিবুস না কেন" (Phrase)

(৭) "এরা মাথা চেঁড়ে উঠবেই উঠবে।" (পৃঃ ১৩০)—'মাথা চেঁড়ে' (Phrase)

(৮) "বেদান্তের ওপর চাঁটি মারে সকলেই।" (পৃঃ ১৩৭)—"চাঁটি মারে" (Phrase)

(৯) "অল্প কয়েকটা বড়ি ছড়ালে পন্ডিতি করা চলে না।" (পৃঃ ১৪৭)—'বড়ি ছড়ালে" (Phrase)

(১০) "এই বক্তৃতা সমূহ যুবক ভারতের উপর বিবেকানন্দের চাবুক"। (পৃঃ ১৮৮)—"বিবেকানন্দের চাবুক" (Phrase)

(১১) "স্বামীজিরা মরচে-পড়া লোক নন।" (পৃঃ ১৯৪)—'মরচে-পড়া লোক' (Phrase)

(১২) "আজকাল টুলো ভায়ারা দেশ বিদেশে গিয়ে একটু-আধটু দুধ-কলা ভোগ করতে পান"। (পৃঃ ১৯৭)—"দুধ-কলা ভোগ" (Phrase)

বিনয় সরকারের বৈঠকে (২য় খণ্ড) গ্রন্থে ঃ—

(১৩) "হাসিতে দাঁত, ছোরা বা বিষ নাই।" (পৃঃ ১১০)—"দাঁত, ছোরা বা বিষ নাই" (Phrase)

(১৪) "পয়সাওয়ালারা জগৎখানাকে পয়সার জোরে জুতোবেই জুতোবে।" (পৃঃ ১৩১)—"জুতোবেই জুতোবে" (Phrase)

(১৫) "প্রবীণেরা তাদের ঘাড় মট্‌কে দিচ্ছে চোপর দিনরাত।" (পৃঃ ১৩২)— "ঘাড় মট্‌কে" (Phrase)

(১৬) "চোঁথা কাগজে পাই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।" (পৃঃ ১৩৭)— "ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ" (Phrase)

(১৭) " অজানা-অচেনা-অবিখ্যাত লোকজনের সঙ্গে দহরম-মহরম চালানো আমার রক্তের সঙ্গে গাঁথা।" (পৃঃ ১৩৭)— "রক্তের সঙ্গে গাঁথা" (Phrase)

(১৮) "একালের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব কিছুই ধরা দিয়েছে এই মগজ-সঙ্ঘের চৌবাচ্চায়।" (পৃঃ ১৯৮)— "মগজ-সঙ্ঘের চৌবাচ্চায়" (Phrase)

(১৯) "দুনিয়ার হালচাল সুবিমল মুখোপাধ্যায়, সত্য চট্টোপাধ্যায় আর অমলেন্দু দাশগুপ্তর মগজে ও হৃদয়ে জোরসে ধাক্কা লাগাইতেছে।" (পৃঃ ১৯৯)— "মগজেও হৃদয়ে জোরসে ধাক্কা" (Phrase)

(২০) "এই ধরণের সার্ব্বজনিক সামিয়ানার তলায় বারভূতের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি অসম্ভব নয়।" (পৃঃ ২০৮)— "বারভূতের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি" (Phrase)

(২১) "ধনীরা মনে করে যে গোটা কয়েক টাকা যখন দেওয়া হয়েছে তখন গরীব মাথাওয়ালাদের মুড়োটা তারা কিনে রেখেছে।" (পৃঃ ২১৮)— "গরীব মাথাওয়ালাদের মুড়োটা" (Phrase)

(২২) "বই দুটোর হাড়-মাস সর্ব্বদা চিবুতে আরম্ভ কর।" (পৃঃ ২২৮)— "বই দুটোর হাড়-মাস" (Phrase)

(২৩) "এই সবের উপর চাবুক লাগিয়েছে চোস্ত-কড়া ঠাট্টার পশলা ছড়িয়ে।" (পৃঃ ২২৯)— "চাবুক লাগিয়েছে", "চোস্ত-কড়া ঠাট্টার পশলা" (Phrase)

(২৪) "আন্দোলন চল্‌ছে মস্তিষ্কজীবীদের হাত-পা'র জোরে আর মাথার জোরে"। (পৃঃ ২৭২)— "হাত-পা'র জোরে", "মাথার জোরে" (Phrase)

(২৫) "বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর হিংসা মাথা চেঁড়ে তোলে।" (পৃঃ ৩১৯)—"মাথা চেঁড়ে তোলে" (Phrase)

(২৬) "যে জাতের টাকার জোর আছে তাকে ধাঁ করে কুপোকাৎ করা সম্ভব নয়।" (পৃঃ ৬৩৩)— "ধাঁ করে কুপোকাৎ করা" (Phrase)

উপরে উদ্ধৃত ১নং অংশে—'ডানপিটে, তাঁদড়', ২নং অংশে—'বিচিলি খেয়ে' এবং ৩নং অংশে—'পত্রিকার কাট্‌তি' ইত্যাদি Phrase-গুলির আক্ষরিক অর্থটাই সব কিছু নয়। এই সকল পদগুচ্ছের বিপরীত অর্থটাই এখানে প্রতীয়মান হয়েছে। যেমন—'দুর্দ্দান্ত' অর্থে 'ডানপিটে, তাঁদড়' বলা হয়েছে। আবার 'বিচিলি খেয়ে'-এর অর্থ হয়েছে 'কাজ করে' কিংবা 'উপদেশ শুনে' এবং 'পত্রিকার কাট্‌তি' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'পত্রিকার প্রচার'। উপর্যুক্ত প্রতিটি Phrase-এরই বিপরীত অর্থ আছে। অতএব, আচার্য সরকার Conventional Phrase-এর প্রয়োগ তাঁর রচনায় শিল্প সম্মতভাবে করেছেন।

"Style shows the man or style is the man"—এই জাতীয় উক্তিগুলির যথার্থের উজ্জ্বল উদাহরণ বিনয় সরকারের রচিত এই Phrase-গুলি। চলা-পথে চলা সাধারণ মানুষের অভ্যাস। কিন্তু অচলা পথে চলা প্রতিভার লক্ষণ। অপরের চশমা দিয়ে নয়, নিজের লেখা দিয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন এবং তথ্য ও যুক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক শৃঙ্খলা-নিষ্ঠ চিন্তার গড়ন। এই Phrase-গুলি তাঁর এই চিন্তার ধারক।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১। Webster's Comprehensive Dictionary, International Edition, Volume-2, 1997, P-952.

২। ডঃ রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ২য় খন্ড, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৩৪৮-৪৯।

৩। The Randam House Dictionary (College Ed), Indian Publication-1972, Allied Publishers Pvt. Ltd., P-1000.

৪। Webster's New Collegiate Dictionary, Indian edition of 1981, P-858.

৫। Chamber's Twenteeth Century Dictionary, Edited by William Geddle, New Edition with suppliment, 1959, P-818.

৬। Tryon Edwards, The New Dictionary of Thoughts, 1966, P-641.

৭। Ibid, P-642.

৮। Ibid, P-641.

৯। Ibid, P-746.

১০ Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, 1994, P-13 and 14.

১১ Ibid, P-11.

১২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খন্ড), প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, ১৭ পৃঃ।

১৩ তদেব, ১৯ পৃঃ।

— ঃ —

—ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ—

বাক্যবিন্যাস



সাহিত্যধর্মী, রচনাধর্মী, বৈঠকী মেজাজের

সাহিত্যধর্মী, রচনাধর্মী, বৈঠকী মেজাজের

সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনাকালে **Cicero** বলেছেন যে—**"The literature is one that nourishes youth, entertains old age, adorns prosperity, solaces adversity, delightful at home and unobtrusive abroad."** [১] মনের সুপ্ত চিন্তাধারা যখন শিল্পীর তুলিতে আকার পায় তখন জন্ম নেয় শিল্প আর লেখকের কালিতে সৃষ্ট হয় সাহিত্য। সাহিত্য কোন ব্যক্তি, কাল বা স্থানের নয়—এটি সর্ব্বকালের এবং সার্বজনীন। **De Quiency**-র মতে—**"Literature is the power to teach, to move and to develop."** [২]

সাহিত্য সৃষ্টি-কালে লেখকের ভাষা কখনও বস্তু-নিষ্ঠ হয়—কখনও বা আবেগপ্রবণ হয়। ভাবের আবেগ যখন কম হয় তখন অলংকার প্রয়োগের অবকাশ কম হয়। আর বিষয় যখন রোমান্টিক হয়, তখন সে ভাষা অলংকারমন্ডিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ **"ভাষার ক্ষেত্রেও—প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটিতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। .....বিচিত্র ফুলে, ফলে, পল্লবে, শাখায়, কান্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব। ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে।"** [৩]

বিনয় সরকারের নানা বিষয়ে প্রকাশিত রচনা—নানা আকারে, বহুস্থানে ছড়িয়ে আছে। অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভ্রমণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের রচনা—তাঁর গভীর এবং ব্যাপ্ত পান্ডিত্যের পরিচয় দেয়। বিষয়ের পরিবর্তনে ভাষার চালও পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ লেখকের রচনা কখনও সাহিত্যধর্মী, কখনও রচনাধর্মী আবার কখনও বৈঠকী মেজাজের হয়েছে।

'স্টাইল'—ভাষার এই তিন শ্রেণীর পরিচয় উদঘাটন করে। তাঁর রচনার কিছু শব্দ ও কয়েকটি বাক্য বিচার করে বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। নীচে তাঁর কয়েকটি রচনার অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

১। "সমুদ্র প্রায় একখানা সমতল নীলবস্ত্রের মত পড়িয়া রহিয়াছে। জাহাজ জল কাটিয়া দুই একটা মাত্র তরঙ্গ রেখা সৃষ্টি করিতেছে। এই রেখার উপর অসংখ্য প্রতিফলিত চাঁদ কতকগুলো বিদ্যুৎ-প্রদীপের মালার মত দেখা গেল।"

(**কবরের দেশে দিন পনের**, পৃঃ ১১)

২। "ধরা যাউক যেন, আইন অনুসারে পাত্র এবং পাত্রী স্বাধীনতম রূপেই নিজ বিবাহের ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিব যে, বিবাহ বিষয়ক তথাকথিত স্বাধীনতার কিম্মৎ এক-দামড়িও নয়।"

(**পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র**, পৃঃ ৯৮)

৩। "জাহাজের খালাসীরা বেতন বাড়াইবার কথা তুলিয়াছিল। বিলাতী মালিকেরা তাহা অমঞ্জুর করে। তৎক্ষণাৎ খালাসীরা কাজ বন্ধ করে। তাহাদের সঙ্গে হামদর্দ্দি দেখাইবার জন্য হঙ্কঙ শহরের সকল মজুরই কাজে ইস্তফা দেয়। ফলে গোটা শহর হরতালের প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।"

(**দুনিয়ার আবহাওয়া**, পৃঃ ৮৫)

৪। "কিয়োতো শহরটা একটা সুবিস্তৃত বাগানের মত। ঘরগুলি যেন এক এক বিরাট প্রমোদ-কাননের কুঞ্জগৃহ। উর্দ্ধে সূর্য্যতপ্ত নীল আকাশ চারিদিকে উচ্চ-উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর সমতল ভূমির ওপর সবুজ তৃণপত্রের আস্তরণ। উদ্যান তরুর ফাঁকে-ফাঁকে কৃষ্ণাভ-খোলার ছাদগুলি যেন তাহাদের অনুচ্চ মাথা তুলিয়া উঁকি দিতেছে।"

(**নবীন এশিয়ার জন্মদাতা**, পৃঃ ৩০৮)

৫। "স্টীমারে নৌকায় যাতায়াতের আয়োজনও দেখিতেছি। আকাশ মেঘহীন, মাঠগুলা বরফে ঢাকা। তরুহীন, বরফ-ঢাকা, সাদা পাহাড়-চূড়াগুলা হ্রদের দুই কিনারায় খাঁড়া হাতে করিয়া যেন আকাশের সঙ্গে লড়িতেছে।"

(**সুইটসার্ল্যান্ড**, পৃঃ ৩১)

৬। "মার্কিণ, বিলাত, জার্ম্মানি এই তিন দেশে দুনিয়ার মোট বেকার সংখ্যার ৬৩.২ শতাংশ বর্তমান। সুতরাং বেকার সমস্যা গোটা দুনিয়ার সঙ্কট বলা চলে না। উপরোক্ত তিন দেশের পক্ষেই উহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য।"

(বাংলায় ধনবিজ্ঞান, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪০)

৭। "এই সব দেশী-বিদেশী বঙ্গ-প্রভাব আজও নেহাৎ সামান্য। এই সবের কিম্মৎ বড় বেশী নয়। তাহা লইয়া লাফালাফি করিবার কিছু নাই। তথাপি যদি আমাকে কেহ বলে বাঙালী মরিতে বসিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব বিলকুল উল্টা।"

(সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৩৪)

৮। "এক একটা মাল তৈয়ারীর কাজে যতগুলো কারখানা বা বেপারী লাগিয়া আছে— তাহাদের প্রত্যেকের টেক্‌নিক্যাল ক্ষমতা, ফ্যাক্‌টরির চৌহদ্দি, মজুর-সংখ্যা, সবই যদি এক মস্তিষ্ক-সঙ্ঘের শাসনে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে হাঁ মারিবার মসরুম আসিবামাত্র ঘোড়ার লাগামটায় সংযতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঢিল দেওয়া সম্ভব। তখন একদম বে-আক্কেলের মতন দেদার মজা লুটিবার লোভে আহাম্মুকি করিয়া বসা— না ঘটিতেও পারে।"

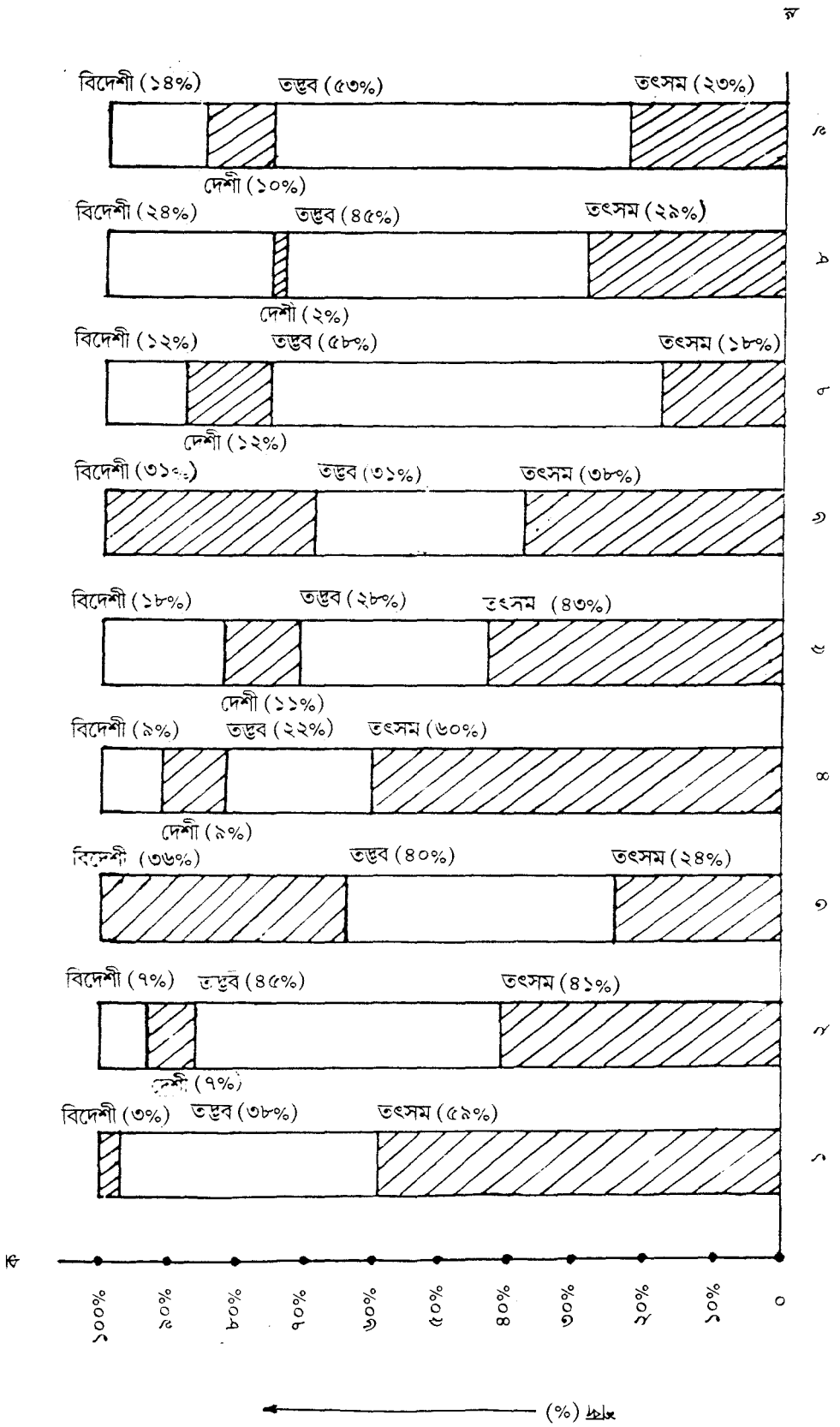
(একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র, পৃঃ ২৯০)

৯। "একজন হামেশা জুতো লাগাচ্ছে আর এক জন হামেশা জুতো খেয়ে যাচ্ছে,—সেই অবস্থাকে আমি টিট্ করা বলি না। পরস্পর পরস্পরকে জুতোচ্ছে—এই হল আমার পরিভাষায় টিট্ করা, কুপোকযা করা।"

(বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৯)

রচনাংশগুলিতে রসাবেদনের পার্থক্য—তীব্র ও স্পষ্ট। রচনাগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির হিসাব বিচার করা যেতে পারে। চার্ট ও গ্রাফের (রেখাচিত্র-৪) সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়

অনুচ্ছেদ	তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ	দেশী শব্দ	বিদেশী শব্দ
১	৫৯%	৩৮%	০%	৩%
২	৪১%	৪৫%	৭%	৭%
৩	২৪%	৪০%	০%	৩৬%
৪	৬০%	২২%	৯%	৯%
৫	৪৩%	২৮%	১১%	১৮%
৬	৩৮%	৩১%	০%	৩১%
৭	১৮%	৫৮%	১২%	১২%
৮	২৯%	৪৫%	২%	২৪%
৯	২৩%	৫৩%	১০%	১৪%


বিদেশী (১৪%)
তদ্ভব (৫৩%)
তৎসম (২৩%)
দেশী (১০%)
বিদেশী (২৪%)
তদ্ভব (৪৫%)
তৎসম (২৯%)
দেশী (২%)
বিদেশী (১২%)
তদ্ভব (৫৮%)
তৎসম (১৮%)
দেশী (১২%)
বিদেশী (৩১%)
তদ্ভব (৩১%)
তৎসম (৩৮%)
বিদেশী (১৮%)
তদ্ভব (২৮%)
তৎসম (৪৩%)
দেশী (১১%)
বিদেশী (৯%)
তদ্ভব (২২%)
তৎসম (৬০%)
দেশী (৯%)
বিদেশী (৩৬%)
তদ্ভব (৪০%)
তৎসম (২৪%)
বিদেশী (৭%)
তদ্ভব (৪৫%)
তৎসম (৪১%)
দেশী (৭%)
বিদেশী (৩%)
তদ্ভব (৩৮%)
তৎসম (৫৯%)
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%
৫০%
৪০%
৩০%
২০%
১০%
০
শতক (%)
রচনাংশ
রেখাচিত্র - ৪

গোত্র অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারে রচনাগুলির পার্থক্য—তৎসম শব্দের ব্যবহারে। দেশী, বিদেশী শব্দের ব্যবহার সব রচনাতেই কম বেশী আছে। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে তৎসম বেশী, কিছু ক্ষেত্রে তদ্ভব বেশী। তৎসম শব্দ ১নং, ৪নং, ৫নং, অংশে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। ১নং, ৪নং, অংশে বিদেশী শব্দ কম ব্যবহৃত হয়েছে—তবে ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়, যেমন ৫নং অংশে। এখানে বিদেশী ১৮% এবং দেশী ১১% শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ২নং, ৩নং, ৬নং, ৭নং, ৮নং, ৯নং অংশে তদ্ভব শব্দ সর্বাপেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিদেশী ও দেশী শব্দ বেশী ববহৃত হওয়াতে ভাষা অন্তরঙ্গ হয়েছে

সিম্পল ওয়ার্ড বা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড গঠনের ক্ষেত্রে—১নং এবং ৪নং অংশে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—'নীলবস্ত্র', 'বিদ্যুৎ-প্রদীপ', 'সুবিস্তৃত', 'প্রমোদ-কাননে', 'সূর্যতপ্ত', 'পর্বত-প্রাচীর', 'কুঞ্জগৃহ', 'তৃণপত্রের', 'কৃষ্ণাভ', 'তরুহীন' ইত্যাদি। আবার বিকল্পে এগুলি রূপক অলংকারও হতে পারে। যেমন—'বিদ্যুৎ-প্রদীপ', 'প্রমোদ-কানন', 'পর্বত-প্রাচীর' ইত্যাদি। কিন্তু ২নং, ৩নং, ৬নং, ৭নং, ৮নং, ৯নং অংশে এইরূপ অলংকার ব্যবহৃত হয়নি।

১ম, ৪র্থ, ৫ম অনুচ্ছেদে লেখক প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় রত হয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এখানে অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে। তাই তিনি সমুদ্রকে দেখেছেন—'নীলবস্ত্রের মত', আবার চাঁদ তাঁর কাছে 'বিদ্যুৎ-প্রদীপের মালার মত' হয়ে উঠেছে। কিয়োতো শহরের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বলেছেন—'সুবিস্তৃত বাগানের মত', ঘরগুলি—'প্রমোদ-কাননের কুঞ্জগৃহ'। বরফ আচ্ছাদিত পাহাড়গুলি তাঁর বর্ণনায় হয়ে উঠেছে—'খাঁড়া হাতে করিয়া যেন আকাশের সঙ্গে লড়িতেছে।' এরূপ অলংকার তাঁর অন্যান্য অনুচ্ছেদে অবর্তমান। যেখানে স্থান পেয়েছে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার abstract বিশ্লেষণ।

Compound Word গঠনের ক্ষেত্রে—১নং, ৪নং, ৫ নং অনুচ্ছেদে, তৎসম শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দ সংযোজনের আধিক্য বেশী। যেমন—১নং অনুচ্ছেদে—'নীলবস্ত্র', 'বিদ্যুৎ-প্রদীপ', ৪নং অনুচ্ছেদে—'প্রমোদ-কাননের', 'কুঞ্জগৃহ', 'সূর্যতপ্ত', 'পর্বত-প্রাচীর', 'সমতলভূমি', 'তৃণপত্র', 'উদ্যান-তরুর', ৫নং, অনুচ্ছেদে—'তরুহীন' ইত্যাদি। আবার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়, যেমন—'বরফ-ঢাকা' (বিদেশী ফারসী শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দের সংযোজন), 'পাহাড়-চূড়াগুলো' (তদ্ভব ও তৎসম) ইত্যাদি। অর্থাৎ, এখানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—বিনয় সরকার যখন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, তখন কম্পাউন্ড ওয়ার্ডগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ সম্পৃক্ত হয়েছে।

কিন্তু অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলির কম্পাউন্ড ওয়ার্ডগুলির নির্মাণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে—সেখানে বিদেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম, দেশী বা তদ্ভব শব্দের সম্পৃক্ত ব্যবহার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। যেমন—২নং অনুচ্ছেদে—'এক-দামড়ি' (তদ্ভব + দেশী), ৬নং অনুচ্ছেদে—'বেকার সমস্যা' (বিদেশী + তৎসম), ৭ নং অনুচ্ছেদে—'দেশী-বিদেশী' (তদ্ভব – তৎসম) ৮নং অনুচ্ছেদে—'মজুর-সংখ্যা' (বিদেশী + তৎসম), 'বে-আক্কেলের' (বিদেশী উপসর্গ + বিদেশী) ইত্যাদি।

২নং, ৩নং, ৬নং, ৭নং, ৮নং অনুচ্ছেদে, এমন কতগুলি শব্দ সাধুরীতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলি চলিত গদ্যে বেশী মানায়। এই সকল শব্দগুলি ১নং, ৪নং, ৫নং, অনুচ্ছেদে বসালে রচনার সৌন্দর্য্য নষ্ট হত অর্থাৎ বিষয় অনুযায়ী লেখকের স্টাইল বদলেছে ২ নং অনুচ্ছেদের শব্দ, যেমন—'কিম্বৎ' (আরবী/কী.মত), 'এক-দামড়ি' (দেশী), ৩নং অনুচ্ছেদে—'হামদর্দ্দি' (আরবী), 'ইস্তফা' (আরবী), ৭নং অনুচ্ছেদে—'বিলকুল' (হিন্দী), ৮নং অনুচ্ছেদে—'মাল'(আরবী), 'বেপারী' (হিন্দী), 'বে-আক্কেল' (আরবী), 'মসরুম' (ফারসী), 'চৌহাদ্দি' (হিন্দী/চৌ + আরবী/হদ্‌সীমা), 'আহাম্মক' (আরবী), 'দেদার' (দেশী) ইত্যাদি। এই সকল বিদেশী—বিশেষতঃ আরবী ও ফারসী শব্দের সঙ্গে দেশী বা তৎসম শব্দের ব্যবহারের একটি ভারসাম্যের বা balance-এর আভাস ফুটে উঠেছে। কিন্তু কল্পনা সৌন্দর্য্যময় রোমান্টিক গদ্য, এর থেকে পৃথক হয়েছে।

৯নং অনুচ্ছেদটি চলিত গদ্যের। 'পরস্পর পরস্পরকে জুতোচ্ছে' শব্দগুচ্ছগুলির মধ্যে "জুতোচ্ছে" শব্দটি নাম ধাতুর। নামধাতুর প্রয়োগে ভাষাকে সাধুরূপ থেকে মুক্তি দেবার একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস থাকে। "পরস্পরকে জুতোচ্ছে"-তে যে ঝাল, 'পরস্পরকে জুতো মারছে'-তে সেই ঝাল নেই। এই সকল নামধাতুর ব্যবহার Conversation mood বা

কথোপকথনের মুহূর্তে বেশী হয়। শব্দের Economy বা পরিমিতিবোধেও গড়ে ওঠে—এই সংহত রূপ। ফলে বিনয় সরকারের এই রচনাংশটির রূপ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিদেশী ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম তদ্ভব শব্দের সংমিশ্রণে ভাষার মধ্যে প্রাঞ্জলতা এসেছে।

শব্দ নির্বাচনের স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে একটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে আর একটি অনুচ্ছেদের রচনাগত আবেদন সৃষ্টিতে—স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। বাক্যের বিন্যাসেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। ৪র্থ এবং ৫ম অনুচ্ছেদে একটি বাক্যে একাধিক ক্ষুদ্র সম্পূর্ণ বাক্যের সমাবেশ আছে—যা পৃথকভাবেও লেখা সম্ভব। যেমন—৪র্থ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে—"ঊর্দ্ধে সূর্যাতপ্ত নীল আকাশ, চারিদিকে উচ্চ-উচ্চ পর্বত-প্রাচীর, সমতলভূমির উপর সবুজ তৃণপত্রের আস্তরণ" ইত্যাদির পরিবর্তে (কিয়োতো শহরের) ঊর্দ্ধে সূর্যাতপ্ত নীল আকাশ, (কিয়োতো শহরের) চারিদিকে উচ্চ-উচ্চ পর্বত প্রাচীর, (কিয়োতো শহরের) সমতলভূমির উপর সবুজ তৃণপত্রের আস্তরণ। ৫ম অনুচ্ছেদেও কমাচিহ্নের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র বাক্য—যেমন "আকাশ মেঘহীন, মাঠগুলা বরফে ঢাকা।"

৪র্থ অনুচ্ছেদটিতে—'কর্তা', 'ক্রিয়া' উহ্য এবং ৫ম অনুচ্ছেদটিতে—'ক্রিয়া' উহ্য—প্যাটার্নে বাক্যগুলি রচিত। একাধিক ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে ভাবের সমৃদ্ধি ঘটেছে। ক্রিয়াহীন বাক্যগুলি তাঁর গদ্যের একটি বিশেষ কীর্তি। অন্যদিকে, ৮নং অনুচ্ছেদটিতে "তাহা হইলে" শব্দগুচ্ছ দ্বারা বাক্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রিয়া উহ্য থেকেছে। ৯নং অনুচ্ছেদটি 'যতি' চিহ্ন দ্বারা বড় বড় সম্পূর্ণ বাক্যগুলি বিস্তৃত হয়েছে। ২নং এবং ৩নং অনুচ্ছেদগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যগুলি সমাপ্ত। ৬নং এবং ৭নং অনুচ্ছেদগুলিতে ক্রিয়া উহ্য। এছাড়া ৩নং, ৬নং, এবং ৭নং অনুচ্ছেদগুলির বাক্যবিন্যাস ঘটেছে সিদ্ধান্তমূলক শব্দ দ্বারা, যেমন—'ফলে', 'তথাপি', 'সুতরাং' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি যুক্তি তর্কের পক্ষে প্রযোজ্য। এগুলি ভাবের বা আবেগের ভাষা নয়।

১নং, ৪নং এবং ৫ নং অনুচ্ছেদে—বিশ্লেষণ অলংকারের প্রয়োগে ভাষা আবেগপ্রবণ হয়েছে। ভাবের সমুন্নতিতে গাম্ভীর্য এসেছে—১নং অনুচ্ছেদে—'অসংখ্য প্রতিফলিত চাঁদ', 'বিদ্যুৎ-প্রদীপের মালার মত', ৪নং অনুচ্ছেদে—"প্রমোদ-কাননের কুঞ্জগৃহ", 'পর্বত-প্রাচীর', 'কৃষ্ণাভ-খোলার ছাদ' এবং ৫নং অনুচ্ছেদে—'খাঁড়া হাতে করিয়া যেন আকাশের সঙ্গে লড়িতেছে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ নির্বাচন করায়। অন্যদিকে ৩নং অনুচ্ছেদে—'অমুঞ্জর', 'কাজে ইস্তফা', 'হরতালের প্রভাবে' এবং ৬ নং অনুচ্ছেদে—'বেকার সমস্যা', 'দুনিয়ার সঙ্কট' ইত্যাদি শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে লেখকের সমাজ-চিন্তা প্রকাশ পায়। ২নং অনুচ্ছেদে—'স্বাধীনতার কিম্বৎ এক-দামড়িও নয়', ৭নং অনুচ্ছেদে—'লাফালাফি করিবার', 'বিলকুল উল্টা', ৯নং অনুচ্ছেদে—'হামেশা জুতো লাগাচ্ছে', 'জুতো খেয়ে যাচ্ছে', 'পরস্পরকে জুতোচ্ছে' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে লঘুভাব প্রকাশিত হয়েছে। তবে ২নং এবং ৯নং অনুচ্ছেদে—স্যাটায়ারের জ্বালাধরা উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য ৮নং অনুচ্ছেদটির ক্ষেত্রেও। এখানে 'মস্তিষ্ক-সঙ্ঘ', 'দাঁ মারিবার মসরুম,' 'যুক্তিসঙ্গতভাবে ঢিল', 'বে-আক্কেলের মতন', 'দেদার মজা' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের ব্যবহারেও লঘুভাব প্রকাশিত হয়েছে।

স্টাইলের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে ১নং, ৪নং, ৫নং, অনুচ্ছেদগুলিকে—সাহিত্যধর্মী, ৩নং এবং ৬নং অনুচ্ছেদগুলিকে—রচনাধর্মী এবং ২নং, ৭নং, ৮নং, ৯নং অনুচ্ছেদগুলিকে—বৈঠকী মেজাজের বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সবরকম রচনারীতিতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর এই বিশালতা ও অভিনবত্ব মনে করিয়ে দেয় **Joubert** এর স্মরণীয় উক্তিটি— **"In literature, today, there are plenty of good masons but few good architects."** [৪]

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

1. Tryon Edwards, The New Dictionary of Thoughts, 1966, p-365.

2. Ibid, p-365.

3. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য ঃ 'সাহিত্যের পথে'।

4. Tryon Edwards, The New Dictionary of Thoughts, 1966, p-365.

— ঃ —

—ঃ সপ্তম অধ্যায় ঃ—

বিনয় সরকারী ভাষায় Cumulative Sum Charts Method-এর ব্যবহার



* * * * *

বিনয় সরকারী ভাষায় Cumulative Sum Charts method - এর ব্যবহার

ছদ্মনামে অথবা নাম গোপন করে সাহিত্য রচনা অনেক লেখকেরই অভ্যাস। এমনকি, পৃথিবীতে এমন অনেক পুরাতন সাহিত্য আছে, যার লেখকের নাম আজও জানা যায় নি। এইসব সাহিত্য রচনার বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আসল সাহিত্যিকের নাম উদ্‌ঘাটন— বা কোন্ সাহিত্যিকের রচনা অনুকরণ, তার মিল খুঁজে বার করার গবেষণা আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপৃত।

Rev. A. Q. Morton এ সম্বন্ধে এক যুগান্তকারী পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন— যার আসল আবিষ্কারক ছিলেন বৃটিশ নাইলন বিশেষজ্ঞ Dr. W. C. Wake মর্টন মনে করেন, কিছু অঙ্ক এবং কিছু রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই অজ্ঞাত বা অপরিচিত লেখকের আসল পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিদ্যাপতির কয়টি পদ সত্যিই বিদ্যাপতির রচিত অথবা 'তত্ত্ববোধিনী'র বেনামী রচনাগুলির লেখক রত্নারায়ণ বসু, না অক্ষয়কুমার দত্ত, না দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা কেরীর 'কথোপকথনের' কয়টি রচনা কেরীর নিজের—এ সমস্ত তত্ত্ব এবং সমস্যার পূর্ণ সমাধান মর্টন বর্ণিত তথ্যের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব। এই বিচার পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে ভাষাতত্ত্বের 'Stylistics'-এর অন্তর্ভুক্ত।

সংখ্যাতাত্ত্বিক কতগুলি চার্টের সাহায্যে মর্টন যে বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা বলেছেন— তাকে 'Cumulative sum charts method' বলা হয়। রীতি অনুসারে এ পদ্ধতিটির সুবিধা হল, রচনাগত কোন ব্যতিক্রম হলেই নজরে পড়বে। অর্থাৎ ধরা যাক, রামমোহনের নিজের নামে অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে রামমোহন রচিত গ্রন্থগুলি যদি 'Cumulative sum charts method'-এর সাহায্যে বিচার করা যায়, তবে ভাষাগত পার্থক্য আদৌ থাকলে তা অবশ্যই ধরা পড়বে। এই পার্থক্যই রামমোহনের রচনার আসল পরিচয় দিতে পারবে। বাক্যের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি খুব জটিল নয় এবং পদ্ধতিটি নিম্নরূপ ঃ—

(১) যে রচনা নিয়ে সংশয় তার প্রতিটি বাক্যের শব্দসংখ্যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বই-এর বা রচনার বাঁদিক থেকে ডান দিকে (বাঁ → ডান) গুণতে হবে।

(২) সমগ্র রচনার বাক্যসংখ্যা এবং শব্দসংখ্যা হিসাব করলে— রচনাটির গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। যদি রচনার সমগ্র বাক্যসংখ্যা = X হয় এবং সমগ্র শব্দসংখ্যা = Y হয় তাহলে,

$$\text{রচনার গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা} = \frac{\text{রচনার সমগ্র শব্দসংখ্যা}}{\text{রচনার সমগ্র বাক্যসংখ্যা}} = \frac{Y}{X}$$

(৩) অতঃপর, বাক্যপ্রতি প্রকৃত শব্দসংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার এবং তার সঙ্গে গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যার হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ, গড়পড়তা শব্দসংখ্যা যত হবে—বাক্যগুলির শব্দসংখ্যাও তত করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যোগ এবং বিয়োগ পদ্ধতির আবশ্যক।

(৪) হিসাবের এই অঙ্কটি যে রেখাচিত্রে (Graph) প্রকাশিত হবে— তার দুটি সরলরেখা থাকবে। একটি Horizontal, অন্যটি Vertical. Horizontal রেখায় রচনার বাক্যসংখ্যা থাকবে এবং Vertical রেখায় স্বতন্ত্র বাক্যের শব্দ সংখ্যা থাকবে। গড়পড়তা বাক্যের শব্দসংখ্যার সঙ্গে স্বতন্ত্র বাক্যের প্রকৃত শব্দসংখ্যা পার্থক্যজনিত হিসাব— এই রেখাচিত্রটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা সম্ভব।

এর ফলে যখন কোন লেখক গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্য আরও বিস্তৃততর করেন, তবে তাও রেখাচিত্রে ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক রেখা Horizontal রেখার উপরে ডানদিকে বাঁক নেবে। আবার বাক্যের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর হলে, বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক রেখা Horizontal রেখার নীচে বাঁক নেবে। বাক্য যদি গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্যানুযায়ী থাকে— তবে বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক রেখা Horizontal রেখার সমান্তরাল রেখায় অঙ্কিত হবে।

উল্লিখিত পদ্ধতিটি বিনয় সরকারের "আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র" গ্রন্থের উপর প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে— রচনার সমগ্র বাক্যসংখ্যা = ৪০৩ এবং সমগ্র শব্দসংখ্যা = ৫৭৩২।

$$\text{এক্ষেত্রে, গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা} = \frac{\text{রচনার সমগ্র শব্দসংখ্যা}}{\text{রচনার সমগ্র বাক্যসংখ্যা}} = \frac{৫৭৩২}{৪০৩} = ১৪.২২$$

বাক্যপ্রতি প্রকৃত শব্দসংখ্যা নির্ধারণ পর্বে গ্রন্থটির পৃষ্ঠা নং ৪ এবং ৫-কে নির্দিষ্ট করা যাক। এক্ষেত্রে, এই দুই পৃষ্ঠায় মোট বাক্যসংখ্যা = ১৮ এবং বাক্য প্রতি শব্দসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

১	নং	বাক্যে শব্দসংখ্যা	=	১৪
২	নং	” ” ”	=	১১
৩	নং	” ” ”	=	৫
৪	নং	” ” ”	=	৪০
৫	নং	” ” ”	=	২০
৬	নং	” ” ”	=	১৩
৭	নং	” ” ”	=	১৬
৮	নং	” ” ”	=	৫২
৯	নং	” ” ”	=	১৯
১০	নং	” ” ”	=	৮
১১	নং	” ” ”	=	২১
১২	নং	” ” ”	=	৪
১৩	নং	” ” ”	=	৪৪
১৪	নং	” ” ”	=	১০
১৫	নং	” ” ”	=	১১
১৬	নং	” ” ”	=	৩৪
১৭	নং	” ” ”	=	৩৩
১৮	নং	” ” ”	=	১৪

বাক্যপ্রতি প্রকৃত শব্দসংখ্যার সঙ্গে গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যার হিসাব করলে দেখা যায়, প্রথম বাক্যের দৈর্ঘ্য— গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্যের সমান। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের দৈর্ঘ্য— গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্যের থেকে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যের প্রকৃত শব্দসংখ্যা— গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যার থেকে কম। আবার চতুর্থ বাক্যের দৈর্ঘ্য— গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্যের থেকে দীর্ঘতর। এইরূপ প্রতিটি বাক্যের প্রকৃত দৈর্ঘ্য বা শব্দসংখ্যার সঙ্গে গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য বা গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যার হিসাব দেখানো যেতে পারে ঃ—

(বাক্য	- - -	গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা	-	বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা)			
প্রথম বাক্য	- - -	১৪	-	১৪	=		০
দ্বিতীয় বাক্য	- - -	১৪	-	১১	=	+	৩
তৃতীয় বাক্য	- - -	১৪	-	৫	=	+	৯
চতুর্থ বাক্য	- - -	১৪	-	৪০	=	-	২৬
পঞ্চম বাক্য	- - -	১৪	-	২০	=	-	৬
ষষ্ঠ বাক্য	- - -	১৪	-	১৩	=	+	১
সপ্তম বাক্য	- - -	১৪	-	১৬	=	-	২
অষ্টম বাক্য	- - -	১৪	-	৫২	=	-	৩৮
নবম বাক্য	- - -	১৪	-	১৯	=	-	৫
দশম বাক্য	- - -	১৪	-	৮	=	+	৬
একাদশ বাক্য	- - -	১৪	-	২১	=	-	৭
দ্বাদশ বাক্য	- - -	১৪	-	৪	=	+	১০
ত্রয়োদশ বাক্য	- - -	১৪	-	৪৪	=	-	৩০
চতুর্দশ বাক্য	- - -	১৪	-	১০	=	+	৪
পঞ্চদশ বাক্য	- - -	১৪	-	১১	=	+	৩
ষোড়শ বাক্য	- - -	১৪	-	৩৪	=	-	২০
সপ্তদশ বাক্য	- - -	১৪	-	৩৩	=	-	১৯
অষ্টাদশ বাক্য	- - -	১৪	-	১৪	=		০

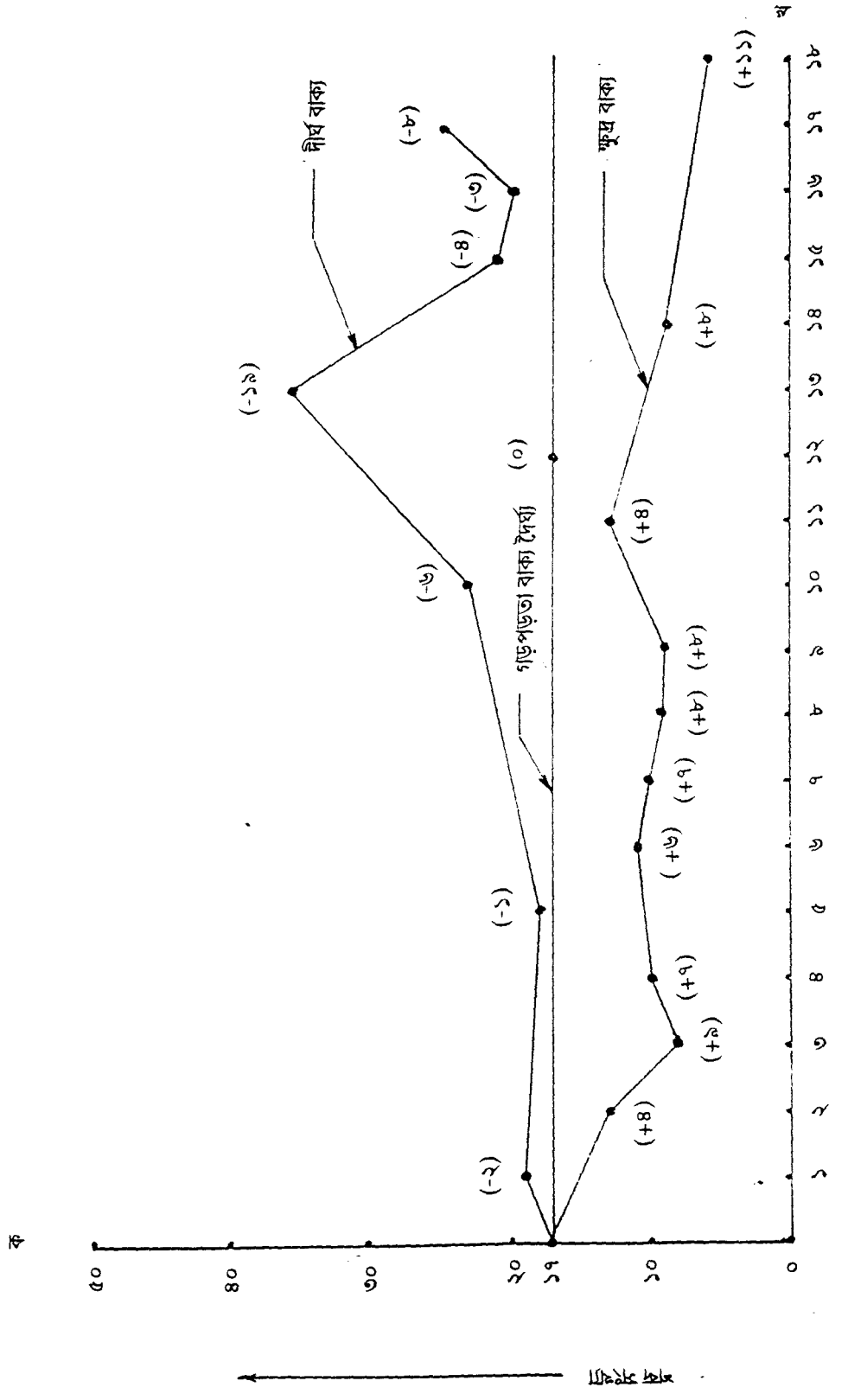
রেখাচিত্র ৫-এ, এই নির্নীত সংখ্যাগুলি অনুভূমিক এবং উল্লম্ব রেখায় উপস্থাপন করলে দেখা যায় যে প্রথম ও ১৮ নং বাক্যের দৈর্ঘ্য— গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্যের সমান। কিন্তু ২ নং, ৩নং, ৬নং, ১০ নং, ১২ নং, ১৪ নং এবং ১৫নং বাক্যের দৈর্ঘ্য— গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্যের থেকে ক্ষুদ্রতর। ৪নং, ৭নং, ৮ নং, ৯নং, ১১নং, ১৩নং, ১৬নং ১৭নং বাক্যের দৈর্ঘ্য— গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্যের থেকে দীর্ঘতর। দীর্ঘতর বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক রেখা— Horizontal রেখার ওপরে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। এবং ক্ষুদ্রতর বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক রেখা— Horizontal রেখার নীচে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু গড়পড়তা বাক্যের দৈর্ঘ্যানুযায়ী বাক্যে— দৈর্ঘ্যসূচক রেখা, Horizontal রেখার সমান্তরাল রয়েছে। এইরূপে বিনয় সরকারের একাধিক গ্রন্থের ওপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তার ফলাফল পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকা থেকে পাওয়া যায়।

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা	পৃষ্ঠা নং	বাক্য সংখ্যা	দীর্ঘ বাক্য সংখ্যা	দীর্ঘ বাক্য (শতকরা)	ক্ষুদ্র বাক্য সংখ্যা	ক্ষুদ্র বাক্য (শতকরা)	গড়পড়তা বাক্যসংখ্যা	গড়পড়তা বাক্য (শতকরা)	রেখাচিত্র নং
১	আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র	১৪	৪ এবং ৫	১৮	৪	৫০%	৭	৩৯%	২	১১%	৫
২	একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র	১৭	৯১, ৯২, ৯৩	১৮	৭	৩৯%	১০	৫৬%	১	৫%	৬
৩	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৪	৫৪, ৫৫	১৮	৮	৪৪%	১০	৫৬%	-	-	৭
৪	ভাষাশিক্ষা	২০	১০৩,১০৪, ১০৫	১৬	৯	৫৬%	৭	৪৪%	-	-	৮
৫	সমাজবিজ্ঞান	১৪	৯৭, ৯৮	১৭	৭	৪১%	১০	৫৯%	-	-	৯
৬	হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন	১৫	১৪০,১৪১	১৭	৫	২৯%	১২	৭১%	-	-	১০
৭	স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি	১২	১৫২,১৫৩	১৬	৭	৪৪%	৮	৫০%	১	৬%	১১
৮	জর্জ ওয়াশিংটন হুইটম্যান ও মার্কিণ নরনারীর ধাত	১১	১০	১৮	৫	২৮%	১২	৬৭%	১	৫%	১২
৯	ঐতিহাসিক প্রবন্ধ	১৮	৮১, ৮২ ৮৩, ৮৪	১৬	৯	৫৬%	৭	৪৪%	-	-	১৩
১০	কবরের দেশে দিন পনের	১২	৯৭, ৯৮	১৮	৪	২২%	১২	৬৭%	২	১১%	১৪
১১	সুইটসার্ল্যান্ড	১১	১৩, ১৪	১৮	৫	২৮%	১১	৬১%	২	১১%	১৫
১২	দুনিয়ার আবহাওয়া	১৩	১৩২, ১৩৩	১৮	৭	৩৯%	৯	৫০%	২	১১%	১৬

[কেবল শিক্ষা কেন্দ্রের ..... লোপাটায় মিলে না।]

আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র (পৃষ্ঠা ১- ৪ এবং ৫)

রেখাচিত্র - ৫



[বালক মজুমের সংখ্যা ..... কিছুই ঘটিতেছে না]

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র (পৃষ্ঠা ৯১, ৯২ এবং ৯৩)

রেখাচিত্র - ৬

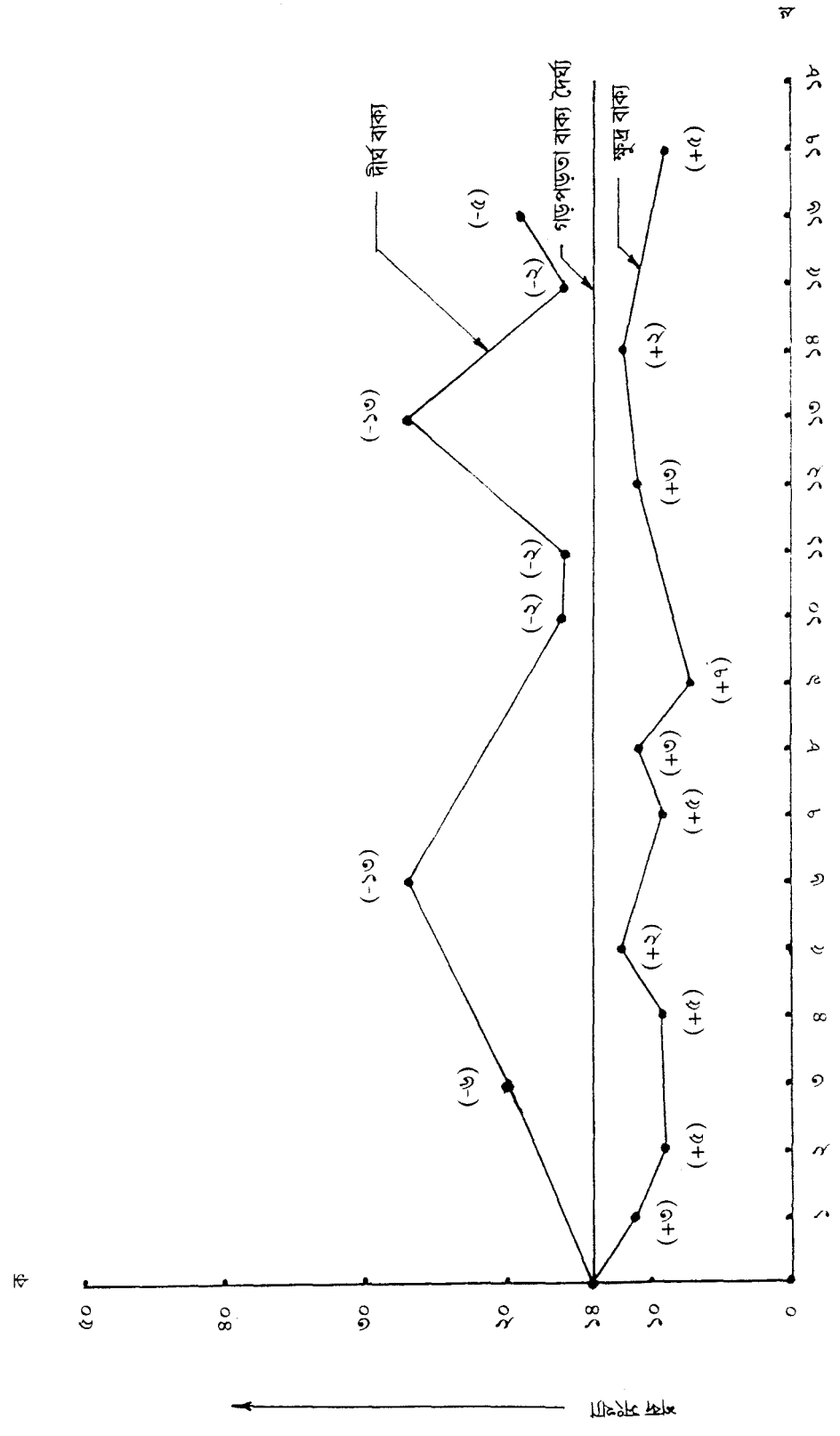
[খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ..... অবস্থায় রহিয়াছে।]

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (পৃষ্ঠা ৫৪ এবং ৫৫) রেখাচিত্র - ৭

[বাক্য রচনাকেই ভাষা শিক্ষার ..... আয়ত্ত করিতে হইবে।]

ভাষা শিক্ষা (পৃষ্ঠা :- ১০৩, ১০৪ এবং ১০৫)

রেখাচিত্র - ৮



[শঙ্করী লোকজনের ..... দেখানো ঠিক নয়]

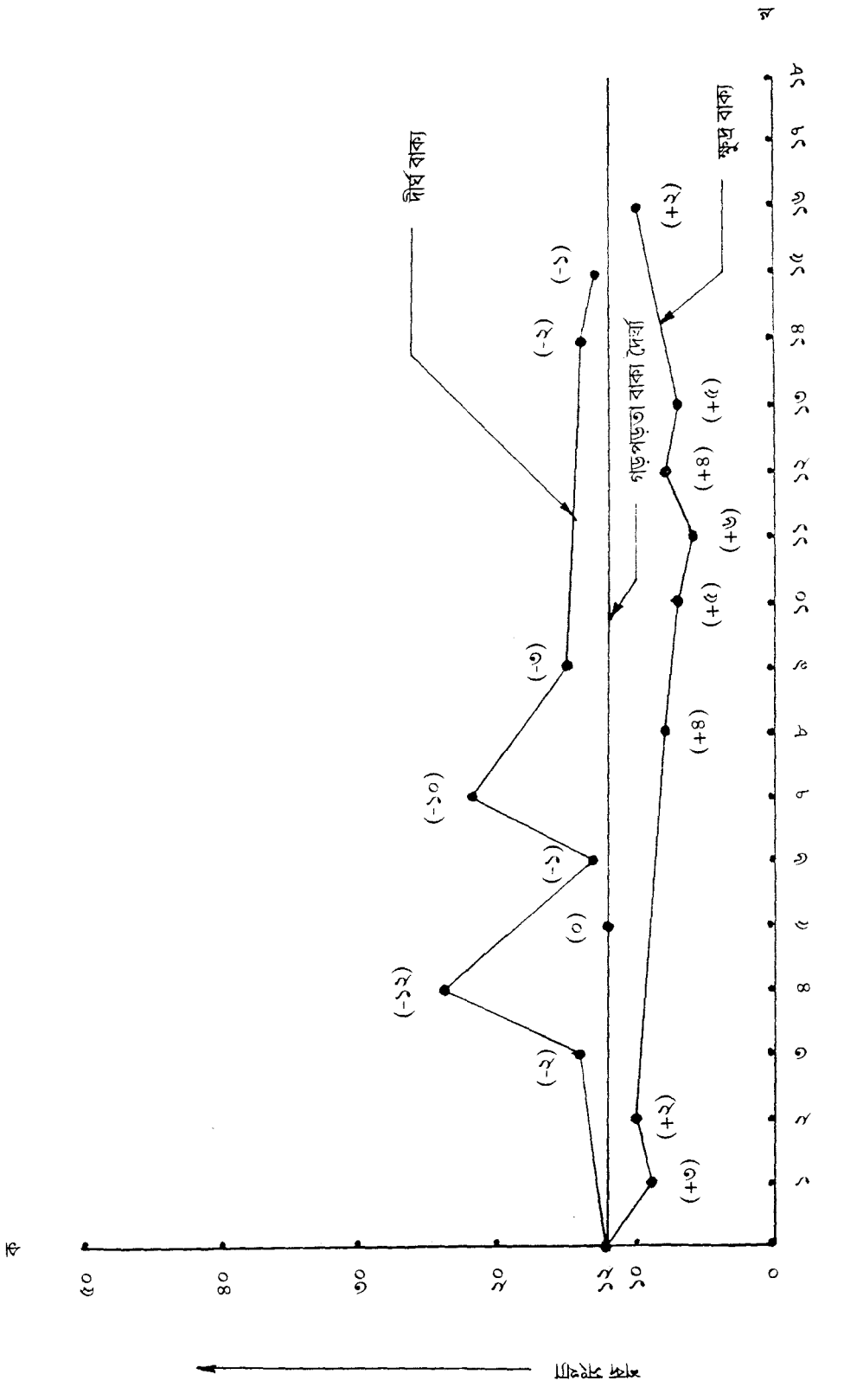
সমাজবিজ্ঞান (পৃষ্ঠা - ৯৭ এবং ৯৮)

রেখাচিত্র - ৯

বাক্য সংখ্যা ——————→

[জাম্মাণি ধনবিজ্ঞান বিৎ..... পাওয়া যায়।]

[চিত্র: রাষ্ট্রের গড়ন (পৃষ্ঠা :- ১৪০ এবং ১৪১) রেখাচিত্র - ১০

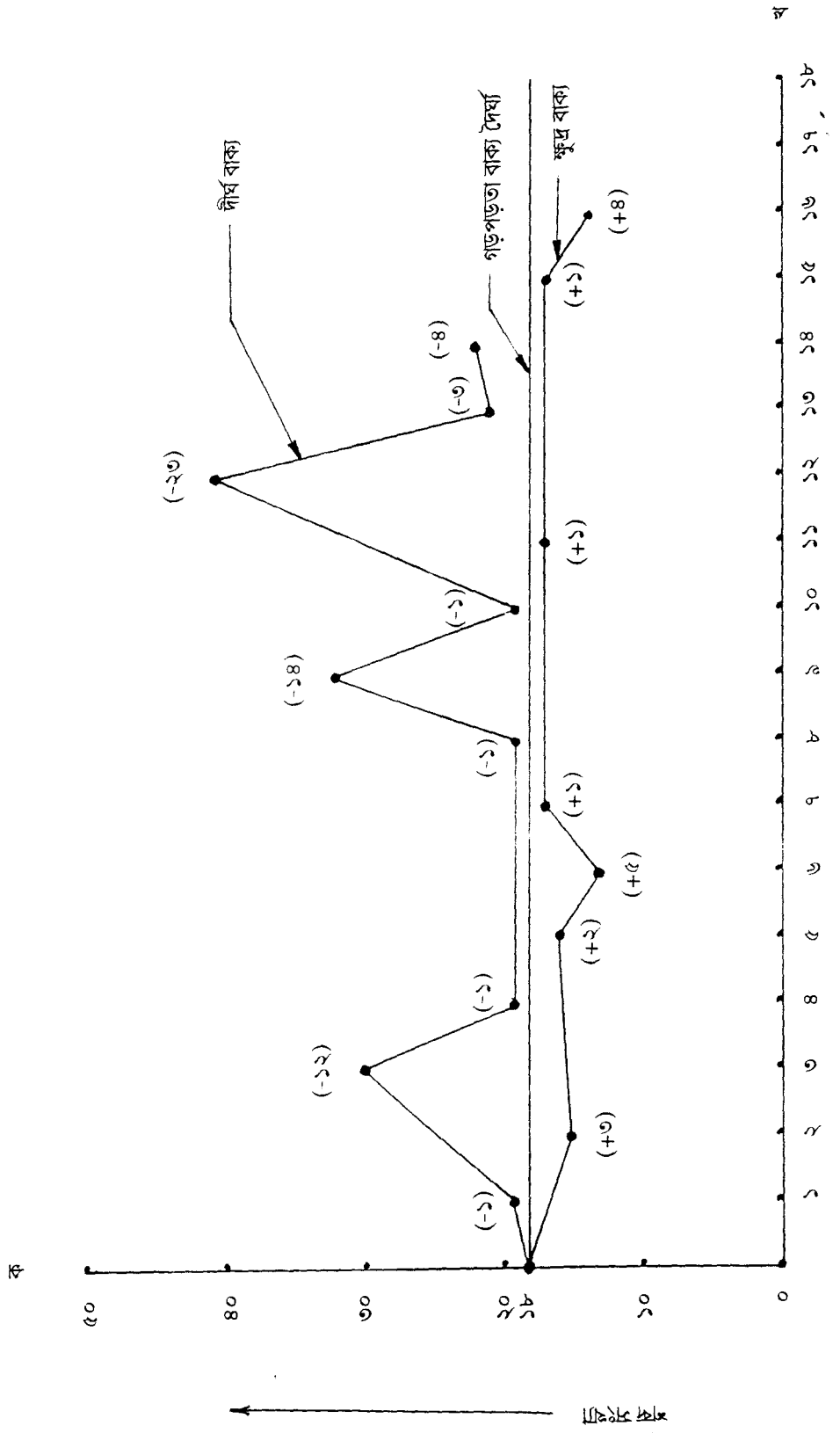


[তাহার পর নোপোলিয়ানী ..... ভোগ করিলেন]]

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি (পৃষ্ঠা ঃ ১৫২ এবং ১৫৩) রেখাচিত্র - ১১

ক
খ
০
১১০
২০
৩০
৪০
৫০
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
গড়পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্য
দীর্ঘ বাক্য
ক্ষুদ্র বাক্য
(-৩)
(-২)
(-১)
(-৫)
(-৭)
(০)
(+১)
(+৪)
(+৭)
(+৩)
(+২)
(+৩)
(+৫)
(+৪)
(+৫)
(+২)
(+৪)
বাক্য সংখ্যা
[মার্কিণ নরনারী ..... দাঁড়াইয়া আছে।]
জর্জ ওয়াশিংটন,হুইটম্যান ও মার্কিণ নরনারীর ধাত (পৃষ্ঠা:- ১০)

রেখাচিত্র - ১২

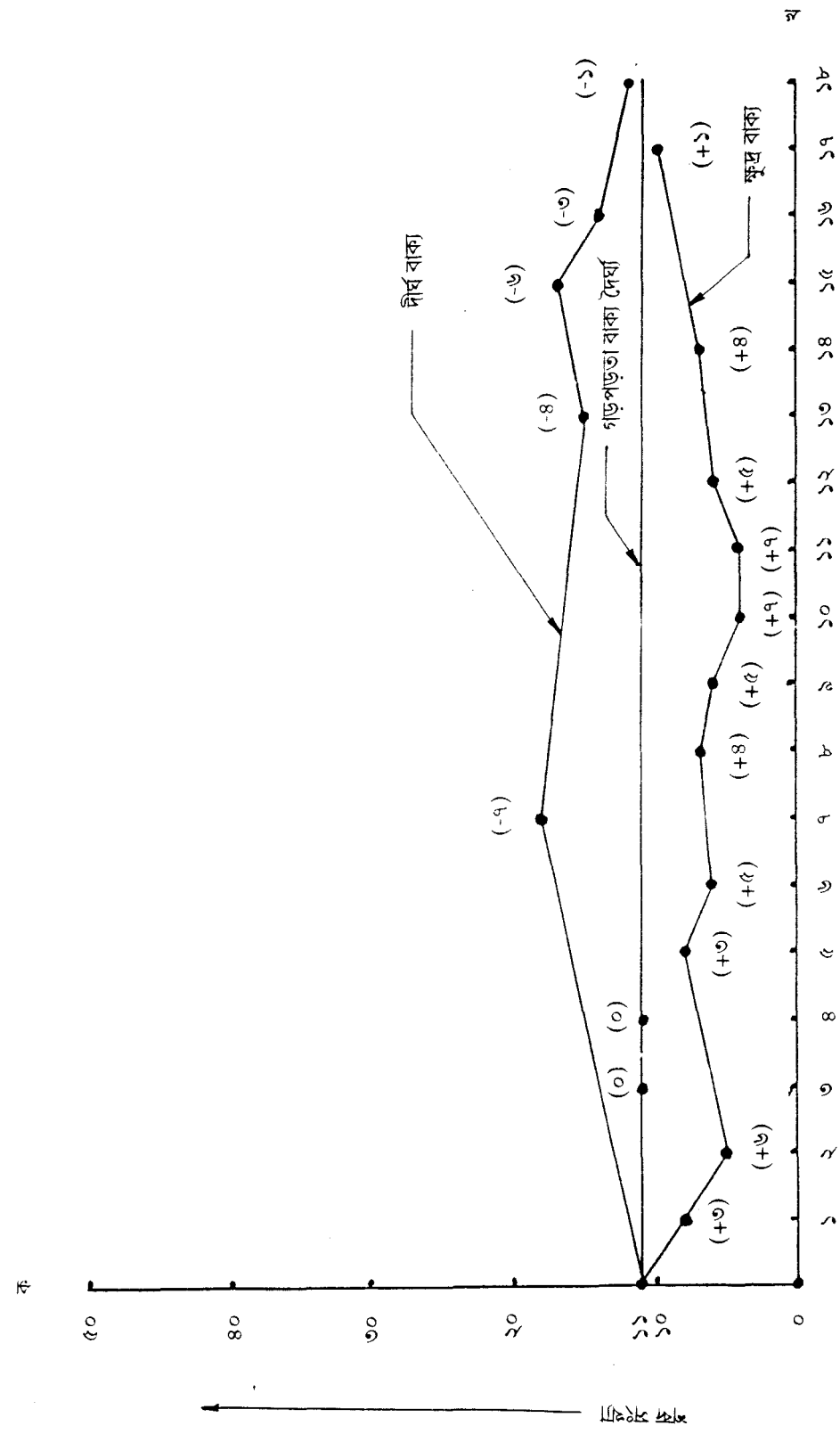


[প্রাচীন ভারতে ..... সূত্রপাত করিল ।]

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ঃ ৮১, ৮২, ৮৩ এবং ৮৪) রেখাচিত্র - ১৬

দীর্ঘ বাক্য
গড়পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্য
ক্ষুদ্র বাক্য
বাক্য সংখ্যা
[কাইরো হইতে লুক্সর যাত্রা ..... পিরামিড অবস্থিত]
কবরের দেশে দিন পনেরো (পৃষ্ঠা :- ৯৭ এবং ৯৮)

রেখাচিত্র - ১৪


দীর্ঘ বাক্য
গড়পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্য
ক্ষুদ্র বাক্য
বাক্য সংখ্যা
[বর্ণ শহর ..... সুইস জাতির প্রতিনিধি বিশেষ]

রেখাচিত্র - ১৫

[জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা ..... করিয়া থাকে]

দুনিয়ার আবহাওয়া (পৃষ্ঠা ঃ ১৩২ এবং ১৩৩)

রেখাচিত্র - ১৬

উপর্যুক্ত তালিকা এবং রেখাচিত্রগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে— বিনয় সরকারের লেখার প্রবণতা দীর্ঘবাক্যের তুলনায় ক্ষুদ্রবাক্যের দিকে। তবে মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘবাক্যও ব্যবহার করেছেন। গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য ২০-র মধ্যে ওঠানামা করেছে। চার, পাঁচ শব্দশিষ্ট বাক্যের পরই কখনও সুদীর্ঘ বাক্যও ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করা যায়— 'প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা' গ্রন্থের ৫৪ এবং ৫৫ নং পৃঃ, ১৫ নং বাক্যটি ৫টি শব্দবিশিষ্ট কিন্তু পরবর্তী ১৬নং বাক্যটি ৫০টি শব্দবিশিষ্ঠ। আবার, 'ভাষা শিক্ষার' ১০৪ এবং ১০৫ নং পৃঃ, যেখানে ১৩, ১৪; ১৫, ১৬ নং বাক্য সম্মিলিত অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ দীর্ঘবাক্য দ্বারা রচিত। একই ভাবে, 'হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন' গ্রন্থের ১৯১নং পৃষ্ঠায়— ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ নং বাক্য সম্মিলিত অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রবাক্যের দ্বারা গঠিত। যদিও তিনি সাধারণভাবে ক্ষুদ্রবাক্য ব্যবহারে বেশী আগ্রহী— তথাপি উপমা সহযোগে বিশ্লেষণ কালে অনেক সময়ই দীর্ঘবাক্যের সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

মর্টন কথিত 'Cumulative sum charts methods'- এর সাহায্যে বিনয় সরকারের সমগ্র রচনার একটি রূপ প্রতিফলিত হয়। তাঁর রচনার অনুচ্ছেদগুলির সমস্ত বাক্য একই মাপের হয়নি। কোনটি দীর্ঘবাক্য, কোনটি মাঝারি বা ছোট বাক্য হয়েছে। তবে 'ভাষাশিক্ষা', 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' গ্রন্থগুলি ছাড়া বেশীর ভাগ গ্রন্থগুলির বাক্য ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের হয়েছে। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা প্রকাশ পেয়েছে।

— ঃ —

—ঃ অষ্টম অধ্যায় ঃ—

বিশেষণ ব্যবহারে দক্ষতা



* * * * *

বিশেষণ ব্যবহারে দক্ষতা

বাক্যের গঠনে বিশেষণের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখকের মানসদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। বিশেষণ অর্থালঙ্কারের প্রয়োজনকে যেমন মেটায় আবার চিত্ররূপেরও কাজ করে। তবে কবিতার ক্ষেত্রে অর্থালঙ্কারের ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও—গদ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। গদ্যে অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত। কিন্তু অর্থালঙ্কার বর্জন করা সম্ভব নয়। স্পষ্টতা সৃষ্টির জন্য অর্থালঙ্কারের দরকার হয়। মনের ভাবকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য চিত্ররূপের সহায়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিশেষণ দু'ধরণের হয়—

(১) অ (অমূর্ত বিশেষণ/Pattern Abstract) অথবা A

(২) ম বিশেষণ অথবা (C) মূর্ত বিশেষণ /Pattern Concrete বা C

(৩) অ + অ [A + A] বিণ্ = অ/V [অস্পষ্টতা /Vague]

(৪) ম + ম [C+C] বিণ্ = ম/C [স্পষ্ট (effective)]

(৫) এই দুই প্রকারের বিশেষণের মিশ্রণের ফল A+C=AC এবং C+A = CA হয়। যেমন জীর্ণ + শরীর (A+C)=AC

(৬) বিশেষণ যে শব্দের বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করবে সেই শব্দের অব্যবহিত পূর্বে থাকবে।

(৭) বিশেষ্য এবং ক্রিয়া শব্দের পূর্বে বিশেষণ বসলে emotional এবং পরে বসলে Rational হয়।

ঔপন্যাসিকের এবং প্রাবন্ধিকের কাছে বিশেষণের গুরুত্ব সমধিক। বঙ্কিমের গদ্য সাহিত্যের প্রথম ভাগে বিশেষণের আধিক্য এবং শেষভাগে বিশেষণের স্বল্পতা দেখা যায়। নায়িকার রূপ বর্ণনায় বিশেষণের অতিরেকের কথা প্রায়শই শোনা যায়। বিশেষণ নিয়ে রামমোহনও চিন্তা করেছেন, **"যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ করে, রাম যাইতেছেন, আর রাম সুন্দর ইত্যাদি স্থলে যাইতেছেন ও সুন্দর এই দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থতে অনুগত হয় এ কারণে বিশেষণ পদ করে।"**[১] যুক্তিবাদী রামমোহনের রচনাতেও বিশেষণ ব্যবহার লক্ষিত হয়।

বিশেষণ ব্যবহারে সফলতা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। দুই প্রকারের বিশেষণ অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত বিশেষণের মিশ্রণ ঘটেছে—এঁদের রচনায়। বিশেষণবাচক শব্দ ব্যবহারে ভাষায় একটি ধ্বনন সৃষ্টি হয়েছে—বিদ্যাসাগরীয় রচনায়। যেমন—'চমৎকারিণী', 'চিন্তহারিণী' ইত্যাদি।

তবে শরৎচন্দ্র বিশেষণ প্রয়োগে খুব মনোযোগী ছিলেন না। একটি বিশেষণ যেখানে বিশেষ্যের রূপ প্রকাশে অব্যর্থ, তিনি সেখানে একাধিক বিশেষণ ব্যবহার করেন। তাঁর বিশেষণগুলির মধ্যে কয়েকটি একার্থক এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরুদ্ধ। যেখানে, এই ত্রুটি নেই সেখানে ভাষা স্বচ্ছন্দ, বেগবান ও মাধুর্যপূর্ণ।

বিনয় সরকারের রচনায়—বিশেষণের গঠন ও আবেদন মননধর্মী। শব্দ সজ্জায়, বিশেষণের নির্বাচনে শিল্পী অপূর্ব ও সার্থক। কংক্রিট + এ্যাবস্ট্র্যাক্ট এবং এ্যাবস্ট্র্যাক্ট + কংক্রিট উভয় রীতির গঠন পদ্ধতি লক্ষিত হয়েছে। যেমন—'ঘর এক প্রকার দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ বিশেষ'। (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ৬৩)

এখানে 'দুর্ভেদ্য', 'দুর্লঙ্ঘ্য', 'দুর্গবিশেষ' শব্দগুলি বিশেষণ। মূর্ত এবং অমূর্ত দুই প্রকার বিশেষণের সমন্বয় এখানে বিদ্যমান।

A+A+C = মারাত্মক + আমোদজনক + খেলা (সুইটসার্ল্যান্ড , পৃঃ ৪০)

A+C+A+C+A+C+A+C = হ্রস্ব + ওষ্ঠপ্রান্ত + প্রশস্ত + ললাট, (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ২১৫)

উজ্জ্বল + চক্ষু + সঙ্কীর্ণ চিবুক (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ৭৮)

A+A+C = হাল্কা + ফাঁপা + জীবন (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ২১৯)

A+C+A+C = সামান্য + দরিদ্র + নগণ্য + শিশু (জর্জ ওয়াশিংটন, হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত, পৃঃ ৫)

A+C = পাকা + লাঠিয়াল (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ২১৬)

A+C = বাঘা + শীত (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ১৯)

A+C = পাকা+লোক (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৬৪)

A+C = পাকা+বন্ধু (দুনিয়া আবহাওয়া, পৃঃ ৫১)

A+C+C = নগন্য + খেলো + কারবার (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ৫১)

C+C+A+C = নয়া + নয়া + তাজা + লেখক (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ১১১)

আবার, শুধু কংক্রিট রীতির গঠন পদ্ধতিও তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়। এখানে C প্যাটার্নের রচনা 'e' অর্থাৎ effect সৃষ্টি করে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠবে।

C+C++C = যন্ত্রনিষ্ঠ + ব্যাঙ্কনিষ্ঠ + শিল্পনিষ্ঠ (যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র, পৃঃ ৭)

C+C, C+C, C+C = তোফা + বাড়ী, তোফা + ঘর, সুন্দর + হোটেল (আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র, পৃঃ ১৫)

C+C = খাঁটি + সত্য (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৯০)

C+C = সাহসী + যোদ্ধা (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ১১৬,)

C+C+C+C=নব্য + শিক্ষিত + চীনা + পন্ডিত (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, পৃঃ ১৪৭)

C+C = চকচকে + টেবিল (নিগ্রোজাতির কর্মবীর, পৃঃ ১৭৫)

C+C+C+C = ময়লা + পোষাক + কাল + রঙ (নিগ্রোজাতির কর্মবীর, পৃঃ ৫১)

C+C= ভাল + কাগজে (প্যারিসে দশমাস, ২৯ পৃঃ)

C+C+C= আদিম + অসভ্য + বর্ব্বর (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ২১)

C+C = হাভাতে + হাঘরে (হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ২১)

শুধু Abstract রীতির গঠন পদ্ধতি তাঁর রচনায় খুব একটা দেখা যায় না। দু-একটি রচনায় কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। A+A= বিস্তৃত + গভীর (হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ৫৮)

লেখার জগৎ থেকে বিশেষণকে বর্জন করলে ভাষার যে প্রধান কাজ Communication সৃষ্টি করা—তা ব্যাহত হয়। কারণ বিশেষণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে—তাকে সাহিত্যের আসর থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। ছোট, বড়, কাল, মোটা, রোগা, পাতলা ইত্যাদি বিশেষণ সর্বত্র ব্যবহৃত। বিনয় সরকারী গদ্যেও এই ধরণের বিশেষণের প্রয়োগ আছে। যেমন—'ভাল কাপড়, তোফা বাড়ী', (যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র), 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা' (ধনদৌলতের রূপান্তর), 'ছোট, বড়, মাঝারি দেশের' (জর্জ্জ ওয়াশিংটন, হুইটম্যান ও মার্কিন নরনারীর ধাত), 'হাল্কা পদাতিক, ভারী পদাতিক' (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র), 'বড়-বড়, কাল রং' (নিগ্রোজাতির কর্মবীর), 'অতি, সরল, সহজ' (স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি) ইত্যাদি ধরণের বিশেষণের পরিচয় তাঁর রচনায় সর্বত্র মেলে।

অতএব, ভাষার গতি সৃষ্টিতে এবং ভাবকে স্পষ্ট করার জন্য বিশেষণের ব্যবহার অপরিহার্য তবে অসতর্ক ব্যবহারে বিশেষণ ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট করে।

বিনয় সরকারের রচনায় বিশেষণ—অনেকক্ষেত্রে মালার মত ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ একটি বিশেষ্য বা ক্রিয়ার পূর্বে অনেকগুলি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

"জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব, কষ্ট সংসারীদের ভোগ করিতে হয়।" (শিক্ষা সমালোচনা, পৃঃ ২৫)

"সেকেলে, হাতুড়ে, আদিম, আর্থিক ব্যবস্থা"। (যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র, পৃঃ ৭)

"শান্ত, প্রিয়, লোকপ্রিয়, সৌজন্যবান রহিয়াছেন"। (নিগ্রোজাতির কর্মবীর, পৃঃ ১৯৩)

"সহস্র, সহস্র, স্বাধীনচিত্ত, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তেজস্বীলোক বিলাতের অধিবাসী হইল"। (স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি, পৃঃ ১০৩)

".....সুচতুর, কর্মিষ্ঠ, সৌজন্যবান্ এবং বিচক্ষণ করিতে চেষ্টিত হইতেন।" (প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা, পৃঃ ১২৯)

"কোথাও ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, হীনতা, পঙ্গুতা, দুর্বলতার চিহ্ন মাত্র নাই।" (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ১১১)

"এরূপ নিশ্চয়, অমানবিক, ঘৃণ্য, নিষ্ঠুর, সামাজিক ব্যবস্থা"..... (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১২৭)

বিনয় সরকার বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার জন্য এমন কতগুলি বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেগুলি সাহিত্যে এক বিশেষ রূপ নিয়েছে। এই শব্দগুলিকে তাঁর পূর্ববর্তী কোন লেখকই সাহিত্যের মর্যাদা দেননি। সাধুগদ্যে বা চলিতগদ্যে লেখা গ্রন্থগুলিতে এমন শব্দের পরিচয় মেলে। যেমন—'নয়া-নয়া', 'জবরদস্ত,' 'জবর', 'গন্ডা-গন্ডা', 'বাপ-কা-বেটা', 'আল-টপকা-ভাবে', 'হোমড়া-চোমরা', 'বেআদব', 'বেকুব', 'চোখা', ইত্যাদি। যে কোন লেখা বা গ্রন্থে এই ধরণের বিশেষণ শব্দের উদাহরণ পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থে এই বিশেষণ শব্দগুলির প্রয়োগ কেমন করেছেন তা উদাহরণ সহযোগে দেখা যেতে পারে। যেমন—

'নয়া-নয়া'— 'নয়া-নয়া দৃশ্য', (সুইটর্সাল্যান্ড, পৃঃ ২১)

'নয়া-নয়া চাল' (সুইটসার্ল্যান্ড, পৃঃ ১৯)

'নয়া রাষ্ট্রগুলো' (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ১২)

'নয়া খেয়াল' (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ১১)

'নয়া কারখানা' (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ৫২)

'বেয়াকুব' বা 'বেকুব'—'আমাকে চরম বেয়াকুব ভাবিতেছেন'। (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৫৫)

'দুনিয়ার বেকুব লোকেরা'। (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৪৩)

"শান্তিপ্রিয় বটে কিন্তু বেকুব নয়"। (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ১৬৪)।

'জবরদস্ত'— 'তিব্বতের উপর তাঁহার প্রভাব জবরদস্ত ও বিস্তর'। (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৩২)

'মুসলিনীর বাণী জবরদস্ত রূপে চলিতেছে।' (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১০০)

'সে জবরদস্ত বাপকা বেটা'। (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১৩২)

"জবর"— 'এক জবর পরীক্ষা'। (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ১৯৮)

"কিন্তু এই আশ্রয়দাতাদের ছিল.....জবর"। (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র, পৃঃ ৬৫)

"বয়স্কদের বাড়তি ঘটিয়েছে জবর"। (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ২৫৫)

"গন্ডা-গন্ডা"— "চতুর্দশ শতাব্দীতে গন্ডা-গন্ডা জ্যাকারি ঘটিয়াছিল।" (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ১৫০)

"ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিতেছে গন্ডায়-গন্ডায়"। (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ১৬৯)

"জার্মানরা সুইটসাল্যান্ডে গন্ডায়-গন্ডায় আড্ডা গাড়িতেছে।" (সুইটসার্ল্যান্ড, পৃঃ ৩)

"গন্ডা-গন্ডা তথ্য অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়।" (হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ১২২)

"বেআদব"— 'তাহারা বেআদব গ্রাফিজকে খুন করিতে ভয় পায় নাই'। (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ১০৫)

"টেকসই"— "হিন্দু সমাজ আর টেকসই নয়।" (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৭৭)

'এই মত কতটা টেকসই তাহার বিচারও চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া।' (যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র, পৃঃ ২৭)

"চোখা"— 'কথাগুলি বেশ চোখা'। (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ১৬৫)

"হোমরা-চোমরা"— 'সর্দার সভার হোমরা-চোমরা হয়।' (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ১০০)

তবে তাঁর কথোপকথন মূলক গ্রন্থ 'বিনয় সরকারের বৈঠকে'—এই ধরণের বিশেষণ শব্দের তালিকার দৈর্ঘ্য অনেক বেশী। এই গ্রন্থের দুইভাগে হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রগণের সঙ্গে মোলাকাত তথা নানা বিষয় নিয়ে মৌলিক আলোচনা হয়েছে। সেগুলি পত্র-পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কি ধরণের বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করেছেন তার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—'উড়ু-উড়ু ভাবে,' 'গন্ডা-গন্ডা', 'নয়া-নয়া', 'বাপ-কা-বেটা', 'বাঙালীর-বাচ্চা', 'সবসে-সেরা', 'নামজাদা', 'একবগ্গা', 'একতরফা', 'একচোখো', 'উন্নতির দুসমন', 'বেমালুমভাবে', 'তাজা', 'তক্-তক্ করছে', 'নিরেট', 'চাঙ্গা করা', 'দেদার', 'হরেক রকম', 'হামেশা' ইত্যাদি বহু বিশেষণ শব্দের উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থের এক আধ পৃষ্ঠা পড়লেই, এই ধরণের বিশেষণ শব্দের চার পাঁচটা নমুনা পাওয়া যাবে।

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের (১ম খন্ডে)—

'স্বদেশসেবার নয়া-নয়া হদিশ এবং কর্মক্ষেত্রের নয়া নয়া দুনিয়া'। (পৃঃ ১৯৯)

'বর্তমান জগতের সবসে-সেরা পন্ডিত'। (পৃঃ ২০১)

'সে অতি জবর'। (পৃঃ ৪৪৮)

'হামেশা তার সন্ধান রাখতে হবে।' (পৃঃ ৫১৮)

'.....পাশ্চাত্যসংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে।' (পৃঃ ১২১)

'রবীন্দ্রকাব্য অশান্ত রস বেঁটেছে দেদার'। (পৃঃ ৪০১)

'তাঁদের ভেতর জবরদস্ত কর্মবীর দেখেছি গন্ডা-গন্ডা'। (পৃঃ ৭)

'মেজাজটা তাঁর তথ্য-নিষ্ঠ, সংখ্যা-নিষ্ঠ'। (পৃঃ ৫৯)

'আমার মতন মাড়াকান্তকে বুঝাবার জন্য দেওয়া হয়নি।" (পৃঃ ৩৫৭)

'তাদের আত্মিক শক্তি হওয়া চাই লড়াই-নিষ্ঠ, বিদ্রোহ-নিষ্ঠ, স্বাধীনতা-নিষ্ঠ, স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠ " (পৃঃ ১৩০)

'কবিতাগুলা আর চিত্রগুলা জ্যান্ত, তাজা, সরস মাল।" (পৃঃ ৬২৭)

'মেজাজ শরীফ হওয়া চাই।' (পৃঃ ৬৭৭)

'.....দিলদরিয়া কবি'। (পৃঃ ৬৯১)

'আপনার মতটা কিছুটা একবগ্গা, চরমপন্থী।' (পৃঃ ১৬)

'চিরকালই আমি বহুত্ব-নিষ্ঠ।' (পৃঃ ৫১)

'অম্বিকা উকিল ধনবিজ্ঞানের জ্ঞান ও কর্মকান্ডে ঠিক সেইরূপই ডানপিটে, ভবঘুরে আর ত্যাঁদড় কবি " (পৃঃ ৩০৩)
'বেড়ে বই।' (পৃঃ ২৮)

'বে-আক্কেল, বেখাপ্পা, বে-সুরো, অ-সুর, আহাম্মক ইত্যাদিরূপে আমি কোন-কোন মহলে বিবৃত হয়ে থাকি'।
(পৃঃ ২৭৮)

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের (২য় খন্ডে)—

"ঢাউস-ঢাউস বই বেরিয়ে এলে ভাল হয়।" (পৃঃ ৬৬৪)

'বাঙালায় কর্মবীর পায়দা হয়েছে ঝুড়ি-ঝুড়ি'। (পৃঃ ৩৩৫)

'এই সবের উপর চাবুক লাগিয়েছে চোস্ত কড়া ঠাট্টার পশলা ছড়িয়ে।' (পৃঃ ২১৯)

'অতি নিরেট, কেঠো, সাচ্চা কথা।' (পৃঃ ৩১)

'কড়া-পাকের সমাজলোচক ইনি নন।' (পৃঃ ১১৩)

'পাঁড় দেশ সংস্কারক, গোঁড়া লোকশিক্ষক ইত্যাদি শ্রেণীর ধরণ ধারণ নাই''। (পৃঃ ১১৩)

তাঁর রচনায় বিশেষণগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। যেমন—

একটি তৎসম বিশেষণ + দেশী বিশেষণ শব্দ = প্রশস্ত + খটখটে (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ৬৮)

একটি তৎসম বিশেষণ + বিদেশী বিশেষ্য = প্রাচীন + আদমী (হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ১০৯)

একটি দেশী বিশেষণ শব্দ + তৎসম বিশেষণ = কট্টর + আধুনিক (হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ৮২)

একটি তৎসম বিশেষণ + বিদেশী বিশেষণ = চরম + বেয়াকুব (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৫০)

বিদেশী বিশেষণ + তৎসম বিশেষণ + তৎসম বিশেষণ = ইম্পিরিয়ালিস্ট + সাম্রাজ্যবাদী + ধুরন্ধর
(হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ১০৩)

একটি হিন্দী বিশেষণ + তৎসম বিশেষণ = সবসে + প্রবীন (হিন্দু রাষ্টের গড়ন, পৃঃ ৮২)

একটি হিন্দী সংখ্যাবাচক বিশেষণ + বিদেশী বিশেষ্য = পহেলা + নম্বর (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ৯৪)

একটি বিদেশী বিশেষণ + একটি বিদেশী বিশেষ্য = হামেশা (ফারসী) + নজরে (আরবী) (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১৪২)

আবার, বিণ্+ বিণ্ শব্দের মিশ্রণও আছে। যেমন, অসম্বদ্ধ + স্থূলভাব (শিক্ষাসমালোচনা, পৃঃ ৬৭)

গুহ্য + রহস্যময় + পবিত্র = বিণ্ + বিণ্ + বিণ্ (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র, পৃঃ ১৪৪)

সুবিস্তৃত + সুদীর্ঘ (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ২৭)

ক্ষুদ্রত্ব + পঙ্গুত্ব + নীচত্ব (নিগ্রোজাতির কর্মবীর, পৃঃ ৪১)

বিদেশী যৌগিক বিশেষণ শব্দের উদাহরণ ঃ দিলদরিয়া মেজাজ (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ৪৪)

আবার এমন কতগুলি বিশেষণ শব্দ আছে যেগুলি সমাসবদ্ধ একটি স্বতন্ত্র পদ। যেমন—'হ্রস্বাকৃতি, 'রুগ্নদেহ, ক্ষীণকায়' (কবরের দেশে দিন পনের, পৃঃ ২০), 'নব্যশিক্ষিত' (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, পৃঃ ১৪৭), 'নিয়মবদ্ধ' (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র, পৃঃ ৪৪), 'পঙ্কিল' (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ৪৪), 'কর্তব্য-নিষ্ঠ' (নিগ্রোজাতির কর্মবীর, পৃঃ ১৪), 'সুপন্ডিত' (ভাষাশিক্ষা, পৃঃ ৪৭), 'ক্ষুদ্রাকৃতি' (স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি, পৃঃ ১৪১)।

একক শব্দের বিশেষণ পদও কম নেই তাঁর রচনায়। যেমন—'বিরল', 'নিখুঁত', 'পুরু' (সমাজবিজ্ঞান), 'হাল্কা', 'ভারী', 'নিরেট', 'সঙ্কীর্ণ' (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র), 'দুর্ব্বল', 'উজ্জ্বল' (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ), 'অকেজো', 'গম্ভীর' (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা), 'শক্ত', 'দৃঢ়' (দুনিয়ার আবহাওয়া), 'জটিল', 'সূক্ষ্ম', 'স্থূল' (ভাষাশিক্ষা) ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বিশেষণের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতি সরকারী গদ্যে বিদ্যমান। অসমাপিকা ক্রিয়া পদ যোগ করে ক্রিয়ার বিশেষণের উদাহরণ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। যেমন—

'সে ধাঁ করিয়া বলিয়া দেবে.....' (চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, পৃঃ ৫৬)

'সভাপতিরা লম্বা-লম্বা করিয়া বলিয়া দেবে'। (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৫৭)

বীপ্সায় শব্দদ্বৈত করেও ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ তাঁর গদ্যে দেখা যায়। যেমন—'গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি', 'ঝম-ঝম বৃষ্টি' (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা), 'বুক চড়-চড় করিতেছে' (দুনিয়ার আবহাওয়া, পৃঃ ৪২), 'টো-টো করিয়া বেড়াইত' (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র, পৃঃ ২৩০), 'ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা বলিয়া' (হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, পৃঃ ৫৩) ইত্যাদি।

বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণের উদাহরণ সরকারী গদ্যে বিরল নয়। যেমন—'যারপর নাই অনেক', 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে, 'যারপর নাই বাঞ্ছনীয়', 'যৎপরোনাস্তি' ইত্যাদি ধরণের বিশেষণ তাঁর বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

বিনয় সরকার গদ্যের বিভিন্ন বিভাগে পদার্পণ করেছেন। সমস্ত বিভাগেই বিশেষণ নির্বাচনে তিনি মনোযোগী ছিলেন। সেজন্য ভাষা স্বচ্ছন্দ ও বেগবান্ হয়েছে। অনাবশ্যক শব্দ ও বাহুল্য তিনি পরিত্যাগ করেছেন। একটি বিশেষণ যখন একটি বিশেষ্যের রূপ প্রকাশে ব্যর্থ—তখন তিনি অতি শব্দ ব্যবহার করে ভাষার প্রকাশক্ষম ও মাধুর্যকে নষ্ট করেন নি। মূর্ত এবং অমূর্ত বিশেষণের সংগঠনে বিনয় সরকারী গদ্যে সফলতা লক্ষিত হয়।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১। রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণ সেবধি, ১৮২১।

— ঃ —

—ঃ নবম অধ্যায় ঃ—

চলিত গদ্যের রূপ



ক) শব্দার্থতত্ত্ব
খ) Diagram এবং Graph - এর সাহায্যে Style বিচার
গ) বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি — গুরুচন্ডালী সমর্থন
ঘ) কথ্য ভাষার বিশ্লেষণ

।। ক ।। শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থ

শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা সর্বদা স্থির নয়। বাক্য অনেক সময় অর্থকে অতিক্রম করে। অর্থও সব সময় বাক্যের বন্ধন মেনে চলে না। ইংরাজীতে এই বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে—'Semantics' বা 'Rhymatology'. তবে এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিই বেশী প্রচলিত। গ্রীক ভাষায় 'Semantics' শব্দের অর্থ 'সূচিত করা।' 'Semantics'-এর অর্থ—'The science of meaning'. কোন কোন শাব্দিকগণ একে 'শব্দার্থতত্ত্ব' বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এই বিজ্ঞানকে—'বাগর্থ বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করতে ইচ্ছুক। কারণ 'বাগর্থ' শব্দের মধ্যে 'Rhema' ও 'Semaino'—এই দুটি শব্দের অর্থই, অংশাঅংশিভাবে বজায় আছে। 'বাগর্থে'র মধ্যে বিন্যাস কৌশলের ভেতর দিয়ে অর্থ-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"সাহিত্য সভ্য মানুষের মনের খাদ্যভাণ্ডার। সাহিত্যের প্রধান কাজ বাক্‌শিল্পসৃষ্টি। সে সৃষ্টির প্রাণ হইল অলংকার। অলংকার শব্দার্থেরই বিষয়।" (১) সকল শব্দই—প্রসঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী কিছু নতুন অর্থের ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারে। অলংকারের মাধ্যমে শব্দ বাচ্যার্থ অতিক্রম করে এক নতুন অর্থ গ্রহণ করতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বাক্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"ভাষার মূল বক্তব্য বাচ্যার্থের ওপরই নির্ভরশীল কিন্তু শুধু যদি বাচ্যার্থের ওপর ভিত্তি করে ভাষার সৌধ গড়ে তোলা যায় তবে রস বিতরণের দিক থেকে সে ভাষা খুব উঁচু হবে না; তা বলাই বাহুল্য। লেখক বা বক্তা শুধু মাত্র বাচ্যার্থের যষ্টি ভর করে সাহিত্যের রাজ্যে বিচরণ করেন না, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে নানা রকমের ভাব সংকেতের দ্বারা উপস্থিত করে থাকেন। পরিপার্শ্ব বিচার করে আগের ঘটনার ওপর সংযোগ রেখে শ্রোতা বা পাঠক সহজে বুঝতে পারেন ভেবেই বক্তা বা লেখক ভাব সংকেত করেন। তার মধ্যে বাচ্যার্থের চেয়েও বড় আরো কোন অর্থ বা ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়ে থাকে।" (২)

একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে। অর্থাৎ কোন শব্দ যথার্থভাবে যে বিষয়ে প্রযোজ্য, তা ঘুরিয়ে অন্যভাবে প্রয়োগ করলে বক্তব্য সরস হয়। অলংকারের দ্বারা শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়। শব্দার্থের ত্রিধারার পরিচয়—বিনয় সরকারের গদ্যে মেলে। তাঁর কথোপকথন-মূলক গ্রন্থ "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম খণ্ড) থেকে উদাহরণ চয়ন করা যেতে পারে।

বিনয় সরকার যখন উল্লেখ করেন—"অমর লোক মাত্রই উপাধিহীন" (পৃঃ ৬) বা "তাঁদের ভেতর জবরদস্ত কমবীর দেখেছি গণ্ডা-গণ্ডা" (পৃঃ ৭) বা "তাদের লেখালেখির ভেতর মাল আছে বেশ" (পৃঃ ১৬২) বা "আমার অকথা চৌখা ভাষার খবর অনেকেই রাখে" (পৃঃ ১০৭) বা "রাষ্ট্রিক জননায়কদের সঙ্গেও মাখামাখি ছিল তাঁর গভীর" (পৃঃ ২৭৯) ইত্যাদি, তখন বাক্যগুলির মধ্যে অসংখ্য ভাবের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়নি— সরলভাবে, যথাযথভাবে এর অর্থ প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু যখন "বাংলা ভাষার সুরৎ যারপর নাই বদলাবে" (পৃঃ ৪৩০) উক্তি প্রয়োগ করেন, তখন এখানে "সুরৎ" অর্থে "স্বভাব"-এর কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এখানে লেখক মূল শব্দ দ্বারা অন্য অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ব্যাকরণের ভাষায়, এই "অন্য অর্থ"-কেই লক্ষ্যার্থ বলে। অধ্যাপক সরকারের রচনায় লক্ষ্যার্থের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 'আমার গরুমিতে অবশ্য দুনিয়ার কোন লোকের ক্ষতি হবে না" (পৃঃ ১০৫)—এখানে 'গরুমি' অর্থে 'বোকামিকে' বোঝাতে চেয়েছেন। 'বিদ্যার বেপারী' (পৃঃ ২০১) অর্থে "পণ্ডিত", "শাঁসাল শব্দ পকেটস্থ" (পৃঃ ২১৬)—'পকেটস্থ' অর্থে 'করায়ত্ত;' "ছোকরা মানুষ হয়েছে" (পৃঃ ২৭১)—'মানুষ' অর্থে 'সভ্য', 'পাকা কারবারী' (পৃঃ ৩০৯) অর্থে 'চতুর', "বিশচোখো দৃষ্টিভঙ্গী" (পৃঃ ৫৫২) অর্থে 'সতর্ক,' "পাকা হাতের মাল" (পৃঃ ৬১০)—'পাকা' অর্থে 'দক্ষ'; "দাঁ মেরে নিতে পারবে" (পৃঃ ১৬৮)—'দাঁ' অর্থে 'সুযোগ,' "হৃদয়ওয়ালা মানুষ" (পৃঃ ৪৬৮)—'হৃদয়ওয়ালা' অর্থে 'দয়ামায়াদি অনুভব করার শক্তি আছে যার,' 'ইজ্জদ মারা যাবার সম্ভাবনা" (পৃঃ ৪৭৬)—"মারা" অর্থে "নষ্ট", "মগজ খেলালে" (পৃঃ ৪৫১)—"মগজ" অর্থে 'বুদ্ধি', "হুযবরল"য় অর্থে "জটিলতা" ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছেন— যাকে ব্যাকরণের অভিধানে লক্ষ্যার্থ বলে।

শব্দার্থের আর একটি ধারার অর্থাৎ ব্যঙ্গার্থের পরিচয়ও তাঁর রচনায় মেলে। এখানে বাক্যের অর্থগ্রহণ, বাক্যস্থিত শব্দের মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ ধরে হয় না বরং শব্দের প্রয়োগে অন্য কোন অর্থের দ্যোতনা করে হয়, তখন সেই বিরূপ

অর্থকে ব্যঙ্গার্থ বলে। এইরকম অর্থ প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক সরকারের বেশ কতিপয় বাক্যগুলির মধ্যে। যেমন—''বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ দুজন হরিহর আত্মা'' (পৃঃ ১১) (ঘনিষ্ঠ বন্ধু), ''বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ এ দুইয়ের ঘাড়ের চোয়ালের উপর ভারতীয় গাড়ী চলেছিল দুনিয়ায়'' (পৃঃ ১১) (এই দুজনের উপর নির্ভর করে ভারতের অগ্রগতি হয়েছিল), ''উড়ু-উড়ু ভাবে জানতো'' (পৃঃ ১৫) (হাল্কা ভাবে), ''বইটা ট্রামে চলতে-চলতে চুমড়ে নেবার মতন না'' (পৃঃ ৮২) (সাধারণ নয়), ''নানা ঘাটে পানি ঘাঁটতে হয়'' (পৃঃ ৯৯) (বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়), ''অধিকাংশই হীরের টুকরো'' (পৃঃ ১০৫) (অসাধারণ), ''বাপ্‌মারা চোখ বদলাতে শুরু করুন '' (পৃঃ ৮১) (পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো), ''বিশ্বশক্তির বেপারীরা আজকের ভারতীয় মেজাজ ছুঁয়ে জীবন চালাতে অভ্যস্ত'' (পৃঃ ৪৪১) (বিশ্বশক্তির প্রধানরা ভারতীয় দর্শন বুঝে জীবন চালাতে অভ্যস্ত); ''রবীন্দ্রনাথের মুড়োর ভেতর ঢুকতে পারোনি'' (পৃঃ ৫২৯) (রবীন্দ্রদর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞাত), ''এই চিজ্‌টা দাড়িয়ে যাবে ডাল-ভাত খাবার মতন'' (পৃঃ ৪৩৩) (সাধারণ ব্যাপার) ; ''এক গেলাসের ইয়ার'' (পৃঃ ৬৬) (ঘনিষ্ঠ বন্ধু), ''আতুর-ঘর সমঝে রাখা ঠিক নয়'' (পৃঃ ৩০৭) (জন্মস্থান ভাবা উচিত নয়), ''মুড়োর ভেতর নতুন-নতুন ঘী এসে জমতে পারে'' (পৃঃ ৫৬০) (নতুন-নতুন চিন্তাধারা), ''রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল বহরের সঙ্গে কুস্তী চালানো যে সে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়'' (পৃঃ ৬১৯) (বিরাটত্বের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়)।

এই সমস্ত লক্ষ্যার্থক-ব্যঙ্গার্থক শব্দ বা বাক্যাংশ অধ্যাপক সরকারের ভাষার সম্পদ। পাঠকের অনুভূতিকে সংক্ষেপে ও সুচারুরূপে, রসালভাবে প্রকাশ করার সময় এই জাতীয় বাক্যাংশের প্রয়োগ অপরিহার্য।

কোন ভাষার কোন শব্দ চিরকাল একই অর্থ বহন করে না। ভাষার সঙ্গে মানবমনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। নানা কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি ও চিন্তাধারার সঙ্গে ভাষার যোগ ঘনিষ্ঠ। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের মূলে থাকে এই কারণগুলি, তাই লেখক যখন একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন তখন তার পেছনে কাজ করে লেখকের মানসিক অবস্থা বা চিন্তাধারা ও তাঁর সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি। বিনয় সরকারের বিভিন্ন রচনায় ''ধুরন্ধর'' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'ধুরন্ধর'-এর অর্থ 'যে ভার গ্রহণ করে'। তিনি এই শব্দটির অর্থ—বিষয় অনুসারে পরিবর্তন করেছেন। যেমন—''নবীন এশিয়ার জন্মদাতা'' গ্রন্থে 'শিল্প ধুরন্ধর' কথাটিকে শ্রেষ্ঠার্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এখানে অর্থের উন্নতি ঘটেছে। আবার 'ধনদৌলতের রূপান্তর' গ্রন্থে 'পুঁজি ধুরন্ধর'-এর অর্থ হয়েছে চতুর বা সতর্ক ব্যক্তি। অর্থাৎ অর্থের অবনতি হয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক সরকার যখন ''বিনয় সরকারের বৈঠকে'' গ্রন্থে অভেদানন্দকে ''রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের ধুরন্ধর'' বলেন, তখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ''ভারবাহী'' হিসাবে। অর্থাৎ স্বল্পতম শব্দের মধ্যে অসাধারণ ব্যঞ্জনার সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক ভাবরাশি নিহিত হয়েছে। স্বল্পকথায় গভীর ভাবপ্রকাশের ব্যঞ্জনা—তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রকাশিত। তাঁর কয়েকটি রচনা অবলম্বনে সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে।

''বিনয় সরকারের বৈঠকে'' গ্রন্থে তিনি অম্বিকা উকিলকে ''ত্যাঁদড়'' বলেছেন। ''ত্যাদড়'' শব্দের অর্থ ''অসভ্য''. কিন্তু এখানে উচ্চভাবের অর্থ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এখানে শব্দার্থের উন্নতি হয়েছে। এইরকম অর্থের উন্নতি ঘটেছে আরো কয়েকটি শব্দে। যেমন—''অধমকে ঘরোয়া বন্ধুভাবে নিয়েছে'', এখানে 'অধম' নীচাশয় বা নোংরা অর্থে গৃহীত হয়নি। তিনি প্রতিপক্ষকে উচ্চাসনে বসিয়ে নিজেকে বিনয় সহকারে নীচে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ এখানে শব্দের অর্থ সাধারণ ছিল, লেখক তাকে ভাল অর্থে পরিণত করেছেন।

প্রথমে শব্দের অর্থ উৎকর্ষবোধক থাকলে, পরে অপকর্ষবাচক হলে অর্থের অবনতি ঘটে। শব্দার্থের অবনতি ঘটেছে অধ্যাপক সরকারের কয়েকটি রচনায়, যেমন—''আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী'' (নিগ্রোজাতীর কর্মবীর, পৃঃ ১০২); 'হিতাকাঙ্ক্ষী' অর্থ 'অন্যের মঙ্গলকামনাকারী' কিন্তু 'আত্ম'যোগে শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'স্বার্থপর'। আবার ''বিবাহিত জীবনের স্বর্গসুখ যে কি অপ্রিয় বস্তু'' (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র) বাক্যাংশটিতে 'স্বর্গসুখ' কথাটির মাধ্যমে বিদ্রূপাত্মক লঘুভাব প্রকাশ পেয়েছে। ''লাঠৌষধি'' (ধনদৌলতের রূপান্তর, পৃঃ ২২২), কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করার উপায় হচ্ছে 'ঔষধ', কিন্তু 'লাঠি' শব্দযোগে এর অর্থের অবনতি ঘটেছে।

অধ্যাপক সরকারের রচনায় শব্দার্থের প্রসার ঘটেছে খুব বেশী। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। 'বিনয় সরকারে বৈঠকে' (১ম খন্ড) গ্রন্থে—''ধূ-ধূ করছে'' (পৃঃ ৫৪৪), ''গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি'' (পৃঃ ১৭৭) ইত্যাদি ধ্বনিবাচক শব্দে ঈষৎ ধ্বনির ভাব আনয়ন করেছে, এর ফলে অর্থের বিস্তার ঘটেছে। আবার ''কাপড়-চোপড়'' (নিগ্রোজাতির কর্মবীর, পৃঃ ১৪৩), ''বাসনকোসন'' (ইতালিতে বারকয়েক, পৃঃ ১৬০) ইত্যাদি ধরনের একটি শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দযোগে অর্থের প্রসার ঘটেছে।

বিনয় সরকার ব্যবহৃত ''কাপড়'' (ইতালিতে বারকয়েক, পৃঃ ২২) শব্দটি প্রাচীনকালে 'কার্পাসজাত বস্ত্র'কে বোঝাত। কিন্তু এখন 'রেশমী বস্ত্র'কে 'রেশমী কাপড়', 'পশমী বস্ত্র'কে 'পশমী কাপড়' বলা হয়। ''বিনয় সরকারের বৈঠকে'' (১ম খন্ড) গ্রন্থে—''দরিয়া'' শব্দটি (পৃঃ ৩১) ফারসীতে 'নদী', কিন্তু এদেশে হয়েছে 'সমুদ্র'। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত ''জবরদস্ত'' শব্দটিতে ''জবর'' শব্দের অর্থ 'বলিষ্ঠ' বা 'প্রকাণ্ড', 'দস্ত' শব্দের অর্থ 'হাত' কিন্তু প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে 'শক্তিশালী'। ফারসী 'গুলজার' শব্দটিও বিভিন্ন রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। মূল অর্থ ছিল 'ফুলের বাগান' কিন্তু বর্তমান অর্থ হয়েছে 'জমকালো'। 'মার্কিন বন্ধু' (প্যারিসে দশমাস, পৃঃ ১৭৯) কথাটিতে 'মার্কিন' শব্দটিকে প্রাচীনকালে 'কোরা কাপড়' বোঝাত, কিন্তু অর্থপ্রসারের ফলে ''আমেরিকান ভদ্রলোক'' হয়েছে। ''ধূম'' (ইতালিতে বার কয়েক, পৃঃ ১৪) শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'গানে সমবেত উচ্চ সুর', অর্থপ্রসারে হয়েছে 'শোরগোল' বা 'চেঁচামেচি'। 'প্যারিসে দশমাস' গ্রন্থে ''বয়কট'' (পৃঃ ১৭) শব্দটি ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল, পরে তা দ্রব্যনামে পরিণত হয়েছে।

'কাটা' শব্দের অর্থ ব্যাখা করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিনয় সরকার যাকে 'ঠোঁটকাটা' (সমাজবিজ্ঞান, পৃঃ ১৩৪) বলেন, তখন তার ঠোঁট কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষত থাকে। পোকায় বই কাটে, কিন্তু 'পত্রিকার কাটতি' (বিনয় সরকারের বৈঠকে, পৃঃ ২৬৭) শব্দে—পত্রিকার দাঁতের কথা বোঝায় নি।

অর্থের সঙ্কোচ বা প্রসারের ফলে নতুন অর্থের আগমন ঘটেছে বিনয় সরকারের রচনায়। যেমন—''মানুষের মুড়োটা পাকে না'' (বিনয় সরকারে বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৬), ''পাকা ওস্তাদ'' (নিগ্রোজাতির কর্মবীর), ''পাকা কারবারী'' (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৯) যথাক্রমে 'অভিজ্ঞতা সম্পন্ন', 'বুদ্ধিমান', 'চতুর' অর্থ হয়েছে। 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' গ্রন্থে—''ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া'' (পৃঃ ৯৭) অর্থে 'নির্বোধের মত' বোঝাতে চেয়েছেন। 'ইংরাজের জন্মভূমি' গ্রন্থে—''নূতন-চোখ'' (পৃঃ ২৬১) বলতে 'নূতন দৃষ্টিভঙ্গী' বুঝিয়েছেন। ''চোখ ফুটিয়াছে'' (নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, পৃঃ ২১৯) অর্থে 'সজাগ হওয়া'কে বোঝাচ্ছেন।

''বিনয় সরকারের বৈঠকে'' গ্রন্থেও এই ধরণের উদাহরণ মেলে, যেমন—''বুকটা চওড়া হতে পারে'' (পৃঃ ৫৫৯) অর্থে 'গর্ব হওয়া'; ''ঝাঁঝাল মগজ'' (পৃঃ ৩৯৫) অর্থে 'তেজী বুদ্ধি'; 'মুড়োর ভেতর নতুন ঘী'' (পৃঃ ৫৬০) অর্থে 'নতুন চিন্তাধারা'; ''একচোখো'' (পৃঃ ১৯৪) অর্থে 'এক পেশে' ইত্যাদি।

এই সকল জায়গায় মুখ্যার্থ অচল হয়েছে, দৃষ্টি গেছে লক্ষ্যার্থের দিকে। এই সকল বিভিন্ন ধরণের শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ফলে অধ্যাপক সরকারের গদ্যে একটা নতুন মাত্রা এনেছে। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সুচারুরূপে এবং সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য এই জাতীয় শব্দ বা বাক্যাংশের সাহায্য নিয়েছেন। শব্দকে ঘুরিয়ে প্রয়োগ করার ফলে বর্ণনার অভিনবত্বও সেখানে প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১। সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', নবীন সং, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৬।

২। শুদ্ধসত্ত্ব বসু, 'বাংলা ভাষার ভূমিকা', পরিঃ সং, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ২৪৬।

।। খ ।। ডায়াগ্রাম এবং গ্রাফ-এর সাহায্যে চলিত গদ্যের স্টাইল বিচার।

রচনার সামগ্রিক রসাবেদন বিচার করে স্টাইলিস্‌টিকস্‌। ভাষার গঠন ও নির্মান কৌশল এই রসাবেদন বা Rhetoric appeal-এর পেছনে কতখানি কাজ করে তার মূল্যবিচার করে স্টাইলিস্‌টিকস্‌। শব্দ, বাক্য, যতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি যে সমস্ত উপাদানে রচনা গঠিত হয়, তার সব কিছুই স্টাইলিস্‌টিকস্‌ -এর বিচার্য। **"অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিত অথচ সন্দেহযুক্ত পরিচিত লেখকের লেখা নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, স্টাইলিস্‌টিকস্‌ তারও পরিচয় উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে।"**[১]

স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর সাহায্যে রচনার স্টাইল নির্ণয়ের সুবিধা হল—**"স্টাইলিসটিক্যাল মেথড-এ, ডায়াগ্রাম-এ এবং গ্রাফ-এ এই বিশ্লেষণ যত বেশী নির্ভুল এবং বৈজ্ঞানিক হয়; তত নির্ভুল পদ্ধতি এখন পর্যন্ত ভাষার স্টাইল বিচারের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব স্টাইল নির্ণায়ক এই বিজ্ঞান, রচনার সঙ্গে রচয়িতার যে সম্পর্ক প্রমাণ করে তার গুরুত্ব ভাষা বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশেষ মূল্যবান।"** [২]

বর্তমান আলোচনার বিষয়—Diagram এবং Graph-এর মাধ্যমে অধ্যাপক সরকারের চলিত গদ্য ভাষার style বিচার। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম ও ২য় খন্ড), "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা", "সাধনা"—তাঁর চলিত ভাষার নিদর্শন। দেশী, বিদেশী লৌকিক সব রকম শব্দ অক্লেশে ব্যবহার করেছেন। নানা জাতীয় শব্দের মিশ্রণে তাঁর ভাষার বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে। এই রকমারি শব্দ-সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে তাঁর বহু জোরালো বাক্য। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দের চরিত্র, বাক্যের দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য রচনার কৌশল, ডায়াগ্রাম এবং গ্রাফের সাহায্যে বিচার করা যেতে পারে।

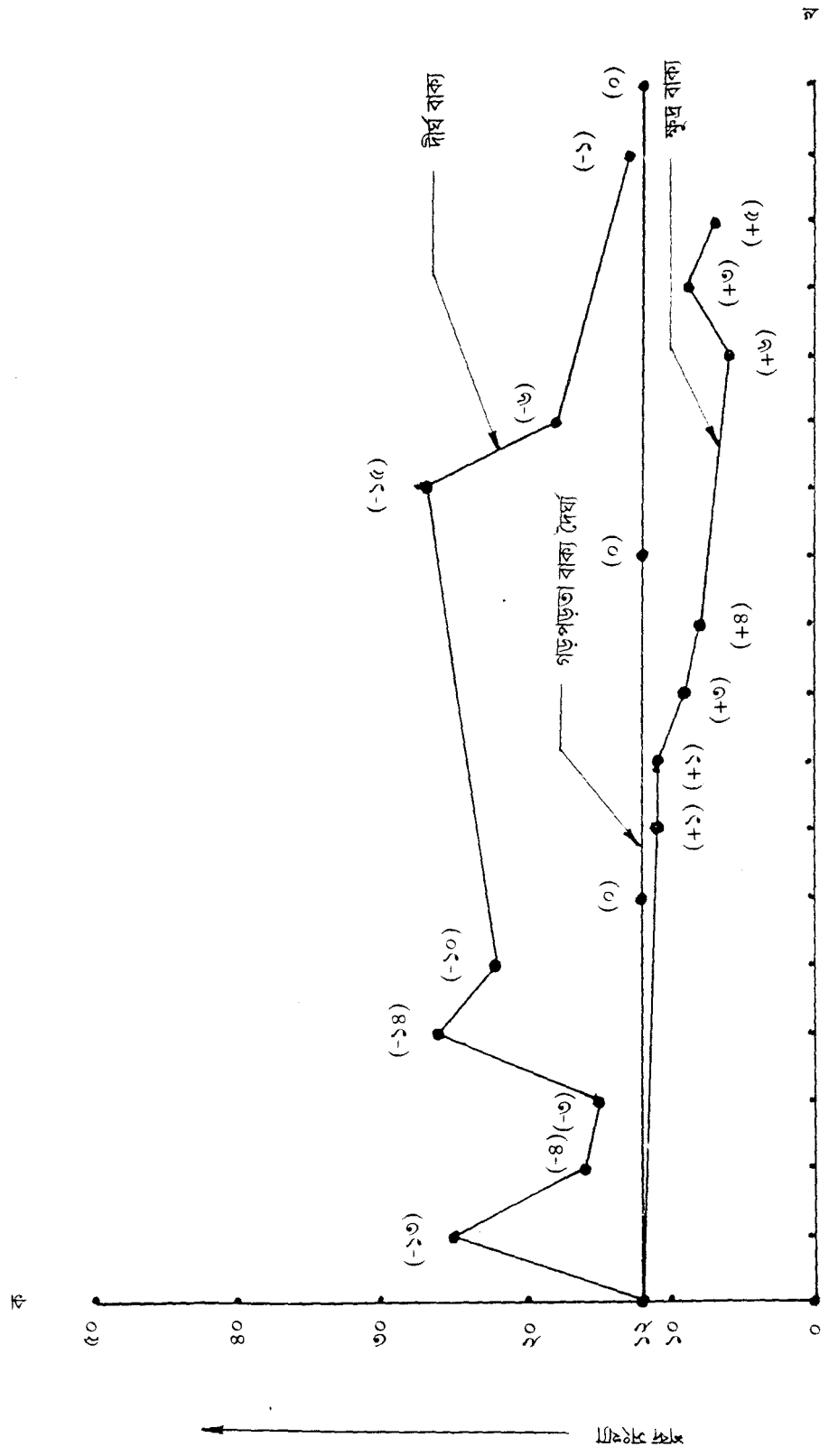
Cumulative sum charts method-এর সাহায্যে 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম খন্ড) গ্রন্থটির ৫০১ ও ৫০২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র (১৭ নং) অঙ্কন করলে দেখা যায়, এর গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য ১৫। একইভাবে ১৮-তম রেখাচিত্রে ('বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' গ্রন্থের পৃঃ ৩১ এবং পৃঃ ৩২) গড়পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্য ১২ এবং ১৯-তম রেখাচিত্রে ('সাধনা' গ্রন্থের পৃঃ ৫৭ এবং পৃঃ ৫৮) গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য ১৪ হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় বিনয় সরকারের চলিত গদ্যের বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য অধিকাংশই ছোট মাপের। বিষয় অনুযায়ী গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য ১২ থেকে ১৫-র মধ্যে ওঠানামা করেছে। এখানে দীর্ঘবাক্যও আছে কিন্তু ক্ষুদ্রবাক্যের সংখ্যা বেশী। এই কারণেই গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য মাঝারী মাপের হয়েছে। তিনটি পৃথক রচনার গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্যের যে পরিসংখ্যান, তার গড় করলে দেখা যায় যে, বিনয় সরকারের সমগ্র চলিত সাহিত্যের গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্য $= \left[\frac{১২ + ১৪ + ১৫}{৩}\right]$

$= ১৩.৬৬$ বা ১৪ (প্রায়)।

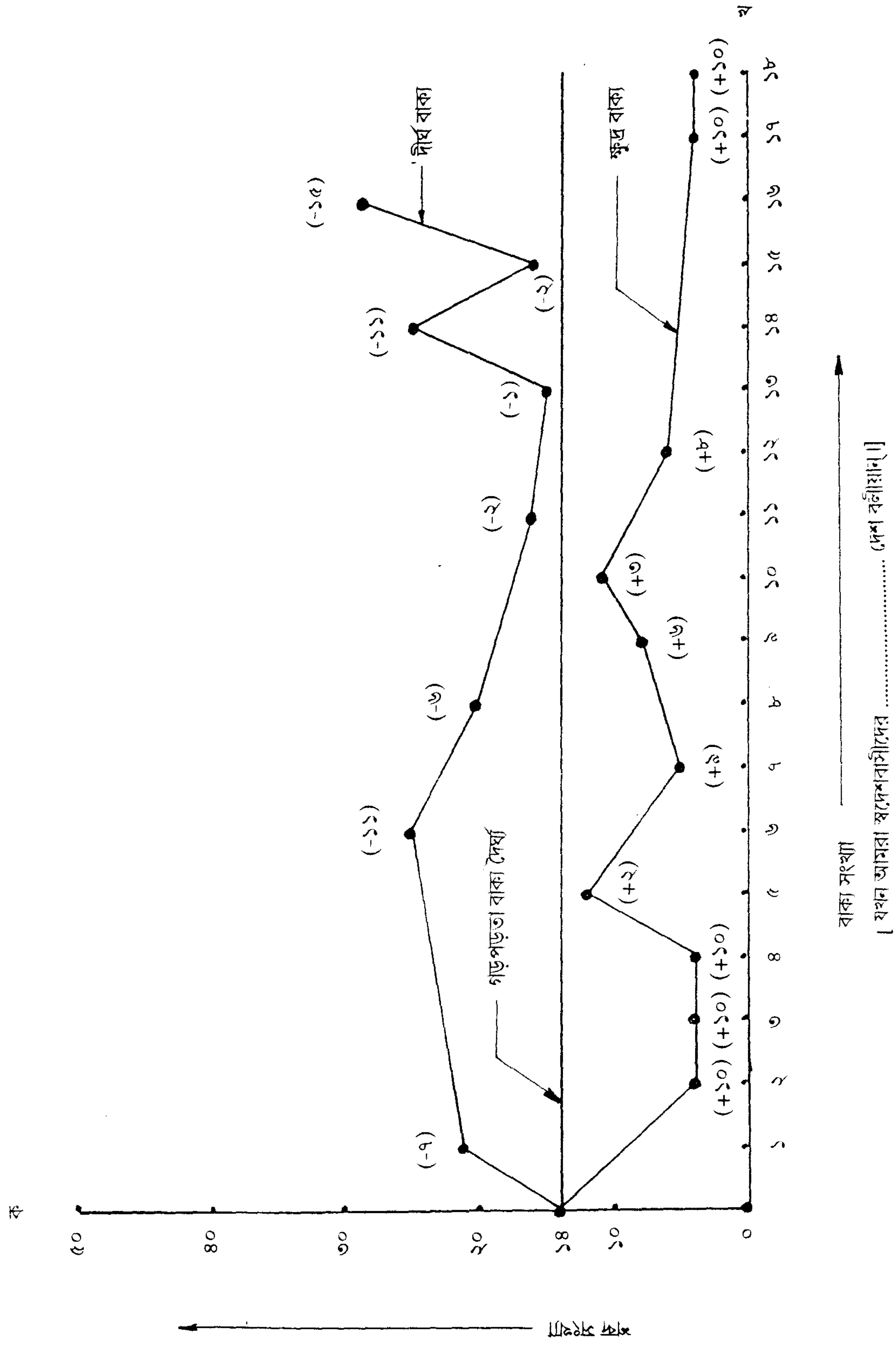
[আমরা যে কোনো ..... কাশ্মীর আর কি ।]

বিনয় সরকারের বৈঠকে (প্রথম খণ্ড) (পৃষ্ঠা ঃ ৫০০ এবং ৫০১)

রেখাচিত্র - ১.৭


ক
খ
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
দীর্ঘ বাক্য
ক্ষুদ্র বাক্য
গড়পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্য
(-১৬) (-৬) (-১) (০)
(-১৫) (+৫)
(-১৪) (+৩)
(-১০) (+৬)
(-৩) (+৪)
(-৪) (+৩)
(০) (+১) (+১)
(০)
(০)
বাক্য সংখ্যা
[গীতায় আছে..... এত যুক্তিযুক্তি করি ?]
বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা (পৃষ্ঠা - ৩১ এবং ৩২)

রেখাচিত্র - ১৮



সাধনা (পৃষ্ঠা : ৫৭ এবং ৫৮)

রেখাচিত্র - ১৬

১৭-তম রেখাচিত্রের মোট আঠারটি বাক্যের মধ্যে, বারটি ক্ষুদ্রবাক্য অর্থাৎ ৬৭% আর ছয়টি দীর্ঘবাক্য অর্থাৎ ৩৩% দেখা যায়। এখানে ক্ষুদ্রবাক্যগুলি— দীর্ঘবাক্যগুলির তুলনায় রেখাচিত্রে অনেক বেশী ওঠানামা করেছে। দীর্ঘবাক্যগুলির শীর্ষকু বিন্দুর যোগফল রেখা গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্যের প্রায় সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রবাক্যগুলির মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত দীর্ঘবাক্যগুলি মোটামুটি সমমাপের। ২০,২১,১৯, ২০,২০, ২৩ শব্দবিশিষ্ট দীর্ঘবাক্যগুলি এক্ষেত্রে এই তথ্য সমর্থন করে। ১৮-তম এবং ১৯-তম রেখাচিত্রে দীর্ঘবাক্যগুলির ওঠানামা প্রথম রেখাচিত্রের তুলনায় একটু বেশী আছে। ক্ষুদ্রবাক্যগুলির ওঠানামা—এর দীর্ঘবাক্যগুলির থেকে বেশী। ১৮-তম রেখাচিত্রে মোট আঠারটি বাক্যের মধ্যে সাতটি ক্ষুদ্রবাক্য (৩৯%), আটটি দীর্ঘবাক্য (৪৪%) এবং তিনটি গড় বাক্যদৈর্ঘ্যের সমান বাক্য (১৭%)। এখানে গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্যের সমান বাক্যগুলি সহকারে ক্ষুদ্রবাক্যের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। অতএব এখানে ক্ষুদ্রবাক্যের প্রাধান্য বেশী। ১৬, ১৫, ২২, ১৮, ১৩ শব্দবিশিষ্ট দীর্ঘবাক্যগুলির মধ্যে ওঠানামা মোটামুটিভাবে কম আছে। মোটামুটি তাদের শীর্ষক বিন্দুগুলি গড়পড়তা বাক্যদৈর্ঘ্যের সমান্তরালে সজ্জিত। একইভাবে ১৯-তম রেখাচিত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, আঠারটি বাক্যের মধ্যে দশটি ক্ষুদ্রবাক্য (৫৬%) এবং আটটি দীর্ঘবাক্য (৪৪%)। দীর্ঘবাক্যগুলির মধ্যে তিনটিকে বাদ দিলে বাকি দীর্ঘবাক্যগুলির ওঠানামা অনেক সীমিত। মোটামুটিভাবে তাদের শীর্ষক বিন্দুগুলি একইভাবে গড়পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্যের সমান্তরালে সজ্জিত।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিনয় সরকারের চলিত গদ্যে ক্ষুদ্রবাক্যের প্রাধান্য বেশী। আর দীর্ঘবাক্যগুলি প্রায় সমমাপের। তবে মাঝে মাঝে বিসম মাপের দীর্ঘবাক্য থাকলেও—এর পরিমাণ স্বল্প। যেমন ১৮-তম এবং ১৯-তম রেখাচিত্রে এই ব্যতিক্রম মাত্র ১৬% শতাংশ দেখা গেছে।

বিনয় সরকারের চলিত গদ্যে ক্ষুদ্রবাক্যের প্রাধান্য থাকলেও, দীর্ঘবাক্যও পরিলক্ষিত। ক্ষুদ্রবাক্য-বিন্যাসে এখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাক্য, মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—১৭-তম রেখাচিত্রের ১৪ নং বাক্যটি। আবার দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসে, ১৯-তম রেখাচিত্রের ১৬ নং বাক্যটি ২৯ শব্দবিশিষ্ট। বাক্যবিন্যাসে ক্রমাগত ক্ষুদ্রবাক্যের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন—১৭-তম রেখাচিত্রের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বাক্যগুলি। বাক্যবিন্যাসের এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাঁর বিষয়গত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। যুক্তিতর্ক বিশিষ্ট আলোচনা অথবা উপমামূলক আলোচনায় সারিবদ্ধ দীর্ঘবাক্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ১৮-তম রেখাচিত্রের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বাক্যগুলি এই যুক্তির-ই সমর্থক।

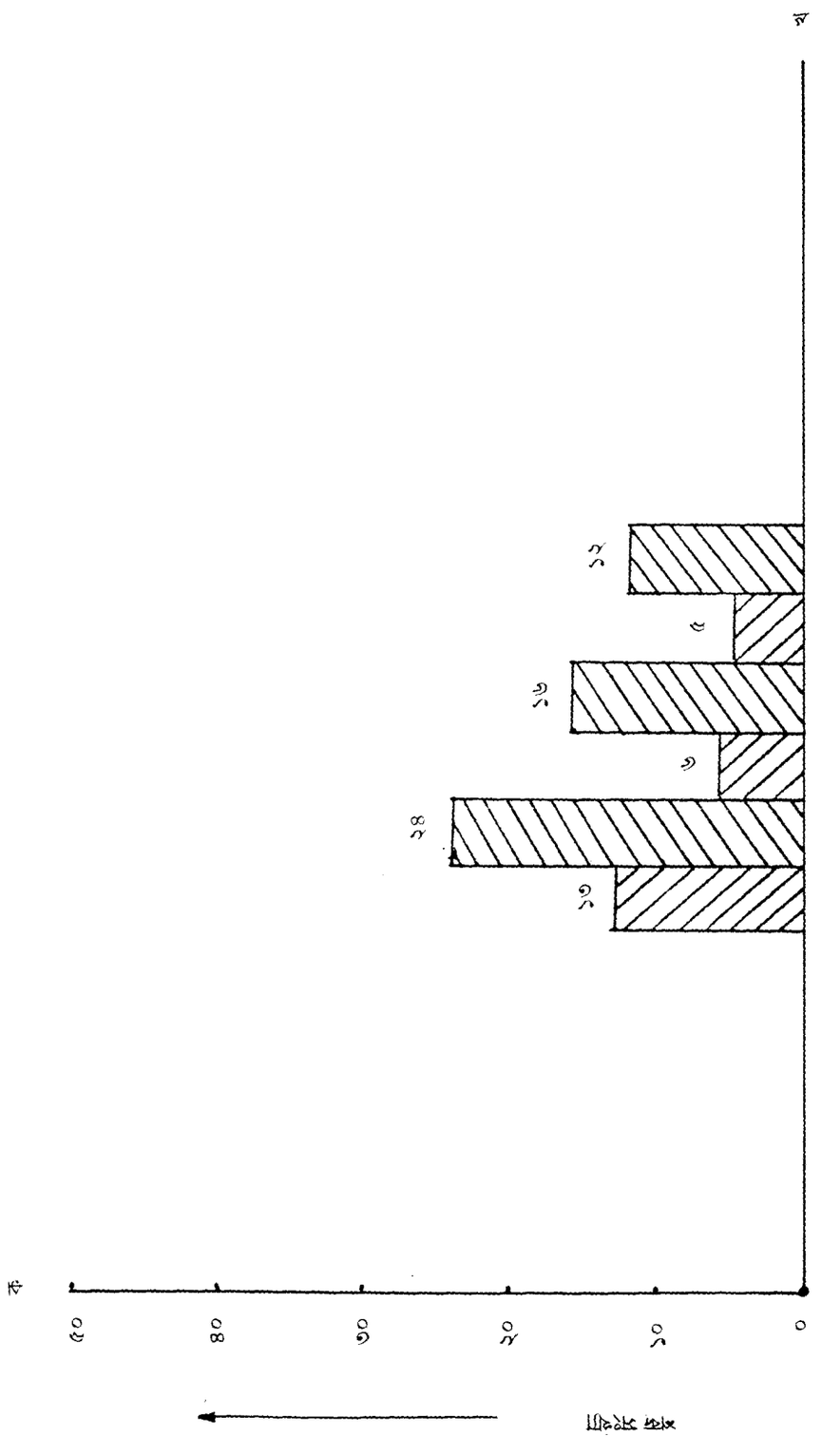
এই সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ নিম্নলিখিত তালিকায় লিপিবদ্ধ করা যায় ঃ—

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	গড়পড়তা বাক্য প্রতি শব্দসংখ্যা	পৃষ্ঠা নং	বাক্য সংখ্যা	দীর্ঘ বাক্য সংখ্যা	দীর্ঘ বাক্য (%)	ক্ষুদ্র বাক্য সংখ্যা	ক্ষুদ্র বাক্য (%)	গড়পড়তা বাক্যসংখ্যা	গড়পড়তা বাক্য (%)	রেখাচিত্র নং
১	বিনয় সরকারের বৈঠক (১ম খণ্ড)	১৫	৫০০ এবং ৫০১	১৮	৬	৩৩ %	১২	৬৭%	—	০%	১৭
২	বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা	১২	৩১ এবং ৩২	১৮	৮	৪৪%	৭	৩৯%	৩	১৭%	১৮
৩	সাধনা	১৪	৫৭ এবং ৫৮	১৮	৮	৪৪%	১০	৫৬%	—	০%	১৯

[উপর পরিমাণে ..... আর কিছু নয়]

বিনয় সরকারের রৈঠকে (প্রথম খণ্ড) (পৃষ্ঠা :- ১৮৩)

রেখাচিত্র - ২০



রেখাচিত্র - ২১

বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা (পৃষ্ঠা ১-১৯)

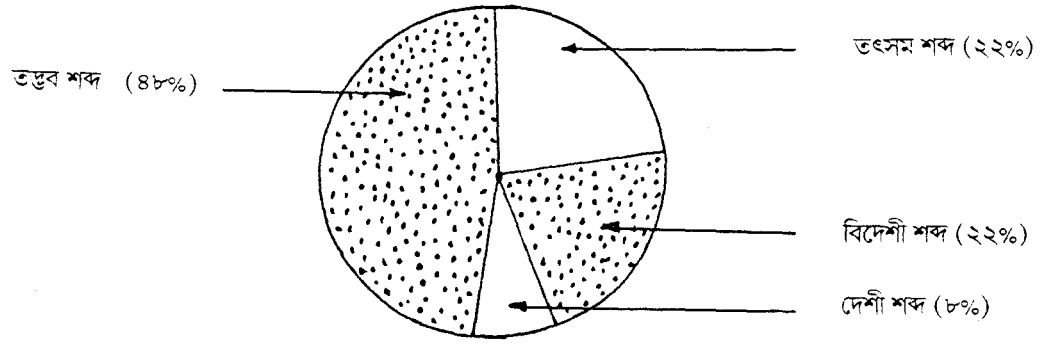
["আত্মদান বিদ্ধি "-এ নিয়মটা ..... ইচ্ছা হয় না]

সাধনা (পৃষ্ঠা - ৮১)

রেখাচিত্র - ২২

২০, ২১, এবং ২২-তম রেখাচিত্রে দেখা যায় যে, অতি ক্ষুদ্রবাক্যের পরেই অতি দীর্ঘবাক্য রচনা বা অতি দীর্ঘবাক্য রচনার পরক্ষণেই অতি ক্ষুদ্রবাক্য রচনা। যেমন ২০-তম রেখাচিত্রের ২নং বাক্যটি ১৫ শব্দবিশিষ্ট কিন্তু ৩নং, ৪নং, ৫নং বাক্যগুলি যথাক্রমে ছয়, পাঁচ এবং চার শব্দবিশিষ্ট। ২১-তম রেখাচিত্রের ২নং বাক্যটি ২৪ শব্দবিশিষ্ট কিন্তু ৩নং বাক্য ৬ শব্দবিশিষ্ট এবং পরক্ষণেই ৪নং বাক্য ১৬ শব্দবিশিষ্ট। একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ২২-তম রেখাচিত্রে। এখানে ৩নং বাক্য ৩০ শব্দবিশিষ্ট, ৪নং বাক্য ৭ শব্দবিশিষ্ট এবং ৫নং বাক্যটি ১৮ শব্দবিশিষ্ট। শব্দের এই ওঠানামা সৃষ্টি করেছে একটি আকৃতিগত তরঙ্গ বা wave. ফলতঃ পাঠকমনের একঘেয়েমি কেটেছে।

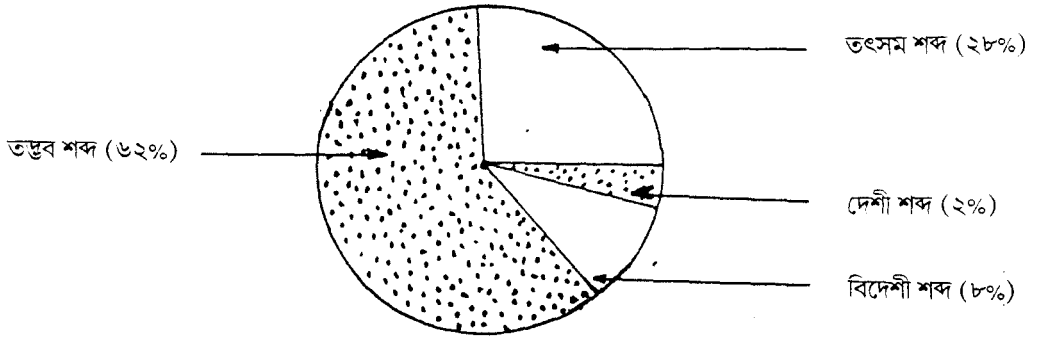
তাঁর চলিত গদ্যের রচনায় সব রকম শব্দ অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চলিত গদ্যে তৎসম-শব্দের পরিমাণ কিছু কম। এ কথা স্বীকার্য যে, ভাষা যত বেশী মুখের ভাষার নিকটস্থ হয়—সে ভাষায় তত বেশী দেশী, বিদেশী এবং তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের হিসাব দেখলে মনে হয়, তাঁর ভাষা মুখের ভাষার নিকটস্থ ছিল। ২৩, ২৪, ২৫-তম রেখাচিত্র থেকে এই তথ্যই প্রমাণিত হয়।



[কিন্তু .....হজম করে উঠতে পারে নি।]

বিনয় সরকারের বৈঠকে (প্রথম খণ্ড) (পৃষ্ঠা:- ২৬)

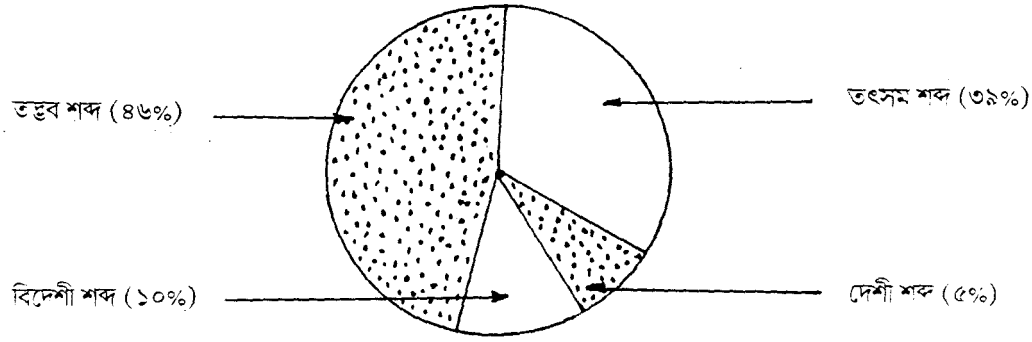
রেখাচিত্র - ২৩



[যদি এমন লোক ..... সমর্পণ করি।]

বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা (পৃষ্ঠা:-১৫)

রেখাচিত্র - ২৪



["তাঁরা গবর্ম্মেণ্টের কাছে .....কপটতা আছে"।]

সাধনা (পৃষ্ঠা ঃ ৮৫)

রেখাচিত্র -২৫

২৩-তম রেখাচিত্রে তৎসম শব্দ, ২৪-তম ও ২৫-তম রেখাচিত্রের তুলনায় কম ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ইত্যাদি শব্দও একত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে ২৪-তম ও ২৫-তম রেখাচিত্রের তুলনায়। ২৩-তম রেখাচিত্রটি "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থ থেকে করা হয়েছে। এখানে অধ্যাপক সরকারের ভাষার স্বভাব—বৈঠকী মেজাজের। আলাপ আলোচনার ভাষা জটিল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশী, বিদেশী ইত্যাদি সব রকম শব্দের ব্যবহারে—ভাষা স্বচ্ছন্দ ও colloqual হয়। লেখার ভাষা মুখের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র থাকে। তৎসম শব্দ—লেখার ভাষায় বেশী ব্যবহৃত হয়। ২৩-তম রেখাচিত্রটি যেহেতু কথোপকথন-মূলক গ্রন্থ থেকে করা হয়েছে, সেহেতু এখানে তৎসম শব্দ কম ব্যবহৃত হয়েছে। ২৪-তম ও ২৫-তম রেখাচিত্র দুটি তাঁর লিখিত চলিতগদ্য যথাক্রমে—"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" ও "সাধনা" থেকে করা হয়েছে। এই কারণে তৎসম শব্দের পরিমান ২৩-তম রেখাচিত্রের তুলনায় বেশী হয়েছে। একই কারণে দেশী, বিদেশী শব্দও কিছু কম ব্যবহৃত হয়েছে ২৩-তম রেখাচিত্রের তুলনায়। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের ওঠানামা বা Fluctuation লক্ষণীয়।

২৩-তম রেখাচিত্রে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য—২৬%.

২৪-তম রেখাচিত্রে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য—৩৪%

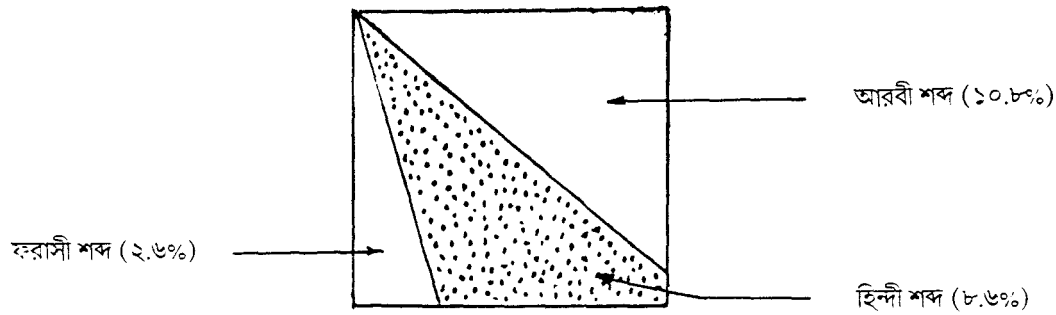
২৫-তম রেখাচিত্রে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য—৭%

২৩-তম রেখাচিত্রে, দেশী ও বিদেশী শব্দ যথাক্রমে—৮% ও ২২%

২৪-তম রেখাচিত্রে, দেশী ও বিদেশী শব্দ যথাক্রমে—২% ও ৮%

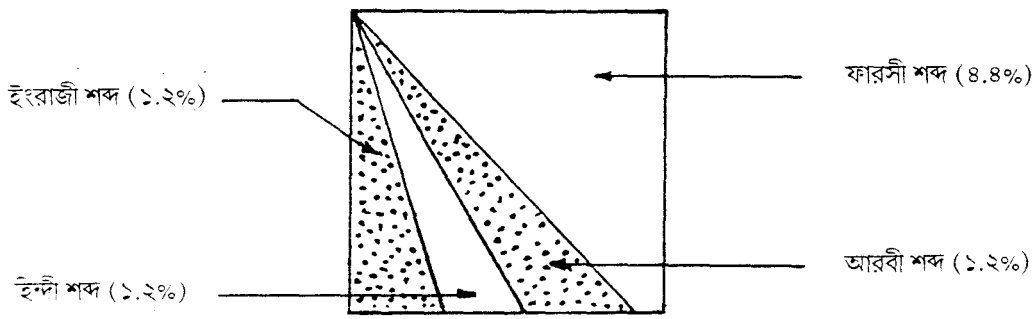
২৫-তম রেখাচিত্রে, দেশী ও বিদেশী শব্দ যথাক্রমে—৫% ও ১০%

অর্থাৎ ২৩-তম রেখাচিত্রে দেখা যায়, দেশী শব্দের পরিমাণ ২৪-তম ও ২৫-তম রেখাচিত্রের তুলনায় যথাক্রমে ৬% ও ৩% বেশী। আবার বিদেশী শব্দের পরিমাণ, ২৪-তম ও ২৫-তম রেখাচিত্রের তুলনায় যথাক্রমে ১৪% এবং ১২% বেশী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, লিখিত চলিত গদ্যের তুলনায় কথোপকথনমূলক গ্রন্থে— দেশী, বিদেশী শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।



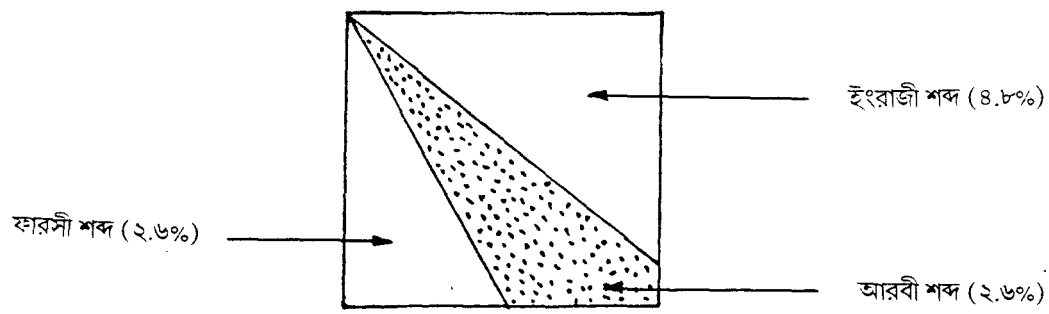
[কিন্তু .....হজম করে উঠতে পারেনি।]

বিনয় সরকারের বৈঠকে (প্রথম খণ্ড) (পৃষ্ঠা :- ২৬) রেখাচিত্র - ২৬



[যদি এমন ..... মনপ্রাণ সমর্পণ করি।]

বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা (পৃষ্ঠা :- ১৫) রেখাচিত্র - ২৭



["তাঁরা গবর্ম্মেণ্টের কাছে .....আছে।"]

সাধনা (পৃষ্ঠা :-৮৫) রেখাচিত্র - ২৮

বিদেশী শব্দচয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিনয় সরকার আরবী, ফারসী, ইংরাজী, হিন্দী, সিন্ধী ইত্যাদি সব রকমের শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এর মধ্যেও কম-বেশী আছে। রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

২৬-তম রেখাচিত্রে—আরবী ১০.৮%, হিন্দী ৮.৬% এবং ফারসী ২.৬%; ২৭-তম রেখাচিত্রে—আরবী ১.২%, ফারসী ৪.৪%, ইংরাজী ১.২%, হিন্দী ১.২%; ২৮-তম রেখাচিত্রে— ইংরাজী ৪.৮%, ফারসী ২.৬%, আরবী ২.৬% শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশী শব্দের মধ্যে বিনয় সরকার সব জায়গাতেই আরবী ও ফারসী শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন।

সংখ্যাতাত্ত্বিক কতগুলি গ্রাফের সাহায্যে বিনয় সরকারের চলিত গদ্যের স্টাইল বিচারে দেখা যায় যে—তিনি সাধারণত ছোটবাক্যই বেশী ব্যবহৃত করেছেন। তবে মাঝে মাঝে দীর্ঘবাক্যও নির্মান করেছেন। তাঁর অনুচ্ছেদগুলি একই মাপের বাক্য দ্বারা গঠিত হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—তিনি চলিত গদ্যে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যে তাঁর পূর্বে কোন সাহিত্যিক এমন সাহসিকতা দেখান নি। তৎসম, তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশী, বিদেশী শব্দের মিল ঘটিয়েছেন। এই গুরুচন্ডালি দোষকে তিনি শব্দের দিক থেকে গুণ বলে মনে করতেন। আচার্য সরকারের বাংলা গদ্যশৈলীর মূলে তাঁর একটি নিজস্ব চিন্তাধারা বা মেজাজ ছিল এবং সচেতনভাবেই তা তিনি অনুসরণ বা প্রয়োগ করেছেন—একথা তিনি নিজেই নানাস্থানে বলেছেন।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. A. Q. Morton, Graphs to Detect the Identity of Classical Authors, December 2, 1965.

২. নবেন্দু সেন, বাংলা গদ্য: স্টাইলিস্টিকস্, পৃঃ ৩।

।। গ ।। বাক্যবিনাস পদ্ধতি—গুরুচণ্ডালী সমর্থন

লেখার ভাষায় দুটি ছাঁদ প্রচলিত। একটি ছাঁদের নাম 'সাধুভাষা' আর একটির নাম 'চলিত ভাষা'। রামমোহন লিখেছিলেন ঃ "- - - **বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহই ইহাতে মনোযোগের ন্যুনতম করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহার ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।**" [১]

এই আলাপের ভাষা হচ্ছে 'চলিত ভাষা'। সাধুভাষার সঙ্গে জীবনের যোগ অতি অল্প এবং তা সর্বসাধারণের জন্য নয়। যে ভাষার সঙ্গে মাটির যোগ আছে, মাটির মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত—সেইরকম একটি সহজতর প্রকাশের মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন লেখক-সাহিত্যিকরা। চলিত ভাষাই হল সেই মাধ্যম। রাঢ়ী উপভাষার যে শিল্পসম্মত রূপটি বাংলাদেশে প্রচলিত তাকেই চলিত ভাষা বলে।

গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগে এই চলিত ভাষার রূপ লক্ষিত হয়। 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫ খৃঃ), 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১ খৃঃ), 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খৃঃ), 'বাবু' (১৮৫০ খৃঃ), 'আলালের ঘরের দুলাল', (১৯৫৮ খৃঃ), 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ইত্যাদি গ্রন্থে—চলিত ভাষার form দেখা যায়। তবে চলিতরীতিকে প্রথম সাহিত্যিক সম্মান দেন বিবেকানন্দ। এর এক দশক পরে প্রমথ চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় চলিতরীতিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বেগবতী ধারাপথেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিনয়কুমার সরকার উপেক্ষিত। চলিত ভাষায় তাঁর গদ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে তিনি একটি বিশিষ্ট বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টা। তাঁর চলিতগদ্যে অসামান্য দান সম্পর্কে আলোচনাই হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তাঁর রচনায় চলিতরীতির বিশিষ্টতা—ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের হ্রস্বীকরণ। তাঁর চলিতরীতিতে সর্বনাম বাচক রূপ যেমন—'আমার', 'আমাদের', 'তার', 'তাদের', 'যার', 'যাদের', 'যা', 'যাকে', 'তাকে', 'তাদের' ইত্যাদি পদের ব্যবহার লক্ষিত হয়। সাধু ও চলিতের পার্থক্য—ক্রিয়াপদের প্রয়োগে সবচেয়ে বেশী লক্ষিত হয়। ক্রিয়ার বহুলতা আচার্য সরকারের চলিত গদ্যের মধ্যে স্পষ্টতা ও শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাঁর চলিত গদ্যে রচিত গ্রন্থগুলি হল—'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা', 'সাধনা', 'আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র', 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম ও ২য় খন্ড) ইত্যাদি। তাঁর চলিত ভাষায় ক্রিয়ার রূপের নিদর্শন—

'হ' ধাতু—

(১) মৌলিক কাল—

ক) নিত্য বর্তমান—হই, হও।

খ) নিত্য অতীত—হ'লাম, হ'লে, হ'ল।

গ) পুরানিত্যবৃত্ত—হ'তাম, হ'তে, হ'ত, হ'তিস্।

ঘ) সাধারণ ভবিষ্যৎ—হ'ব, হ'বে।

(২) যৌগিক কাল—

ক) ঘটমান বর্তমান—হ'চ্ছি, হচ্চি।

খ) ঘটমান অতীত—হচ্ছিলাম, হ'চ্ছিলে।

গ) ঘটমান ভবিষ্যৎ—হ'তে থাকব।

ঘ) পুরাঘটিত বর্তমান—হ'য়েছ।

ঙ) পুরাঘটিত অতীত—হ'য়েছিলে।

চ) সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ—হ'য়ে থাকব।

(৩) অনুজ্ঞা—

ক) সাধারণ—হও, হ, হ'ন, হ'ব।

খ) ভবিষ্যৎ—হ'স্

গ) অসমাপিকা ইত্যাদি—হ'য়ে, হবা মাত্র ইত্যাদি।

'ছি'-প্রত্যয় যোগে 'কর্' ধাতু, অনেক রূপ ধারণ করে। কিন্তু বিনয় সরকারের গ্রন্থে এত রূপ লক্ষিত হয় না। তাঁর গ্রন্থে 'ছি' যুক্ত হয়ে 'কর্'-ধাতুর রূপের কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

'কর্ছি', 'ক'রছি', 'করছি', 'করছি'।

ঘটমান বর্তমান কালে 'চ্ছ' স্থানে 'চ্চ'-এর ব্যবহার 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' গ্রন্থে দেখা যায়। যেমন—'হচ্চে', 'যাচ্চে' ইত্যাদি। 'তুলল' স্থানে 'তুল্ল', 'চলল' স্থানে 'চল্ল'—এ ধরণের প্রয়োগ 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' ও 'সাধনা' গ্রন্থে করেছেন। চলিতভাষায় 'লাম', 'লেম', 'লুম'—এই তিনটি রূপ লক্ষিত হয়। তবে আচার্য সরকারের গ্রন্থে 'লাম'—এই রূপ ছাড়া আর কোন রূপ দেখা যায় না। দেশী শব্দ দিয়ে ক্রিয়ার রূপ তৈরী করা তাঁর লেখার একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন—'সমঝিতে', 'সমঝিছে', 'সমঝিল', 'সমঝিলি', 'ঢুঁড়া', 'ঢুঁড়িস্', 'ঢুঁড়েছে', 'ঢুঁড়তে', 'ঢুঁড়ল', 'পুছে', 'পুছতে', 'গাড়ো' ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়াপদের প্রয়োগে তাঁর গদ্য সহজ, সরস হয়েছে।

এই ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যই চলিত ভাষার সব কিছু নয়। **"The calit Bhasa provides the closer approximation to the spoken language, but still it is a style of written Bengali, and therfore, must not be equated with spoken language."** [২] বিনয় সরকার তাঁর চলিত গদ্যে এই 'closer approximation' এনেছেন। শব্দভান্ডার ও বাক্যরীতি নিয়ে গঠিত হয় চলিতরীতি। অর্থাৎ বিনয় সরকারের চলিতভাষার 'Rhetorical' বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা প্রয়োজন। চলিতগদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য শব্দযোজনায়। চলিতরীতির শব্দ উপাদান সম্বন্ধে আচার্য সরকার সচেতন ছিলেন। সরকারী গদ্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য হল—**"সাধু শব্দের সঙ্গে গ্রাম্য, মেঠো, চলতি শব্দের সংমিশ্রণ অর্থাৎ গুরুচন্ডালির সজ্ঞান প্রয়োগ।"** [৩] **"ভাব সঠিকভাবে এবং সজোরে প্রকাশের জন্য যে ভাষা প্রয়োজন সে ভাষাই তাঁর মুখে আসত; মুখের ভাষা ও কলমের ভাষার মধ্যে কোনো তারতম্য রাখার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করতেন না।"** [৪] উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কৃত হবে।

'আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র' গ্রন্থে ঃ—

"আমরা ১৯০৫-কে এই হিন্দু হষ্টেলেই পায়দা করেছি।" (পৃঃ ২)

"ছোঁড়া বড় ত্যাঁদড় হয়েছে"। (পৃঃ ৪)

"আধ্যাত্মিক লওয়াই কিছু বেড়িয়েছে"। (পৃঃ ৪)

"সকল বিষয়েই বেয়াড়ামি ও ত্যাঁদড়ামি আমার ছিল"। (পৃঃ ৫)

"আমি জোর্সে তার উল্টো বলছি"। (পৃঃ ৬)

"আসনে বসে হামেশা পা দোলাতে থাকে"। (পৃঃ ১০)

"- - -যা কিছু বলেছি সবই আহাম্মুকি"। (পৃঃ ১৪)

"তোফা বাড়ী, তোফা ঘর - - - "। (পৃঃ ১৫)

"- - -সব চোস্ত দুরস্ত।" (পৃঃ ১৫)

"কর্মদক্ষতা হিসাবে, জীবনের কিম্বৎ হিসাবে- - - বাঙালীতে আর ইংরেজেও সেই সম্বন্ধ"। (পৃঃ ২৯)

"- - -নিক্তির ওজনে কথা বলছি না, ধারে-ধোরে এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের সম্বন্ধ বুঝতে চেষ্টা করছি মাত্র"। (পৃঃ ২৯)

"শূন্যগুলার মূল্য অনেক সময় এক দামড়িও না হতে পারে"। (পৃঃ ৩০)

"তা জানবার জন্য জাপানের লোক মোতায়েন আছে।" (পৃঃ ৩৫)

"পয়লা নম্বরের গন্ড-গন্ডা লোক গড়ে তোলবার সুযোগ নাই।" (পৃঃ ৩৬)

"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" গ্রন্থে ঃ—

"কেঠো নীরস ধারণা মাত্র।" (পৃঃ ৯)

"- - -পশার আছে বা খোসামোদী ও মুরুব্বির জোর আছে- - -।" (পৃঃ ১৫)

"- - -অকিঞ্চিৎকর পদার্থ লইয়া এত যুঝাযুঝি করি?" (পৃঃ ৩২)

'সাধনা' গ্রন্থে ঃ—

"মহম্মদের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কর্ম্মী, ধুরন্ধর, ঐক্যপ্রতিষ্ঠাতা।" (পৃঃ ৫৬)

"মুরুব্বিয়ানা ক'রে এ জেলাকে কোন বিষয়ে নীচ বলা যায় না।" (পৃঃ ৫৬)

"বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম খন্ড) গ্রন্থে ঃ—

"ভাবপ্রবণ বাঙ্‌লা দেশে ধর্মের নামে নানারকম হেঁয়ালি আর বুজরুকি চল্‌ছে।" (পৃঃ ৩)

"দুনিয়ায় নতুন-কিছু খাড়া করা।" (পৃঃ ৩)

"বাজারে আমাকে আহাম্মুক, মুখখু, গরু সমঝিতে অভ্যস্ত।" (পৃঃ ৫)

"বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সকল স্বামীরা মোতায়েন আছেন - - -প্রচারক।" (পৃঃ ৭)

"তাঁরা হরদম্ সময়মাফিক কর্তব্য করে চলেছেন।" (পৃঃ ৭)

"এসব পার্থক্যের কোন কোন চিহ্নোৎ - - - দেখতে পাই।" (পৃঃ ৮)

"নতুন-নতুন মাল দিয়েছেন।" (পৃঃ ৮)

"রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বাড়তির পথে চলেছে।" (পৃঃ ৯)

"কম্-সে-কম্ সেই দশবছরের জীবনকথা।" (পৃঃ ১১)

"আমার বক্তব্যগুলো বেয়াড়া রকমের।" (পৃঃ ১৩)

"তাঁর গবেষণার কিম্বৎ একমাত্র ঐতিহাসিক।" (পৃঃ ১৭)

"সতীশবাবুর চেলা হিসাবে আমরাও তার প্রতি ভক্তি হারাই নি।" (পৃঃ ১৯)

"স্বদেশীযুগে ব্রজেন শীল সম্বন্ধে আমার কি ধারণা ছিল, তা গৃহস্থ পত্রিকায় আর বিশ্বশক্তি বইয়ে খোদা আছে।" (পৃঃ ১৯)

"তোবা-তোবা করবি, কানে হাত দিয়ে বসবি- - -ইচ্ছা করবে না।" (পৃঃ ২)

"তাঁকে দার্শনিক সপ্রমাণ করা, বোধ হয়, গা-জুরি।" (পৃঃ ২০)

"- - -ইজ্জৎও বাড়বে না।" (পৃঃ ২০)

"- - -তা আমি ভাল করে খুঁটে দেখেছি।" (পৃঃ ২১)

"- - -বিশেষভাবে ভারতের প্রত্নতত্ত্বই গুলজার।" (পৃঃ ২২)

"- - -নিজ চিন্তার কুদরতি মাল রূপে ব্যবহার করে।" (পৃঃ ২৩)

"- - -আমি দর্শনে আর বিজ্ঞানে একপ্রকার কোনো ফারাক দেখি না।" (পৃঃ ২৪)

"ঝগড়া, কোঁদল, আড়াআড়ি, ঠক্কর, প্রতিহিংসা ইত্যাদি মনোবৃত্তির মূল্য দিতে অভ্যস্ত - - সমীচীন।" (পৃঃ ২৪)

"ভেতরকার মুদ্দাটা বিলকুল প্রাচীন ভারতীয় মাল।" (পৃঃ ২৯)

"ডাইভোর্সের বিরুদ্ধে পাঁতি দিয়েছেন।" (পৃঃ ২৯)

"তার জন্য চাই নয়া-নয়া গবেষক।" (পৃঃ ৩৪)

"করাচিতে সবই যেন তাজা, নয়া, জোআন।" (পৃঃ ৫৪৭)

"- - -নয়া-নয়া মহাল্লার কথা বলছি।" (পৃঃ ৫৪৭)

"- - -আপনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি জিনিষের সঙ্গে হামদর্দ্দি দেখাচ্ছেন।" (পৃঃ ৫৫৬)

"- - -লেখাপড়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়।" (পৃঃ ৫৪০)

"নিজেকে অবশ্য এখনো চ্যাংড়াই ভাবি।" (পৃঃ ৫৪১)

"এ সবের নূতনত্ব আর কিছু মালুম হবে না।" (পৃঃ ৫৩৯)

"- - -তাই তাদের কাছে বেআকুবি বিবেচিত হবে।" (পৃঃ ৫৩৯)

"যারা সরকারী চাক্‌রে নয়, তাদের চোখে বিবেকানন্দ সাহিত্য বিলকুল আলাদা চিজ্।" (পৃঃ ৫৩২)

"আমার মতটা পছন্দ করছে কিনা চোপর দিনরাত ভাবতে হবে তাই।" (পৃঃ ৫১৯)

"- - -সকলেই কট্টর দেশভক্ত।" (পৃঃ ৫০৫)

"তারা ইস্কুল ছাড়বার পর ফরাসী ভাষার সঙ্গে মোলাকাৎ খুব কমই করে।" (পৃঃ ৪৯৯)

"আন্তর্মানুষিক সম্বন্ধ ছাড়া কোনো লোক কল্পনা করা অসম্ভব।" (পৃঃ ৪৬৮)

"জুতা না থাকে— কুছপরোয়া নাই।" (পৃঃ ২৯)

"অধিকন্তু পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা কতগুলা কথা কপচায় মাত্র।" (পৃঃ ৩৪১)

"এ কথা সোজাসুজি বলতেও তিনি কসুর করেননি।" (পৃঃ ৩৩৭)

"প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাঁর মেজাজ-মাফিক ছিল বুঝা গেল।" (পৃঃ ৩৫০)

"পা রাখার ঠাঁই ঢুঁড়ে পাওয়া যাবে না।" (পৃঃ ২১৭)

"পাঠককে মেহনৎ করে খুঁজে বের করে নিতে হয়।" (পৃঃ ২১৫)

"ভাগবত জীবনকে পাকড়াও করতে হলে - - -জুতোতে।" (পৃঃ ৪৩)

আচার্য সরকার সাধু, চলিত শব্দের সঙ্গে হিন্দী, উর্দু, আরবী, ফার্সী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে অনেক জোরালো বাক্য গঠন করেছেন—উপর্যুক্ত উদাহরণগুলি তার প্রমাণ। কথ্যরীতি ও লেখ্যরীতি অভিন্ন হয়েছে—এই শব্দগুলি প্রয়োগের জন্য। তাঁর রচনায় কথ্যরীতির ঢঙ লক্ষ্য করা যায় ইডিয়ম প্রয়োগে। কিছু উদাহরণ নিচে সংকলিত হল ঃ—

"**আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র**" গ্রন্থে ঃ—

"**আলগা ঝোল** খেয়ে মানুষ হয়েছে"। (পৃঃ ১)

"**আধ্যাত্মিক দাওয়াই** কিছু বেড়িয়েছে"। (পৃঃ ৯৩)

"বর্তমান ভারতে কয়জন আছেন **বাপ-কা-বেটা**।" (পৃঃ ৩৩)

"জীবনটাকে **হরদম তাজা করে** তুলছে।" (পৃঃ ৩৫)

"এই হচ্ছে **জ্যান্ত জাতের** জীবন সাধনা।" (পৃঃ ৩৫)

"**বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা**" গ্রন্থে ঃ—

"বিনা পয়সায় পরামর্শ **চুপড়ির ভিতর ফেলিয়া** দিলে....."। (পৃঃ ৩)

"**ফ্যাল-ফ্যাল** করে ঘুরে না বেড়ায়"। (পৃঃ ১৫)

"রজ্জুত্ব প্রাপ্ত তৃণ **দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধা** হচ্ছে।" (পৃঃ ২৩)

'**সাধনা**' গ্রন্থে ঃ—

"ফাঁকি দেবার **চুলচেরা বুদ্ধি**"। (পৃঃ ৬৩)

"মহাত্মারা **দ্বীপের ন্যায় আলগা ভাবে ভেসে** বেড়ায়।" (পৃঃ ৭৫)

"নিজের **মনের ভাবটাকে একটু পাকতে** দিলেই....."। (পৃঃ ৭৮)

"**জোড়াতালি দিয়ে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে** চেষ্টা করি।" (পৃঃ ৭৯)

"যে কাপুরুষ সে **শুকনা ড্যাঙ্গায়ই আছাড় খায়**।" (পৃঃ ৮১)

"**পরের কাঁধে চড়ে বড় হতে চায়**।" (পৃঃ ৮১)

"যাতনা ভোগ করতে পারলে **স্বর্গরাজ্যে মন্দিরচূড়া** দৃষ্টিগোচর হবে।" (পৃঃ ৯২)

'**বিনয় সরকারের বৈঠকে**' (১ম খন্ড) গ্রন্থে ঃ—

"এ সমস্তের **কিস্মৎ কোনো কোনো সময়ে লাখ টাকা**"। (পৃঃ ১৫)

"উড়ু-উড়ু ভাবে জানতো।" (পৃঃ ১৫)

"- - -প্রকাশ পায় একমাত্র তার নিজ মুড়োর ঘি।" (পৃঃ ২৩)

"তাদের মগজে ঘির অভাব যৎপরোনাস্তি।" (পৃঃ ২৪)

"আধ্যাত্মিক শব্দটাতে গুড় মাখানো নেই।" (পৃঃ ২৫)

"বেড়ে বই" (পৃঃ ২৮)

"স্বাধীন মগজ" (পৃঃ ৩১)

"ভাগবত জীবনকে পাকড়াও করতে হলে মানুষের চলতে হয় অশান্তি চাখতে-চাখতে, টক্করের পর টক্কর চালিয়ে—দুনিয়াখানাকে জুতোতে-জুতোতে।" (পৃঃ ৪৩)

"তাঁদের কাজ ও কথা কাপে-কাপে মিল্‌লো কিনা।" (পৃঃ ৭)

"বাঙালীর-বাচ্চা, "বাপ-কা-বেটা বলে দেখাবি।" (পৃঃ ৬)

"- - -ফ্রয়েডের গন্ডুষ করে সকলেই।" (পৃঃ ৫২)

"মানুষ হাড়ে-হাড়ে বস্তু-নিষ্ট।" (পৃঃ ৫৭)

"আমি দুমুখো ছুরি।" (পৃঃ ৭২)

"প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন নিয়ে সত্তদা করেন সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ১০৩)

"বাঙালী লেখকের রচনা কৌশল দেখে হাত-মক্‌স করা উচিত।" (পৃঃ ১০৮)

"চালাও, বাবা, পাটনাই বজরা।" (পৃঃ ১০৯)

" লোকজনের সঙ্গে বুক চেঁড়ে মাতামাতি করতে পেরেছি।" (পৃঃ ২১৭)

"- - -টনটনে জ্ঞান সর্বদাই ছিল।" (পৃঃ ২২১)

"ভাসাভাসাভাবে দেখ্‌লে।" (পৃঃ ২২৯)

"- - - চোখে ছানা বড়া লেগে যায়।" (পৃঃ ৫২২)

"অনেক ঘোঁট মঙ্গলের মাম্‌লা।" (পৃঃ ৪৭৬)

"মুড়োওয়ালা মানুষ।" (পৃঃ ৪৬৮)

"বিশ্বশক্তির বেপারীরা আজকের ভারতীয় মেজাজটা ছুঁয়ে জীবন চালাতে অভ্যস্ত।" (পৃঃ ৪৪১)

"একালের অনেক হোমরা-চোমরাকেই ১৯৮০ সনের ছোকরারা নকড়া-ছকড়া ভাববে।" (পৃঃ ৪৩৪)

"এ চিজ্‌টা দাঁড়িয়ে যাবে ভাল-ভাত খাবার মতন।" (পৃঃ ৪৩৩)

"বাংলা ভাষার সুরৎ যারপরনাই বদলাবে।" (পৃঃ ৪৩০)

"উন সোসাইটিকে বঙ্গবিপ্লবের একমাত্র কেন্দ্র বা 'আঁতুড়-ঘর সমঝে' রাখা ঠিক হবে না।" (পৃঃ ৩০৭)

"মগজটা চাঁছা-ছোলা ও কর্মঠ।" (পৃঃ ১৫১)

"বাপের **শাসন ছিল টক্করবিহীন।**" (পৃঃ ৪৫৬)

"সমাজতন্ত্রের **ঝাঁঝাল-মগজ** নিয়ে কেশব লেন বাংলায় ফিরে এসেছিলেন।" (পৃঃ ৩৯৫)

"মগজটা ছিল ভারী ধারালো।" (পৃঃ ২৯০)

"বোলচাল **ঝেড়ে** জীবন কাটাতে হবে।" (পৃঃ ৫১)

"**বিনয় সরকারের বৈঠকে**" (২য় খন্ড) গ্রন্থে ঃ—

"কড়া পাকের সমাজ সমালোচক" (পৃঃ ১১৩)

"পাঁড় দেশ সংস্কারক" (পৃঃ ১১৩)

"বেড়ে মজা" (পৃঃ ১১২)

"পটল তুলেছে" (পৃঃ ১১৭)

"লাজলজ্জার **মাথা খাওয়া** তাদের কাছে **মুড়ি-মুড়কি** মাত্র"। (পৃঃ ২১০)

এই সকল ইডিয়মগুলির প্রয়োগে সরকারী চলিত গদ্যে ক্ষিপ্রতা ও লঘুতা এসেছে। ইডিয়ম ব্যবহারে ভাষার মধ্যে স্পষ্টতা এসেছে। তাঁর ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এই ইডিয়মগুলি প্রয়োগ করে। কারণ **"ইডিয়ম ভাষার অলংকার বিশেষ। যে ভাষায় যত বেশী ইডিয়ম, সেই ভাষা তত বেশী সমৃদ্ধ।"** [৫]

চলিত ভাষায় রাগ বা flair, প্রকৃতপক্ষে ভাষার বৈশিষ্ট্য। 'আলালী' ভাষায় এবং 'হুতোমে'র ভাষায় এই স্বভাবের লক্ষণ দেখা যায়। বিনয় সরকার তাঁর প্রচলিত গদ্যে—মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও নিয়েছিলেন। তাঁর শব্দগুলির বা ভাষার স্বভাব ও চেহারা চলিতমুখীন ছিল। যেমন—

'আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র' গ্রন্থে—

"মায় কুজো ছুঁড়ে লড়াই পর্যন্ত" (পৃঃ ২)

"ছোঁড়াগুলা বেয়াড়া" (পৃঃ ৩)

"লোকটা বখে গেছে" (পৃঃ ৫)

"বেয়াড়ামি ও ত্যাঁদড়ামি আমার ছিল" (পৃঃ ৫)

"যা পারিস বকে যা" (পৃঃ ৬)

"পেলেই বর্ত্তে যাই" (পৃঃ ৬)

"উল্টো বল্লাম" (পৃঃ ৭২)

"নাইবার বেলা হল" (পৃঃ ৮)

"যখন তখন আঙ্গুল মটকায়" (পৃঃ ১০)

"গড়ে তুল্লেও তুলতে পারে" (পৃঃ ১১)

"সব ভেঙ্গেচুরে" (পৃঃ ১৩)

"প্রমাণ আর কি চাও, বাবা?" (পৃঃ ২১)

"বিদেশফেরতা লোক" (পৃঃ ৩১)

"সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে" (পৃঃ ২৯)।

"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" গ্রন্থে—

'হচ্চে' (পৃঃ ২৩), 'চলাফিরা' (পৃঃ ৩৬)

"সাধনা" গ্রন্থে ঃ—

"শুকনা ড্যাঙ্গায়" (পৃঃ ৮১)

"খুটো দিয়ে খাড়া করে রাখতে হয় না" (পৃঃ ৮১)

"হুজুগ দুদশ দিনের" (পৃঃ ৮৩)

"কাজে নাব্‌তে হবে" (পৃঃ ৯০)।

"বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম খন্ড) গ্রন্থে ঃ—'যাচ্চলে' (পৃঃ ৯১), 'মন্তর' (পৃঃ ৪২), 'মুখখু' (পৃঃ ৮৪), "মহচ্ছোবের হিড়িকে" (পৃঃ ২৭১), 'মেলমেশ' (পৃঃ ২৭৪), 'কায়েথ' (পৃঃ ৩৬৫), "কছরত" (পৃঃ ৩৬৪), 'এরি' (পৃঃ ৩৬৬), 'তক্কাতক্কি' (পৃঃ ৫২৯), "হ্যাটুআরা" (পৃঃ ৭৩৬), 'চিরকেলে' (পৃঃ ৬৮৬), 'নকড়া-ছকড়া' (পৃঃ ৪৩৪), 'বুঝি-টুঝি না" (পৃঃ ৩৫৮), "কথা কপচায়" (পৃঃ ৩৪১), 'চাক্‌রে' (পৃঃ ৩৬২), "মায় সুন্দর দেখাবে? অ্যাঁ?", "আনা ছয়েক মাল" (পৃঃ ৩৮৯), 'বুঝে-সুজে না' (পৃঃ ৪৭৯), "আসল ধান্ধা" (পৃঃ ৪৮০), "সহানুভূতি-ঠহানুভূতি" (পৃঃ ৪৯৫), "হাঁই-ফাই হাঁই-ফাই করে" (পৃঃ ৫০৫), "কোঁদল" (পৃঃ ৫০৩), "নিন্দা-চুগলির" (পৃঃ ৫০৫), "দেখবা-মাত্র তাক্‌লেগে গিয়েছিল" (পৃঃ ৫৩০), 'চুমড়ে নেওয়া সোজা নয়" (পৃঃ ৫৩১), "কেজো লোকেরা" (পৃঃ ৫৩২), "গর্ত্তে-ঠর্ত্তে" (পৃঃ ৬২০), "নল-নল্‌চে" (পৃঃ ৬২), "ছিকেয় তুলে" (পৃঃ ২৯), "নায়" (পৃঃ ১৪৮), 'গেরস্থালি' (পৃঃ ১৫১), 'হেঁশেল' (পৃঃ ১৫২), 'মুখখুমি' (পৃঃ ১৫৪), 'মাত্ হয়ে" (পৃঃ ২১১), "ভাঙা-চুরা" (পৃঃ ২১২), "পারিত্-পক্ষে" (পৃঃ ২২৩), "কোথ্-থেকে" (পৃঃ ২৭৮), "আগাগাছা" (পৃঃ ২৯৭), 'ভাগ্‌না' (পৃঃ ৪১২), 'শূদ্দুর', 'পষ্টাপষ্টি' (পৃঃ ৫১২)।

"বিনয় সরকারের বৈঠকে" (২য় খন্ড) গ্রন্থে ঃ—'পাকা-পোক্ত' (পৃঃ ১০), 'জ্বলজ্যান্তো' (পৃঃ ২৫), 'টেনেবুনে' (পৃঃ ২৭), 'হরেদরে' (পৃঃ ২৭), 'বাড়তি-পড়তি' (পৃঃ ২৭), 'লুকিয়ে-চুরিয়ে' (পৃঃ ৩২), 'গতর' (পৃঃ ৮৩), 'মাথাচেঁড়ে' (পৃঃ ১০০), 'চেয়ে-মেয়ে' (পৃঃ ১৩৫), 'খায়-দায়' (পৃঃ ১৪৭), 'নকড়া-ছকড়া' (পৃঃ ২০৭), 'মেলমেশ' (পৃঃ ২১০), 'আষ্টেক' (পৃঃ ৫২৭), 'ধুম-ধাড়াক্কা' (পৃঃ ৩৬), 'পেকা-মাকড়' (পৃঃ ৪০৩), 'গলিঘোঁচ' (পৃঃ ১১৪), 'রহস্য-টহস্য' (পৃঃ ৩৮), 'ঘটে-ঠটে' (পৃঃ ৩৯৭)।

এই সকল শব্দ বা শব্দ-গুচ্ছ দ্বারা সরকারী চলিত গদ্যে কথ্যধর্ম রক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর চলিত ভাষা শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের স্বাতন্ত্র্যেই সব কিছু নয়। ঘরের আটপৌরে ভাষার প্রয়োগ করে তিনি তাঁর চলিতরীতিতে এক অভূতপূর্ব প্রাণসঞ্চার করছেন।

বাক্যগঠনরীতিতে দেখা যায়, বৃহৎ বাক্যের থেকে সরল বাক্যগঠনের প্রতি ঝোঁক বেশী। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত হল—"আমি চাই পাঁচ-সাত-দশ শব্দের বাক্য। লম্বায়-চওড়ায় আমি বেশ কিছু ভয় পাই।" নবম অধ্যায়ের 'খ' অংশে ডায়াগ্রাম এবং গ্রাফের সাহায্যে তাঁর রচনায় বাক্যের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, তাঁর প্রবণতা ছোট বাক্যের প্রতি। বিনয় সরকারের চলিত রীতির সবচেয়ে স্পষ্ট-ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—বাক্যে ক্রিয়াপদের বিপর্যাস বা inversion । এই inversion -এর দৃষ্টান্ত তাঁর চলিত গদ্যে স্পষ্ট। যেমন—

"**আর্থিক উন্নতির যুক্তিশাস্ত্র**" গ্রন্থে—

"আলগা ঝোল খেয়ে মানুষ হয়েছে বাংলাদেশের লোক।" (পৃঃ ১)

"আমার বক্তব্য হচ্ছে ত্যাঁদড়ামি।" (পৃঃ ৬)

"যাত্রী হচ্ছেন গড্ডালিকা প্রবাহের বৈদান্তিক বা সনাতনপন্থী দার্শনিক।" (পৃঃ ৮)

"আমার রক্তমাংস বলছে যে, আমার হাড়গোড় বদলে যাবার জন্যই তার জন্ম।" (পৃঃ ৯)

"- - -স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি যে জনকেন্দ্রে বেড়ে যায়, তারই নাম কলিকাতা।" (পৃঃ ১৬)

"প্রমাণিত হয় ঠিক উল্টো।" (পৃঃ ২১)

"- - -বিদেশে যায়নি একথা সত্য।" (পৃঃ ৩১)

"এই হচ্ছে জ্যান্ত-জাতের জীবন সাধনা।" (পৃঃ ৩৫)

"গাড়ো আড্ডা বিদেশে"। (পৃঃ ৩৭)

"**বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা**" গ্রন্থে ঃ—

" - - - কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে - - -স্বদেশী প্রচারে জন্য"। (পৃঃ ২১)

"- - -ভাঙ্গা হয় সেই শক্তিতে"। (পৃঃ ৩৮)

"নিয়ম পালন করতে হয় আরও কঠোর"। (পৃঃ ৪০)

"**সাধনা**" গ্রন্থে ঃ—

" দেশবাসী বল্লে আমি এইসব লোকই বুঝি - - -তারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের লোক।" (পৃঃ ৫৮)

"কপটতা থাকবে তা'ত নিশ্চয়ই"। (পৃঃ ৬৮)

"**বিনয় সরকারের বৈঠকে**" **(১ম খন্ড)** গ্রন্থে ঃ—

"- - -বিদেশ হতে আসে বিনা পয়সায়"। (পৃঃ ১১১)

"এই ধরণের চেলা হীরেনবাবুর হাতে বেরিয়েছে কম্-সে-কম্ পঞ্চাশ বছর"। (পৃঃ ১১৩)

"তাতেই বজায় থাকে সাহিত্যের সঙ্গে নাড়ীর যোগ"। (পৃঃ ১২৫)

"- - -হয়ে পড়বেন সমালোচক"। (পৃঃ ১২৪)

"দাম্ভিকতা মূর্তিমন্ত হয়ে দেখা দেয়—মানুষের এই অবস্থায়"। (পৃঃ ১২৭)

"কিন্তু আছে সুখে"। (পৃঃ ২০৭)

"পরমহংসদেবের বয়েৎ হচ্ছে—কাম কাঞ্চনকীর্তি বর্জ্জন।" (পৃঃ ১৯৯)

"এই কাজের জন্য চাই দল"। (পৃঃ ২৪৭)

"চাই একবগ্গা, ক্ষ্যাপা"। (পৃঃ ২৫৬)

"মগজটা ছিল ভারী ধারালো।" (পৃঃ ২৯০)

"অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে বিপ্লবের প্রাণ"। (পৃঃ ৩০৩)

"অম্‌নি জ্বলে উঠ্‌লো আগুন"। (পৃঃ ৩১১)

"এই পাঁতি-মাফিক গ'ড়ে উঠ্‌বে বা উঠ্‌ছে আমার নয়া-বাংলা"। (পৃঃ ৩৯০)

"জিজ্ঞাসা করে দেখিস্‌ একালের সার্বজনিক জ্ঞান-দা কে"। (পৃঃ ৩৯৫)

"এই ছিল ধারণা"। (পৃঃ ৪০০)

"কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে পেলাম বিলুকল আলাদা চিজ্‌।" (পৃঃ ৪০৭)

"কারবারটা দাঁড়াচ্ছে মোটের ওপর এইরূপই"। (পৃঃ ৪১৪)

"একমাত্র মুদ্দা ছিল বাংলা ভাষা, বাঙালী জাত, বাংলা দেশ"। (পৃঃ ৪৫৪)

"এখনও আছে জবরদস্ত্‌"। (পৃঃ ৪৫৭)

"- - -চুঁড়তে হবে তাঁর প্রকৃতি-নিষ্ঠায়।" (পৃঃ ৬২৩)

"রবীন্দ্র-কাব্য 'অশান্ত' রস বেঁটেছে দেদার।" (পৃঃ ৬২৩)

" চলে আঁকাবাকা পথে"। (পৃঃ ৬২৪)

" লোক বাস করতো বাঙ্‌লাদেশে"। (পৃঃ ৬৩৩)

"বিনয় সরকারের বৈঠকে" (২য় খন্ড) গ্রন্থে ঃ—

"আমি দেখি শুধু সংগ্রাম"। (পৃঃ ৩৩৬)

"আজকাল মার্কিন মুল্লুকে সোয়া ডালের সপক্ষে প্রচার চলছে জোর্‌সে"। (পৃঃ ৮৭)

"রবির গন্ধ এরা সইতে পারে অতি সামান্য"। (পৃঃ ১০৫)

"বৈষ্ণব পদাবলীর কুচো-কাচা আওড়ানো পয়সাওয়ালাদের বাতিক বিশেষ"। (পৃঃ ২০৯)

"রবি একটি মাত্র দেবতা সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে মানুষ"। (পৃঃ ২২৩)

"সাধুভাষা মাজাঘষা সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। - - - - -আমাদের দিনরাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।" [৬] বিনয় সরকার ভাষায় আটপৌরে ভাব আনতে এমন কতগুলি বেপরোয়া শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেগুলি কথ্য ভাষায় মানায় ভাল। তাঁর ভাষা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনের জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্য। **"বাংলা গদ্যের যে রীতিকে প্রমথ চৌধুরী মুখের ভাষার কাছাকাছি আনতে চেয়েছিলেন এবং যা আনলে প্রকৃত ভাষা-মুক্তি হত, তা চলিত রীতিতে এল না।"** [৭] কিন্তু বিনয় সরকারের চলিতরীতি কথ্য বাংলা হয়েছে। তাঁর ভাষা মজলিশি। **"অসাধারণ প্রাণশক্তির চাঞ্চল্যে তাঁর ভাষাতে বহু দেশজ শব্দ ও অচিন্তিতপূর্ব শব্দসমষ্টি পদে পদে চমক লাগায়।"** [৮] তিনি মুখের ভাষা ও কলমের ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখার প্রয়োজন মনে করতেন না। এজন্যই তিনি একটি বিশিষ্ট বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টা।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. বেদান্ত গ্রন্থ, ১৮১৫ দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী, ১৯৭৩, পৃঃ ৮।

২. K. S. Das, Spoken and Written & Bengali ঃ An Instance of Diglossia. [D. U]. **p. 4.**

৩. আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, (১), হরিদাস মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ চিন্তানায়ক বিনয় সরকার, ১৯৮৮, পৃঃ ৯৯।

৪. ডঃ ভবতোষ দত্ত, 'বিনয়কুমার সরকার' (প্রবন্ধ)/আচার্য বিনয়কুমার সরকার—ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ১২।

৫. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা ভাষার ভূমিকা, পরিঃ সং: ১৩৭২, পৃঃ ২৪৬।

৬. পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ৪৫৬-৬১।

৭. নবেন্দু সেন, বাংলা গদ্য : স্টাইলিস্টিকস্, ১৯৮৮, পৃঃ ১৪২।

৮. ডঃ ভবতোষ দত্ত, 'বিনয়কুমার সরকার' (প্রবন্ধ)/আচার্য বিনয়কুমার সরকার—ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ১২।

।। ঘ।। কথ্য ভাষার বিশ্লেষণ

গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগে চলিত ভাষার যে রাগ ও রূপ লক্ষিত হয়, সে সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে প্রথম ঘোষণা করেন—"লিখিত ভাষা আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়, ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়।" [১]

তবে চলিত ভাষা ও কথ্য ভাষা এক নয়। চলিত ভাষা হল একটি লিখিত রূপ। আর কথ্য ভাষা হল—যে ভাষায় মানুষে কথা বলে। কথ্য ভাষার কোন নির্দিষ্ট মান নেই, কারণ এক অঞ্চলের মানুষের ভাষা আর এক অঞ্চলের লোক নাও বুঝতে পারে। কৃষ্ণনগর ও ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের ভাষাই চলিত ভাষার রূপ গ্রহণ করেছিল। এই ভাষা মুখের ভাষার কাছাকাছি। হুবহু কথ্য ভাষা নয়।

আঠার শতকের শেষার্ধে রচিত মিশনারীদের রচনায় আঞ্চলিক কথ্য ধর্মের রূপ লক্ষিত হয়। "দোম আন্তেনিও, মানোত্রলের রচনায় কথ্য ধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও আর আঞ্চলিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থে অ-কার স্থানে উ-কার, অপিনিহিতির প্রাচুর্য, বিশেষ নামধাতুর প্রয়োগ, রীতিসিদ্ধ বাক্য গঠন এবং বিশিষ্ট শব্দচয়ন, (তুমি কেটা, মাইয়া, ছাওয়াল), মহাপ্রাণিত ধ্বনির কণ্ঠনালীর উচ্চারণ (তু, রাখোয়াল = raheal) তালব্য ঘৃষ্ট, দন্তঘৃষ্ট ধ্বনিরূপে পরিণতি (তু. জান = Zono, আছিল = assilo), 'আছ্'-ধাতুর অসংরক্ষিত রূপ (তু. এক বড় সিংহ আছিল, এক গৃহস্থ বড় নিন্দক আছিল) ইত্যাদি।" [২]

এই আঞ্চলিক ধর্ম মধ্যযুগীয় বাংলার শিষ্ট আদর্শের রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার এই কথ্য ধর্ম সাধুগদ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কথ্য ধর্মের অবলম্বনে একটি মৌখিক ভাষাশ্রিত রীতি গড়ে উঠেছিল। যেমন—উইলিয়ম কেরীর "কথোপকথন" গ্রন্থটি। এখানে বাংলার কোন কোন আঞ্চলিক উপভাষার সুন্দর নিদর্শন আছে। এই ভাষাই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ হয়েছে। এই মৌখিক ভাষাশ্রিত রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাহিত্যে চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়েছিল অনেক পরে। এই রীতির সাহিত্যিক সম্মান প্রথম বিবেকানন্দ দেন। এরপর প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় এই রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইতিহাসের এই ধারাপথে আশ্চর্যভাবে উপেক্ষিত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। তাঁর "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থটিতে কথ্যধর্মের লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। এখানে তাঁর এই গ্রন্থ অবলম্বনে কথ্যধর্মের কিছু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

।। ১।। Attributive Function and Predicative Function

"কণ্ঠের ধ্বনি দিয়ে মানুষ যে অর্থপূর্ণ ভাষা সৃষ্টি করে, সেই ভাষাই তার জীবনযাত্রার প্রধান হাতিয়ার।" [৩] সামাজিক জীবনে ভাষার সাহায্যেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে। অর্থাৎ ভাষা Communication-এর প্রধান অস্ত্র। "ভাষা যে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সামাজিক ব্যবহার ও ভাষা ব্যবহার যে পারস্পরিক নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে—সে চেতনা ও চিন্তা এসেছে সম্প্রতিকালে, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ষাটের দশক থেকে।" [৪]

এই ভাষা, ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ শিক্ষিত জনের ক্ষেত্রে যে ধরণের ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়—অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনের কাছে সেই ভাষা প্রযুক্ত নয়। বড় সভায় ভাষা যে দায়িত্ব বহন করে, বৈঠকী সভায় সেই ভাষার দায়িত্ব আলাদা হয়। আবার লেখকও নিজের মনোগত ভাব নানা কৌশলে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন। সেই ভাষা কখনও আবেগমন্ডিত হয়, কখনও বা শুধুই ঘটনার বর্ণনা, কখনও বা নিরাসক্ত বিশ্লেষণ হয়। ভাষার এই সকল কার্য ও ক্ষমতাকে Halliday নাম দিয়েছেন—Ideational এবং Interpersonal. বক্তার মনোভাব বা চিন্তাধারা, সেটা অভিজ্ঞতা প্রসূত যাই হোক না কেন, সেটি ভাষার Ideational function. এখানে এই function-এর ভূমিকা যেহেতু উদ্দেশ্যপ্রসূত অর্থাৎ ভাষা এই অংশে বক্তার মানসিক উদ্দেশ্যের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে, সেইজন্য একে উদ্দেশ্যমুখী বা Attributive fuaction বলে। পারস্পরিক কোন কার্য—কথোপকথনরূপে সম্পন্ন হলে তাকে ভাষার Interpersonal function বলে। কার্য সিদ্ধি যেহেতু উদ্দেশ্যেরই প্রতিরূপ, সেজন্য একে বিধেয়মুখী ভূমিকা বা Predictive function

বলে।

"ভাষার এই মৌলিক কার্যগুলি যেমন একদিকে তার গঠনগত রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে আবার অপরদিকে সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়।" [৫]

"বিনয় সরকারের বৈঠকে" নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দুই ভাগে হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রদের সঙ্গে নানা বিষয়ে মৌলিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আচার্য সরকারের ভাষার ভূমিকা কি ধরণের হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

'আমার মতামতের দাম এক-দামড়িও নয়।" (পৃঃ ৫) এই বক্তব্যের মধ্যে যে মনোভাব প্রকাশিত হয়, সেটি হল তাঁর মতামতের মূল্যায়ন করা। সেই হেতু 'মতামতের দাম' বাক্যাংশটি উদ্দেশ্যমুখী ভূমিকা পালন করেছে। এই উদ্দেশ্যপ্রসূত বাক্যাংশের উত্তর পাওয়া যায় "এক-দামড়ি" শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে এবং সেজন্য এটিই বাক্যের বিধেয়মুখী ভূমিকা।

এই ধরণের উদাহরণের অভাব নেই এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে। যেমন—

(১) "এ সম্বন্ধে আমার মতটা কিছু একবগ্‌গা, চরমপন্থী"। (পৃঃ ১৬) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—'আমার মত", বিধেয়মুখী—"একবগ্‌গা, চরমপন্থী।"

(২) "আধ্যাত্মিক শব্দটাতে গুড় মাখানো নেই।" (পৃঃ ২৫) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—'আধ্যাত্মিক শব্দ", বিধেয়মুখী—"গুড় মাখানো নেই।"

(৩) "যুবা গবেষকদের পক্ষে বেশ কিছু মেহনৎ আবশ্যক।" (পৃঃ ৭৬) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—'যুবা গবেষকদের পক্ষে আবশ্যক", বিধেয়মুখী—"মেহনৎ"।

(৪) "আধুনিক পাশ্চাত্য মগজ যারপর নাই যুক্তি-নিষ্ঠ ও শৃঙ্খলা-নিষ্ঠ"। (পৃঃ ৭০) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"পাশ্চাত্য মগজ", বিধেয়মুখী—'যুক্তি-নিষ্ঠ ও শৃঙ্খলা-নিষ্ঠ"।

(৫) "এই গ্রন্থে কান্ট কট্টর বস্তু-নিষ্ঠ"। (পৃঃ ৮২) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—'কান্ট", বিধেয়মুখী—'কট্টর বস্তু-নিষ্ঠ ।"

(৬) "বিবেকানন্দর দরিদ্রনারায়ণ তত্ত্ব ফিখ্‌টের কাছ থেকে পাওয়া জিনিষ।" (পৃঃ ৯৮) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"বিবেকানন্দর দরিদ্রনারায়ারণ তত্ত্ব", বিধেয়মুখী—"ফিখ্‌টের কাছ থেকে পাওয়া জিনিষ"।

(৭) "বিবেকানন্দর কাজটা ছিল দিগ্বিজয়।" (পৃঃ ১৮৭) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"বিবেকানন্দর কাজ", বিধেয়মুখী— "ছিল দিগ্বিজয়।"

(৮) "বাঙালীর-বাচ্চা আর অন্যান্য ভারতসন্তান, সাদা লোকগুলাকে দিনের পর দিন টিট্ করে চলেছে।" (পৃঃ ১৯১) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"বাঙালীর-বাচ্চা আর অন্যান্য ভারতসন্তান", বিধেয়মুখী—'সাদা লোকগুলাকে - - -চলেছে।"

(৯) "অর্থকে ধর্মওয়ালারা চিরকাল ভেবে এসেছে অনর্থের মূল।" (পৃঃ ৫৫৫) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"অর্থকে", বিধেয়মুখী—"ধর্মওয়ালারা - - মূল।"

(১০) "পাঁড় অথবা বাঘা-বাঘা শিল্পীরা একই সঙ্গে নিজস্ব আর পরস্বের মালিকা।" (পৃঃ ৭৩৫) (১ম খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"পাড়- - - শিল্পীরা", বিধেয়মুখী—"একই সঙ্গে - - - মালিক।"

(১১) "তাঁর পারিভাষিক হচ্ছে বৈদিক, বৌদ্ধ, শক্ত, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ইত্যাদি।" (পৃঃ ১৬) (২য় খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"তাঁর পারিভাষিক", বিধেয়মুখী— "বৈদিক- - - ইত্যাদি।"

(১২) "বই হিসাবে সামাজিক প্রবন্ধ বাঙালী মগজের অপূর্ব সৃষ্টি।" (পৃঃ ৬৯) (২য় খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"বই- - -প্রবন্ধ", বিধেয়মুখী—"বাঙালী - - সৃষ্টি।"

(১৩) "বাঙালী মেয়েরা মজবুদ হচ্ছে।" (পৃঃ ১২০) (২য় খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী— "বাঙালী মেয়েরা", বিধেয়মুখী—"মজবুদ হচ্ছে।"

১৪। "টাকাওয়ালারা বেশ দেমাকী লোক।" (পৃঃ ৩৩৬) (২য় খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"টাকাওয়ালারা", বিধেয়মুখী—"বেশ দেমাকী লোক।"

১৫। "গরীবের বাচ্চারাই অনেকাংশে বর্ত্তমান ভারতের আসল কর্ণধার বা ধুরন্ধর।" (পৃঃ ৩৪২) (২য় খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"গরীবের বাচ্চারাই", বিধেয়মুখী—"অনেকাংশেই- - - ধুরন্ধর।"

(১৬) "ছোকরা চিরকালই কেজো লোক।" (পৃঃ ৫৭৬) (২য় খন্ড)

উদ্দেশ্যমুখী—"ছোকরা", বিধেয়মুখী—"চিরকালই কেজো লোক।"

একটি সম্পূর্ণ বাক্যও শুধু উদ্দেশ্যমুখী বা বিধেয়মুখী ভূমিকা পালন করেছে। যেমন—"বৈঠকে" গ্রন্থের ১ম খন্ডে,

"এই ধরণের সোজা, গ্রাম্য বা দেশী শব্দের জাহাজ রবীন্দ্রগদ্য।" (পৃঃ ২২২)

এখানে বক্তার উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রগদ্যে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা। তাই এই বক্তব্যটি উদ্দেশ্যমুখী হয়েছে। এই ধরণের উদাহরণ এই গ্রন্থের দুই ভাগেই পাওয়া যায়। যেমন—

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের (১ম খন্ডে) ঃ—

"কাজেই বিদেশে ভারতবাসীর নাম করা কারবারটা বেশ কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল।" (পৃঃ ৫২১)

"আমার মুখে ল্যাজায় সব নিয়ে রবি।" (পৃঃ ৬২০)

"গঠনমূলক মগজের অধিকারী এই লেখক।" (পৃঃ ৬২৪)

"তর্কের কচ্‌কচানি হচ্ছে দর্শনের প্রাণ।" (পৃঃ ৬২৭)

"কবিতা লেখা জোর জবরদস্তির চিজ্ নয়।" (পৃঃ ৬৭৭)

"ধনবিজ্ঞান আমার মেজাজে আধ্যাত্মিক-বিদ্যা।" (পৃঃ ২৫)

"বিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তি ইত্যাদির কথাই অরবিন্দ-দর্শনের প্রাণবস্তু।" (পৃঃ ৪১)

"সেকালের ভারতীয় সুকুমার শিল্প মানুষ-নিষ্ঠ চিজ্।" (পৃঃ ৫২)

"কাজেই বইটা ট্রামে চলতে-চলতে চুমড়ে নেবার জিনিষ নয়।" (পৃঃ ৮২)

"প্রবীণ শব্দের অর্থ পচা, বাসি, ফেলিতব্য, বর্জনীয় মাল।" (পৃঃ ১২৭)

"দার্শনিক হিসাবে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ উঁচুদরের লোক।" (পৃঃ ১৮৭)

"ছোঁড়াদেরকে কেজো লোকে পরিণত করা ছিল সতীশবাবুর মতলব।" (পৃঃ ২৭৫)

"আমাদের সেকেলে ভারতীয় গীতা আর একালের বন্দেমাতরম্ রক্ষা করা চাই-ই-চাই।" (পৃঃ ৩৯০)

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের **(২য় খণ্ডে)** ঃ—

"লোকটা কলিজাওয়ালা মানুষ, অতি সহজ, হৃদয়শীল দরদী কবি।" (পৃঃ ৩১)

"কঁৎ-দর্শনের প্রবর্ত্তক ছিলেন জজ দ্বারকা মিত্র।" (পৃঃ ৬৭)

"স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠায় ভূদেবের নজর ছিল।" (পৃঃ ৭০)

"এই বই তিনটার কিম্বৎ অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঙালী সমাজে অতি-উঁচু থাক্‌তে বাধ্য।" (পৃঃ ৭২)

"কাজেই গুরুদাসের মুড়ো নেহাৎ সেকেলে মনুর-মুড়ো নয়।" (পৃঃ ৮১)

"পয়সাওয়ালারা সর্ব্বদাই নিজ পয়সা-পদ-পদবীর উন্নতি টুঁড়ে বেড়ায়।" (পৃঃ ২০৮)

"বাঙালীরা পারস্পরিক হিংসায় এত বেশী জ্বলে যে, বেশীক্ষণ অপরের সঙ্গে লেনদেন চালানো সম্ভব হয় না।" (পৃঃ ৩২০)

"কর্ম্মবীরের আসল লক্ষণ হচ্ছে, দুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করা, বাধাবিঘ্নকে জুতিয়ে দুরস্ত করা, প্রতিকূল শক্তিসমূহকে হারিয়ে সংসারে দাঁড়িয়ে থাকা।" (পৃঃ ৩৩৩)

"বঙ্গসংস্কৃতি আগাগোড়াই স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর মেলমেশে তৈরী, দো-আঁশলা মাল"। (পৃঃ ৩০২)

"শিল্প সৃষ্টির আসল কথা রূপ, গড়ন, রং, ছাঁচ, আকার-প্রকার।" (পৃঃ ৬১৫)

"হিংসা-চুক্‌লি, টক্কর, হাম-বড়ামি, জচ্চুরি, বদমায়েসি, গুন্ডামি, লড়াই ইত্যাদি অ-শিব ছাড়া রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব।" (পৃঃ ৩০০)

বিধেয়মুখী বক্তব্যের সংখ্যাও কম নেই "বৈঠকে" গ্রন্থে। যেমন—

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের **(১ম খণ্ডে)** ঃ—

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলুক যুক্তির ইজ্জৎ—যুক্তিনিষ্ঠার ইজ্জৎ— যুক্তিযোগের ইজ্জৎ।" (পৃঃ ৩৭)

"এই বইয়ের ভেতরটা কামড়াতে গেলেও ঠিক সেই রকম কাঠ-খড় আর কোস্তাকুস্তি।" (পৃঃ ৮৩)

"এর জন্য অশেষ পান্ডিত্য ও মেহনৎ আবশ্যক।" (পৃঃ ১৩২)

"ওজনে এঁদেরকে মাথা হেঁট করতে হবে না।" (পৃঃ ১৮১)

"এঁদের পশ্চাতে না আছে ভারতীয় নরনারীর সমর শক্তি, না আছে রাষ্ট্রশক্তি।" (পৃঃ ১৮৬)

"কাজেই এই সবের জন্য একটা সরস, শাসাল ও মূল্যপূর্ণ নাম বের করা সহজ নয়।" (পৃঃ ২৪২)

"মার্কস জোর্‌সে পন্ডিত-মুখখুগুলাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে, বাজে কথা ব'কে কোন লাভ নেই।" (পৃঃ ৫৫৭)

"মেজাজটা শরীফ্ হওয়া চাই।" (পৃঃ ৬৭৭)

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের **(২য় খণ্ডে)** ঃ—

"অতি নিরেট, কেঠো, সাচ্চা কথা।" (পৃঃ ৩১)

"তেতো সত্যটা হজম করা আমার আত্মার নিত্য নৈমিত্তিক রেওয়াজ।" (পৃঃ ৩২)

"তাতে ছিল বাঙালী মগজের বস্তু-নিষ্ঠা, যুক্তি-নিষ্ঠা, আর বিজ্ঞান-নিষ্ঠা।" (পৃঃ ৬২)

"নয়া আধ্যাত্মিকতার ফোআরা ছুটছে এই মন্তর থেকে।" (পৃঃ ৬৪)

"কাজেই সাংবাদিক আর মাস্টারজাতীয় চাক্‌রেরা সমাজের অতি চোঁথা-জীব।" (পৃঃ ২৬২)

"কাজেই কবি-গাল্পিক-নাট্যকারেরা একচোখা, অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ থাক্‌তে বাধ্য।" (পৃঃ ৪৫৭)

।। ২ ।। Restrictive Function and Non-Restrictive Function

ভাষার সাহায্যে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। মানুষ নিজের মনের আবেগ অন্যের কাছে প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। ভাষা কিছু প্রতীকের সাহায্যে গঠিত প্রণালী। এই প্রণালীতে যে বিভিন্ন উপাদান থাকে, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি জটিল প্রণালী গড়ে তোলে। কিন্তু কোন একটি বিশেষ উপাদানের বিশ্লেষণ করলে, ভাষার প্রণালীবদ্ধ রূপটি বুঝতে পারা যায়। **ব্লুমফিল্ড একভাষা থেকে অন্যভাষায় গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।**[৬] **Weinrich -ও তাঁর 'languages in contact'**[৭] গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় শব্দ প্রবেশ করে—সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি নানা কারণে।

ব্লুমফিল্ড-এর ভাষায় "- - -**We distinguish between dialect borrowing where the borrowed features come from within the some speech area - - - and cultural borrowing, where the borrowed features come from different language.**"[৮] অর্থাৎ ভাষাগত ঋণকে দুভাগে ভাগ করা যায়। (১) উপভাষাগত ঋণ, (২) সংস্কৃতিগত ঋণ। যেমন—দুই উপভাষা পাশাপাশি থাকার দরুণ একটি উপভাষা আর একটি উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। আবার দেখা যায়, যখন কোন সমাজ অন্য কোন জাতির সংস্পর্শে আসে, তখন সেই জাতির আদর্শ ও ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সেই সমাজ—সেই সমস্ত ভাবের ভাষা গ্রহণ করে। এইভাবেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবী, ফারসী ও কিছু পরিমাণে তুর্কী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। এরপর ইংরেজ বিজয়ের পর, ইংরেজী শব্দও বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

এই বিদেশী শব্দ বাংলাভাষায় দুই রকমভাবে গৃহীত হয়। (১) বিদেশী উচ্চারণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ যে বিদেশী শব্দ কোন বাধা না মেনেই বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, তাকে Non-restrictive function বলে।

(২) বিদেশী ধ্বনিটির সমধর্মী নিজস্ব ধ্বনি ব্যবহার করে বা বিদেশী ধ্বনিটিকে না মেনে বাননকে নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি দিয়ে বলে অর্থাৎ যে বিদেশী ধ্বনিটি একটি ভাষায় প্রবিষ্ট হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে ভাষাবিজ্ঞানে Restrictive function বলে।

আচার্য সরকারের রচনায় দেশী, বিদেশী শব্দের সমাবেশ দেখা যায়। দেখা গেছে যে, এই বিদেশী শব্দ প্রয়োগে তাঁর ভাষার বৈভব বৃদ্ধি হয়েছে। বিদেশী শব্দগুলি কিভাবে তাঁর রচনা প্রবেশ করেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। যেমন—ফারসী 'দুসমন' (পৃঃ ৫৫৫) শব্দটির ফারসী রূপ 'দুশ্‌মন্'। বংলাতেও এই শব্দটি একই ভাবে প্রবেশ করেছে। আবার, "কিম্মৎ" (পৃঃ ১৫) শব্দটির আরবী রূপ 'কী.মত'—এটি বাংলায় নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 'ইজ্জৎ" (পৃঃ ১৩৪) শব্দটির আরবী রূপ 'ইজ্.জ.ত্,' কিন্তু বাংলায় উষ্ম 'জ' না থাকার জন্য এই ধ্বনিটি

বাংলা ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদাহরণটি বাংলা ভাষায় কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রবেশ করেছে। তাই প্রথমটিকে Non-restrictive function এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে Restrictive function বলা যায়। এই ধরণের অজস্র উদাহরণ আচার্য সরকারের রচনায় মেলে। বিষয়টি একটি টেবিল-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

Non-Restrictive Function উপযোগী শব্দ-তালিকা

ক্রমিক নং	বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট শব্দ	কি জাতীয় বিদেশী শব্দ	বিদেশী রূপ	বাংলা অর্থ	গ্রন্থ পৃষ্ঠা
১	ট্রাম	ইংরাজী	Tram	একপ্রকার গাড়ী	পৃঃ ৮২
২	হালত্	আরবী	হালত্	দশা	পৃঃ ১২৭
৩	মাল	আরবী	মাল্	জিনিষ	পৃঃ ১৬২
৪	আস্‌মান	ফারসী	আস্‌মান	আকাশ	পৃঃ ২২১
৫	সোশ্যালিজ্‌ম	ইংরাজী	Socialism	সমাজবাদ	পৃঃ ৩৪৩
৬	সুরৎ	আরবী	সূরত্	মুখ	পৃঃ ৪৩০
৭	হোমিওপ্যাথিক	ইংরাজী	Homeopathic	এক প্রকার ঔষধ	পৃঃ ৫২১
৮	এডুকেশন	ইংরাজী	Education	শিক্ষা	পৃঃ ৫২৭
৯	ভিক্টর উগো	ফরাসী	ভিকতর য়ুগো	ব্যক্তির নাম	পৃঃ ৬২২
১০	বাস	ইংরাজী	Bus	এক প্রকার গাড়ী	পৃঃ ৩৭৭
১১	তদ্‌বির	আরবী	তদ্‌বীর্	বন্দোবস্ত	পৃঃ ২৭৭
১২	কুদরত	আরবী	কু.দ্‌রত্	ক্ষমতা	পৃঃ ২৬৫
১৩	হস্টেল	ইংরাজী	Hostel	পান্থশালা	পৃঃ ২৭৪
১৪	হ্যাট	ইংরাজী	Hat	টুপী	পৃঃ ২৯২
১৫	কোট	ইংরাজী	Coat	কুর্ত্তা	পৃঃ ২৯২
১৬	ট্রেড	ইংরাজী	Trade	ব্যবসা	পৃঃ ৩৭২
১৭	ইউনিয়ন	ইংরাজী	Union	সম্মেলন	পৃঃ ৩৯২
১৮	আইন	ফারসী	আইন্	রাজবিধি	পৃঃ ৩৯৩
১৯	ন্যাশন্যালিষ্ট	ইংরাজী	Nationalist	জাতীয়তাবাদী	পৃঃ ৩৯১
২০	কলেজ	ইংরাজী	College	মহাবিদ্যালয়	পৃঃ ৩৬৫
২১	পেন্সিল	ইংরাজী	Pencil	তুলিকা	পৃঃ ২৭৩
২২	সেন্সাস	ইংরাজী	Census	লোকগণনা	পৃঃ ২৭৩

ক্রমিক নং	বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট শব্দ	কি জাতীয় বিদেশী শব্দ	বিদেশী রূপ	বাংলা অর্থ	গ্রন্থ পৃষ্ঠা
২৩	রিপোর্ট	ইংরাজী	Report	বৃত্তান্ত দেওয়া	পৃঃ ২৭৩
২৪	স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স	ইংরাজী	Statistics	সংখ্যাতত্ত্ব	পৃঃ ২৭৩
২৫	ব্যাঙ্ক	ইংরাজী	Bank	কোষাগার	পৃঃ ৪৭৮
২৬	হদিশ্‌	আরবী	হদীস্‌	সন্ধান	পৃঃ ৬৩৪
২৭	মুসলমান	আরবী	মুসল্‌মান	মহম্মদীয় ধর্মে বিশ্বাসী	পৃঃ ৬৩৪
২৮	হাইকোর্ট	ইংরাজী	High-court	উচ্চ ন্যায়ালয়	পৃঃ ২৫২
২৯	সোসাইটি	ইংরাজী	Society	সমাজ	পৃঃ ২৭২
৩০	দিল	ফারসী	দিল্‌	হৃদয়	পৃঃ ২৭৩

Restrictive function উপযোগী শব্দ-তালিকা

ক্রমিক নং	বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট শব্দ	কি জাতীয় বিদেশী শব্দ	বিদেশী রূপ	বাংলা অর্থ	গ্রন্থ পৃষ্ঠা
১	কায়েম	আরবী	কা.য়ম্‌	নির্দ্ধারিত	পৃঃ ৭০
২	মেহনৎ	আরবী	মহন্‌ত	পরিশ্রম	পৃঃ ৭৬
৩	মুল্লুক	আরবী	মুল্‌ক্‌	দেশ	পৃঃ ৮৮
৪	ইজ্জৎ	আরবী	ই'জ্‌.জ.ত্‌	সম্ভ্রম	পৃঃ ১৩৪
৫	হামেসা	ফারসী	হ.মেশহ্‌	সর্ব্বদা	পৃঃ ১৬১
৬	মালুম	আরবী	মবলূম্‌	জ্ঞাত	পৃঃ ১৬৭
৭	কার্দ্দানি	ফারসী	কারদানি	কর্ম্মপটুতা	পৃঃ ১৯৯
৮	চোস্ত	ফারসী	চুসত্‌	ঠিক মাপ মত	পৃঃ ২১৬
৯	মোলাকাৎ	আরবী	মুলাক.াত	সাক্ষাৎকার	পৃঃ ২১৮
১০	মগজ	ফারসী	মগ্‌জ্‌.	মস্তিষ্ক	পৃঃ ২৯৬
১১	পায়দা	ফারসী	পয্‌দা	উৎপাদিত	পৃঃ ২৯৬
১২	বে-আকুব	ফারসী/(বে) আরবী/(বকুফ্‌)	বেবকুফ্‌	নির্বোধ	পৃঃ ৩৬১

ক্রমিক নং	বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট শব্দ	কি জাতীয় বিদেশী শব্দ	বিদেশী রূপ	বাংলা অর্থ	গ্রন্থ পৃষ্ঠা
১৩	জরীপ	আরবী	জরীব্	জমি মাপা	পৃঃ ৪৫৪
১৪	গেজেট	ইংরাজী	gazette	তালিকা	পৃঃ ৫২৭
১৫	তাজা	পারসী	তাজ.	টাটকা	পৃঃ ৫৪৭
১৬	মোসাফির	আরবী	মুসাফি.র্	পথিক	পৃঃ ৮৮
১৭	দুনিয়া	আরবী	দুন্‌যা	জগৎ	পৃঃ ৩
১৮	হিস্যা	আরবী	হিস্‌স	অংশ	পৃঃ ২০৫
১৯	ফারাক	আরবী	ফ.র্ক	প্রভেদ	পৃঃ ৫০১
২০	ইস্তাফা	আরবী	ইস্‌ত্‌অফা	ক্ষমা প্রার্থনা	পৃঃ ৪৪০
২১	আল্লাহ্	আরবী	অল্‌লাহ্	পরমেশ্বর	পৃঃ ৪৪৩
২২	গুলজার	ফারসী	গুল্‌জ.র্	কোলাহলপূর্ণ	পৃঃ ৪৩২
২৩	ইস্কুল	ইংরাজী	School	বিদ্যালয়	পৃঃ ৩৬৫
২৪	বেপরোআ	ফারসী/(বে) আরবী/(পরবা)	বেপরবা	ভয়হীন	পৃঃ ৩৯৭
২৫	বুজরুক	ফারসী	বুজ্‌রগ্	সাধুবেশী ধূর্ত	পৃঃ ৩৭
২৬	ইস্তামাল	আরবী	ইস্‌ত্‌অ'মাল্	অনুশীলন	পৃঃ ১৭৫
২৭	ডবল	ইংরাজী	Double	দ্বিগুণ	পৃঃ ৪৭৪
২৮	কিম্মৎ	আরবী	কী.মত	মূল্য	পৃঃ ১৫

কথা বলার সময়ে বা তার পরে, সেই কথার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষ যে আচরণ করে তা মানব ভাষারই সম্প্রসারণ। একে 'Paralanguage' বা 'প্রায় ভাষা' বলা যেতে পারে। এর প্রয়োগ হয় সাধারণত উপন্যাস, নাটক বা গল্পে। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থটি এই জাতীয় নয়। এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। এখানে বক্তা নিজের মনোভাব প্রকাশ করার জন্য কোন আচরণ বা অঙ্গভঙ্গী না করে, ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তাই Para language -এর প্রয়োগ এখানে দেখা যায় না।

।। ৩ ।। বর্ণনামূলক, মূল্যায়ণধর্মী ও উচ্ছ্বাসধর্মী (ভাষাভঙ্গী)

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠে, সরস বাক্যপ্রয়োগে, বৈঠকী চালে কথ্য শব্দের সুচারু ব্যবহারে, অনেক জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থিত করেছেন 'বৈঠকে' গ্রন্থে। ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনৈতিক, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর ভাষাভঙ্গী কখনও বর্ণনামূলক, কখনও মূল্যায়নধর্মী, কখনও বা উচ্ছ্বাসধর্মী হয়েছে। নমুনা সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সিন্ধুদেশ ভ্রমণকালে তাঁর আলোচনা বর্ণনামূলক হয়েছে। যেমন—"যতই দক্ষিণে যেতে লাগলাম, ততই রেলের দুধারে

দেখ্‌ছি কেবল বালুর মাঠ। বালুর পরে, বালুর শেষে সুদূর গ্রামখানি আর নজরে আসছে না। সিন্ধুদেশে পড়বার পর থেকে গাড়ীর ভেতর দুধার থেকে উড়ে এসে পড়তে আরম্ভ কর্‌ল কেবল বালু।" (পৃঃ ৫৪৩) (১ম খন্ড)

আবার ধর্ম বিষয়েও তাঁর ভাষা বর্ণনামূলক হয়েছে। যেমন—"আমি ধর্মের আন্দোলনে হাতী-ঘোড়া কিছু দেখি-টেখি না। আমি চাই দেশটাকে বাড়াতে, মানুষগুলাকে যেন-তেন-প্রকারেণ ঠেলে বড় ক'রে তুল্‌তে। তার জন্য ধর্মের আন্দোলন কেন, যমের আন্দোলনও চালাতে প্রস্তুত আছি। মানুষের জীবনে অন্যান্য হাজার-হাজার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতনই ধর্মও আমার কাছে আলোচ্য বস্তু।" (পৃঃ ৫৫৫) (১ম খন্ড)

এছাড়া আরও অনেক বিষয়েও তাঁর ভাষাভঙ্গী বর্ণনামূলক হয়েছে। যেমন—

সাহিত্য বিষয়ে ঃ— "আমি 'বলাকা'র (১৯১৬ খৃঃ) পরবর্ত্তী পঁচিশ বৎসরের রবীন্দ্র সাহিত্যকেও কুর্নিশ করে চ'লি। 'বলাকা'র সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বছর পঞ্চান্ন। আমার রবি, বার বৎসর বয়সে কলম ধ'রেছে স্বাধীনতার চারণ হেমচন্দ্রের আওতায়। আর কলম ছেড়েছে আশী বছর বয়সে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে স্বাধীনতার গান গেয়ে। স্বাধীনতায় শুরু, স্বাধীনতায় শেষ।" (পৃঃ ৬২৯) (১ম খন্ড)

সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ঃ— "ফরাসী মেয়ে যদি জার্ম্মান-সুইস পরিবারে ঘর করতে আসে তা'হলে সে তার জার্ম্মান ননদ এবং জা, জার্ম্মান শাশুড়ী, মাস-শাশুড়ী, পিস-শাশুড়ী ইত্যাদির সমালোচনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। অবশ্য প্রথমেই বুঝে রাখা উচিত যে, ইয়োরোপে কোন ছেলেই বিয়ে করার পর নিজ-নিজ বাপ মার সঙ্গে এক পরিবারে থাকে না, সকলেই বিবাহিত জীবন শুরু করে বিলকুল স্বতন্ত্র ঘরবাড়ীতে।" (পৃঃ ৫০৩) (১ম খন্ড)

রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ঃ—"রাষ্ট্রিক জীবনকে দুই তরফ হ'তে দেখা চলে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রশাসনের দিক। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র-চিন্তা, রাষ্ট্র-দর্শন, রাষ্ট্রিক-বুখ্‌নি, রাষ্ট্রিক-বাণী বা রাষ্ট্রিক-আদর্শের দিক। এই দুই দিকে রাষ্ট্রিক-বাংলায় প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ ইত্যাদি ধাপের সারি দেখা সম্ভব।" (পৃঃ ৪৩৭) (১ম খন্ড)

বর্ণনামূলক বক্তব্যের নজির এই গ্রন্থের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আবার কোন বিষয়ের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করার জন্য তাঁর ভাষার চরিত্র বদ্‌লেছে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন—"সেরূপ অভেদানন্দ একটা রীতিমত নামজাদা কর্ম্মবীর ও ভারত-প্রচারক। তাঁকে "স্বামী" ব'লে সম্বোধন করি না। উপাধি দিলে লোকটা ছোট হ'য়ে যায়। অমর লোক-মাত্রই উপাধিহীন।" (পৃঃ ৬) (১ম খন্ড)

দার্শনিক বলতে কাকে বোঝায়—এ সম্পর্কে তার মত, "দার্শনিক হিসাবে ইংরেজ পণ্ডিত ব্রাডলে, আলেকজাণ্ডার, রাসেল আর হব্‌হাউসের পসার ভারতে সুবিস্তৃত। এঁরা যে অর্থে দর্শনের ইতিহাস লেখক, ইয়োরামেরিকান পণ্ডিত, সেই অর্থে দার্শনিক নন।" (পৃঃ ১৬)

ব্রজেন শীলের পাণ্ডিত্যের মূল্য নির্ধারণ করেছেন—"পণ্ডিত হিসাবে ব্রজেন শীলের জাত্ মারা যায় না, কেবল বলা হলো যে তাঁর পাণ্ডিত্যটা ঐতিহাসিক—দার্শনিক নয়।" (পৃঃ ২১) (১ম খন্ড)

ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন—"ধনবিজ্ঞান আমার মেজাজে আধ্যাত্মিক বিদ্যা। আধ্যাত্মিক শব্দটাতে গুড় মাখানো নেই।" (পৃঃ ২৫) (১ম খন্ড)

এই ধরণের মূল্যায়ণধর্মী বক্তব্যের সংখ্যা এই গ্রন্থে অনেক আছে। যেমন—

"ভাগবত জীবনকে পাকড়াও করতে হ'লে মানুষের চলতে হয় অশান্তি চাখতে-চাখতে—টক্করের পর টক্কর চালিয়ে—দুনিয়াখানাকে জুতোতে-জুতোতে।" (পৃঃ ৪৩) (১ম খন্ড)

"দুনিয়ার সকল দেশেই লোকের ক্যার্দ্দানি জরিপ করা হয় তার বাইরের চটক দেখে।" (পৃঃ ১৯৯) (১ম খন্ড)

"এই সময়কার আশুতোষের কথাবার্তার কিম্মৎ লাখ টাকা।" (পৃঃ ৩৩৫) (২য় খন্ড)

"ভারত সন্তানের কিম্মৎ এক দামড়িও নয়, যত বড়ই সে হোক্ না কেন বিদ্যায়, চরিত্রে, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায়।" (পৃঃ ৩৩৬) (২য় খন্ড)

"ফার্স্টবয় হওয়ার কারবারে ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশে বেশ কিছু সুপরিচিত। ছোক্‌রা ভারতের কীর্তি ফেলিতব্য চিজ্ নয়।" (পৃঃ ৩৫২) (২য় খন্ড)

"আনকারা হ'তে মস্কো পর্যন্ত আর চুংকিং হ'তে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিশ্বশক্তির বেপারীরা আজকের ভারতীয় মেজাজটা ছুঁয়ে জীবন চালাতে অভ্যস্ত।" (পৃঃ ৪৪১) (২য় খন্ড)

"কর্মক্ষমতা, মনুষ্যত্ব, চরিত্রবত্তা ইত্যাদি চিজ্ মজুরীর তঙ্কা দিয়ে জরীপ করা সম্ভব নয়।" (পৃঃ ৫২৩) (২য় খন্ড)

"স্বামীজিরা মরচে পড়া লোক নন। সর্বদাই নতুন কিছুর সংগে ছোঁয়াছুঁয়ি এঁরা রক্ষা করে চলেন। মগজটা এদের বস্তু-নিষ্ঠ ও কর্ম-নিষ্ঠ।" (পৃঃ ১৯৪) (১ম খন্ড)

"তাঁর ধনদর্শনের মুদ্দা ছিল পুঁজি-নিষ্ঠা, পুঁজি-সংগ্রহ, পুঁজির-কেন্দ্রীকরণ।" (পৃঃ ৩০৩) (২য় খন্ড)

"এই ধরণের কাজ সবই খুব জরুরি। এ সমস্তের কিম্মৎ কোনো কোনো সময়ে লাখ টাকা।" (পৃঃ ১৫) (১ম খন্ড)

"বুদ্ধদেবের কথাবস্তু রকমারি। প্রেমেনের কাব্য দুনিয়ায় বৈচিত্র্য খানিকটা কম মনে হচ্ছে। কিন্তু পাঠকমাত্রেই দুজনকে মাল হিসেবে সহজে নজরুলের পরবর্ত্তী ধাপ সমঝিতে সমর্থ। দুজনেরই বাণী হাঁ-ধর্মী, সুস্পষ্ট ও বস্তু-নিষ্ঠ।" (পৃঃ ৬৯২) (২য় খন্ড)

এছাড়া 'অতিশয়োক্তি' বা 'Hyperbole' অলংকার ব্যবহারে তাঁর রচনার মধ্যে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে কাউকে একটু সম্মান দেখাতে গিয়ে অনেক সময় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যেমন, ' বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম খন্ড) গ্রন্থে— অভেদানন্দকে 'বাপকা-বেটা', 'বাঙালীর-বাচ্চা' (পৃঃ ৬) ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। আবার সতীশবাবুকে "ডানপিটে" আখ্যা দিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধব অম্বিকা উকিল তাঁর কাছে—'ডানপিটে', 'ত্যাঁদড়', 'ভবঘুরে' (পৃঃ ২৮৫) ইত্যাদি হয়েছেন। আবার অধ্যাপক সরকার নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'মুখ্খু', 'বেআক্কেল', 'বেখাপ্পা', 'বেয়াড়া', (পৃঃ ১৩) ইত্যাদি দিয়ে। এইরকম অতিশয়িত ব্যবহার তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ঘটেছে। যেমন ঃ—

"এই মতিগতির আমি চরম যম।" (পৃঃ ৩৭)

"—এই অধমের দর্শন"। (পৃঃ ৩৭)

"আমি ত্যাঁদড়।" (পৃঃ ৩৩৬)

"এই অধমের কথাগুলো বেয়াড়া রকমের।" (পৃঃ ৩৬৭)

"ঘরের কোণে ইঁদুরের মতন ব'সে থেকে এই অধম সব কিছু দেখেছে শুনেছে।" (পৃঃ ২৮৯)

"আমি একে মুখ্খু গরীব, তার ওপর পাষণ্ড।" (পৃঃ ৩৪৯)

"আমার মগজটা কিছুটা-কিছুটা কুচুটে ঢঙের ছিল।" (পৃঃ ৩৫৭)

"বক্তৃতাটা অবশ্য আমার মতন ম্যাড়াকান্তকে বুঝাবার জন্য দেওয়া হয়নি।" (পৃঃ ৩৫৭)

এছাড়া এই ধরণের অলংকার অন্যান্য বিষয়ের ওপরও প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

"ভারতের লোকগুলা মানুষের-বাচ্চা, রক্তমাংসের মানুষ।" (পৃঃ ৩৭)

"এই হিসাবে ভারতের নরনারী বিলকুল আনাড়ি ও ম্যাড়াকান্ত।" (পৃঃ ১৫১)

"হারাণ চাকলাদার, রাধাকুমুদ, রবী ঘোষ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি আমার মতন ম্যাড়াকান্ত প্রামাণিক হয়েছিল।" (পৃঃ ২৭৬)

"গোটা বাঙালী জাত ১৯০৫ সনে মাতাল হয়ে পড়েছিল সেই বিবেকানন্দ বাঞ্ছিত 'একবগ্গা ক্ষ্যাপামি'তে।" (পৃঃ ২৮০)

"বাপকা-বেটা ব্রহ্মবান্ধব সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ২৮৪)

"কবিতাগুলা আর চিত্রগুলা জ্যান্ত, তাজা, সরস মাল।" (পৃঃ ৬২৭)

"চ্যাংড়া, ছোঁড়া, জোআন, প্রৌঢ় — রবীন্দ্রনাথ কি কম উপভোগ্য?" (পৃঃ ৬২৮)

"ধরা পড়ার পরও চোরটা বীর, জবরদস্ত, বাজখাই, জগদবরেণ্য।" (পৃঃ ৭৩৬)

অধ্যাপক সরকারের এই ধরণের বক্তব্য তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে স্বতোৎসারিত। "**এই ধরণের বক্তব্যের অভিনবত্ব ও উপস্থাপনার নিজস্ব স্টাইল পাঠকের মনে দাগ কাটে। তাঁর ভাষার মধ্যে একটা যৌবন ঋজু আবেগ ছিল।**" [৯] বক্তব্যগুলি কখনও বর্ণনাধর্মী, কখনও মূল্যায়নধর্মী, কখনও উচ্ছ্বাসধর্মী হওয়াতে ভাষা হয়েছে বৈচিত্র্যময়।

।। ৪।। বিশেষ্য-বিশেষণের বিপর্যাস

অধ্যাপক সরকারের গদ্যরীতির একটি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য হল বিপর্যাস বা Inversion অর্থাৎ বাক্যে ক্রিয়াপদের বিপর্যাস। এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিপর্যাস বিশেষণ-বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি প্রত্যক্ষতর হবে। যেমন 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম খন্ড) গ্রন্থে —

বিশেষণ→বিশেষ্য

১। "বেড়ে বই" (পৃঃ ২৮)

২। "বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রথম ধুরন্ধর অভেদানন্দ।" (পৃঃ ৯)

৩। "বেআক্কেল, বেখাপ্পা, বেসুরো, অ-সুর, আহাম্মুক ইত্যাদিরূপে আমি কোনো কোনো মহলে বিবৃত হয়ে থাকি।" (পৃঃ ১৩)

৪। "তার জন্য চাই নয়া-নয়া গবেষক।" (পৃঃ ৩৪)

৫। "একবগ্গা খ্যাপামির জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সতীশ মুখোপাধ্যায়।" (পৃঃ ২৬২)

৬। "পাকা কারবারী লোক লাহারা।" (পৃঃ ৩০৯)

৭। "পশারওলা নামজাদা উকিল।" (পৃঃ ৩১৪)

৮। "বাপকা-বেটা আমি আশুতোষকে বলেছি।" (পৃঃ ৬)

৯। "এই শ্রেণীর সুখপাঠ্য বাংলা বই।" (পৃঃ ১৩৬)

১০। "একতরফা, একবগ্গা, একচোখো মেজাজ নিয়ে এঁরা চলাফেরা করেন না।" (পৃঃ ১৯৪)

১১। "ছোঁড়াদেরকে কেজো লোকে পরিণত করা ছিল সতীশবাবুর মতলব।" (পৃঃ ২৭৫)

১২। "অতি কোরা ও কড়াভাবে শেখানো ছাড়া তাঁর আর কোন লক্ষ্য ছিল না।" (পৃঃ ২৭৭)

১৩। "বাপকা-বেটা ব্রহ্মবান্ধব সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ২৮৪)

১৪। "তাই ভারতে বিদেশ সম্বন্ধে বিদেশদক্ষ লোকজন।" (পৃঃ ৫১১)

১৫। "কেজো নীরস তথ্য বা বস্তু।" (পৃঃ ৫১৫)

১৬। "হোমিওপ্যাথির ডোজে স্বরাজ পেয়েছে অনেক লোক।" (পৃঃ ৫২১)

১৭। "বেশ তাজা মগজওয়ালা লোক।" (পৃঃ ৪৪৬)

১৮। "কেজো লোকেরা বিবেকানন্দ'র বুলির মধ্যে এক মাল পায়।" (পৃঃ ৫৩৩)

১৯। "চ্যাংড়া, ছোঁড়া, জোআন, প্রৌঢ় — রবীন্দ্রনাথ কি কম উপভোগ্য?" (পৃঃ ৬২৮)

২০। "দুইই স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল লাল টকটকে বস্তু।" (পৃঃ ৭০৩)

২১। "এই দুর্দান্ত বাঘা কবি কেঁদে-কেঁদে জীবন কাটাচ্ছে।" (পৃঃ ৭০৫)

।। ৫।। Nominal Style এবং Verbal Style

বিনয় সরকার লেখ্যরীতি ও কথ্যরীতির মধ্যে ব্যবধান মেনে চলতেন না। কথ্যরীতির লৌকিক রূপটি গ্রহণে তিনি সক্ষম ছিলেন। ভাষার মধ্যে এমন বহু শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেগুলি 'Verbal Style' বা 'কথ্যরীতি'তে মানায় ভাল। যেমন—'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থে 'তঙ্খা', 'সওদা', 'সমঝিছে', 'কট্টর', 'পুরাণা', 'নয়া', 'বোলচাল', 'কম্-সে-কম্', 'হামদর্দি', 'চোপর', 'বুজরুকি', 'ঘোটমঙ্গল', 'টনটনে জ্ঞান', 'মানুষ', 'হামবড়ামি', 'একবগ্‌গা', 'খেপামি', 'ফারাক', 'বাঙালীর-বাচ্চা', 'মানুষের-বাচ্চা', 'টক্কর', 'জরীপ', 'এক মেটে হিসাবে', 'মেহনত', 'সড়ক', 'মহাল্লা', 'পায়দা' ইত্যাদি ধরণের অজস্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই সকল শব্দ সাধুভাষাতেও প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ 'Nominal' আর 'Verbal Style'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য রাখার প্রয়োজন মনে করতেন না।

চলিতরীতিতে উচ্চারণ অনুযায়ী লিপি, বানানের ব্যবহার—তাঁর রচনায় ছিল। যেমন—'বিনয় সরকারে বৈঠকে' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে—'মুখ্‌খু' (পৃঃ ১৩), 'গেরস্থ' (পৃঃ ১২), 'ছিকেয়' (পৃঃ ২৯), 'সংগে' (পৃঃ ৩৩), 'চাংগা' (পৃঃ ১২১), 'গংগায়' (পৃঃ ১১৮), 'গেরস্থালি' (পৃঃ ১৫১), 'কোঁদল' (পৃঃ ১৫২), 'মন্তর' (পৃঃ ১৬১), 'দ্যাখ্' (পৃঃ ১৯০), 'এরি'(পৃঃ ৩৩৭), 'সংগে' (পৃঃ ৩৩২), 'কোথ্-থেকে' (পৃঃ ২৭৮), 'তক্কা-তক্কি' (পৃঃ ২৫০), 'পষ্টাপষ্টি' (পৃঃ ৫১৩), 'কায়েথ' (পৃঃ ৩৬৫), 'কছরত্' (পৃঃ ৩৬৪); 'আর্থিক উন্নতি যুক্তিশাস্ত্র' গ্রন্থে— 'তুল্ল', 'চল্ল'; 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে — 'ঝর্ঝরে' (পৃঃ ২১), 'বামুন-গুদ্দুর' (পৃঃ ২১৫), 'ফের্ত্তা' (পৃঃ ৬১১), 'হার্‌বা-মাত্র' (পৃঃ ৬৩৯) ইত্যাদি ধরণের বানান তার 'Nominal Style' বা সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। সাধু ও চলিত—দুইরকম রীতিই তাঁর গদ্যের বাহন হয়েছে। তবে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিল নৈকট্যের। অধ্যাপক সরকারের সাধু গদ্যও মুখের ভাষার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর ভাষা ছিল তীক্ষ্ণ। ফলে তাঁর একটা অপূর্ব নিজস্ব স্টাইল তৈরী হয়েছে।

।। ৬।। উল্লম্বধর্মী এবং আনুভূমিক

বিষয় ও রীতির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ কোন্ ধরণের বাগভঙ্গী লেখক ব্যবহার করবেন বা ঠিক কোন্ শব্দ বসাবেন, তা অনেক সময় বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। বিষয়ের তারতম্যের জন্যই এক রচনার ভাষা থেকে আর এক রচনার ভাষা পৃথক হয়। তাই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা ও রোমান্টিক আখ্যানের ভাষা এক হতে পারে না। বিষয়ের তারতম্যে ভাষার এই পার্থক্যকে স্বীকার করে **বঙ্কিমচন্দ্র** বলেছেন— **"বিষয় অনুসারেই রচনায় ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত - - - - প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়, যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট হয় ও সুন্দর হয় তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? - - - - যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে।"** [১০]

বঙ্কিমচন্দ্রের এখানে বক্তব্য বিষয় এই যে—**"বিষয়ের দাবি অনুযায়ী ভাষার গুরুত্ব কমে বা বাড়ে। অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব এবং ভাষার গুরুত্ব 'সহবর্তী চলন' দ্বারা সম্পর্কিত। একটি বাড়লে আর একটি বাড়ে, একটি কমলে আর একটি কমে।"** [১১] এখানে তিনি বিষয় ও রীতির উল্লম্ব গুরুত্বের কথা বলেছেন। আবার অন্যদিকে বিষয়ের বিভিন্নতার জন্য রীতিকে বিভিন্ন হতে হয়। এই হিসাবে তাদের অনুভূমিক পার্থক্যের হিসাব করা যেতে পারে।

নীচে "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম খন্ড) গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ নিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

ক. "পলাতকা (১৯১৮ খৃঃ) হ'তে "সানাই" (১৯৪০ খৃঃ) পর্য্যন্ত কবিতার বইয়েও বস্তু-নিষ্ঠার বিশেষতঃ সমাজ-নিষ্ঠার ইজ্জদ ঢের। তবে একমাত্র চামড়ার চোখ কান দিয়ে দুনিয়াকে ছোঁবার চেষ্টা করা রবির ধাতে নাই। হৃদয়ের সঙ্গে দুনিয়াকে মেখে রাখা হচ্ছে তার সাধারণ দস্তুর। তাঁর আটপৌরে কাব্যে, কল্পনা আর ভাবুকতার ডোজ বেশ চড়া।" (পৃঃ ৬৪৭)

খ. "নিজ-নিজ ট্যাক আর স্বার্থ সম্বন্ধে সব লোকই ওয়াকিবহাল। কিন্তু ব্যাঙ্কের কোন কারবারী, কারখানার মালিক বা পরিচালকের কারবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। আবার বীমাওয়ালারা খনির কারবারের লাভ-লোকসান বুঝে-সুজে না। সকলেই তেল দিতে জানে নিজ নিজ চরকায়।" (পৃঃ ৪৭৮)

গ. "মন্ত্রীগিরিতে ইস্তাফা দেওয়ার ভেতর একটা বড়-গোছের স্বার্থত্যাগ রয়েছে। অনেক দিন ধরে বাঙালীর সার্বজনিক

জীবনে এই ধরণের আর এই দরের স্বার্থত্যাগ দেখা যায় নি। দ্বিতীয়তঃ সরকারী শাসন বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধে কড়া সমালোচনা বুঝাবার জন্য মন্ত্রীগিরি ছেড়ে দেওয়া যারপর নাই জরুরি ছিল। তৃতীয়তঃ মন্ত্রিত্ব ইস্তাফা দেবার জন্য আবশ্যক বুকের পাটা, সাহস আর তেজস্বিতা।" (পৃঃ ৪৩৯)

ঘ. 'মালদহের সদরে ও পল্লীতে বৈশাখ মাসে শিব পূজার ধূম পড়ে। সেই উপলক্ষ্যে তিনদিন চলে নাচ-গান-বাজনা। একদিন রাস্তায়-রাস্তায় সঙের মিছিল চলে। সেই মিছিলটা নাচ-গান-বাজনার হৈ হৈ আর লাফালাফি ছাড়া আর কিছু নয়। পূজাই বল্, উৎসবই বল্, নাচানাচিই বল্, আর লাফালাফিই বল্—এ সবের সার্বজনিক নাম গম্ভীরা।" (পৃঃ ৩৬৮)

ঙ. "যারা দেহাত্মক বুদ্ধির গুণগান করে, তারাও দার্শনিক বটে। যাদের বিবেচনায় অহিংসা প্রচারকেরাই পয়লা নম্বরের দার্শনিক এবং একমাত্র দার্শনিক, তাদের মগজে ঘির অভাব, যৎপরোনাস্তি। যে সকল লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক হিংসার তারিফ করে; লড়াইয়ের ইজ্জৎ দেয়, ঝগড়া, কোঁদল, আড়াআড়ি, টক্কর, প্রতিহিংসা ইত্যাদি মনোবৃত্তির যথোচিত মূল্য দিতে অভ্যস্ত, সে সকল লোককেও দার্শনিক সমঝে রাখা যারপরনাই সমীচীন।" (পৃঃ ২৪)

চ. "চল্লিশ-পয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বুড়োগুলো যদি হপ্তায় একঘন্টাও খোলামাঠে দল বেঁধে নাচানাচি করে, তাহলে প্রত্যেকের আয়ু বেড়ে যাবে দশ বছর। বুঝলি? ডাক্তারের আর ওষুধপত্রের পয়সা বেঁচে যাবে ঢের! আর বুড়ো বাঙালীর-বাচ্চারা জ্যান্ত মানুষের মতন দুবেলা চলাফেরা করতে পারবে। ঘাড় খাড়া করে চল্‌বে। লোকগুলার চোখের চাহনি হবে অন্য ধরণের। চেহারা যাবে বদলে।" (পৃঃ ৩৬৩)

ছ. "মেয়েদের রোজগারের ওপর বাপ-মা খেয়ে বাঁচ্‌ছে। মেয়েরা রোজগার করে ভাই-বোন্‌কে ইস্কুল কলেজে পড়াচ্ছে। এইসব হ'চ্ছে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য। বঙ্গবিপ্লবের যুগে এ-সব দৃশ্য দেখা যেত না। এক-আধটা হয়ত নজরে পড়তো। কিন্তু গণ্ডায়-গণ্ডায়, ডজনে-ডজনে এমন কি শ'য়ে-শ'য়ে মেয়েদের এইসব নয়া ঢঙের কৃতিত্ব হালের জিনিষ।" (পৃঃ ৩৭৭)

উপরের রচনাংশগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে, প্রথমে নজরে আসে শব্দপ্রয়োগ পদ্ধতিটি। তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, শব্দ ব্যবহারের শতকরা হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

অনুচ্ছেদ	তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ	দেশী শব্দ	বিদেশী শব্দ
ক	৩৫%	৪০%	৯%	১৬%
খ	৩৮%	৩৪%	৪%	২৪%
গ	৪২%	৪০%	৫%	১৩%
ঘ	২৪%	৫৮%	৯%	৯%
ঙ	১৭%	৩২%	১০%	১১%
চ	১৯%	৬৯%	৫%	৭%
ছ	১৬%	৬১%	৪%	১৯%

এই ছয়টি একই বিষয়ক রচনাংশ নয়। 'ক'. সাহিত্যবিষয়ক, 'খ'. অর্থনীতিবিষয়ক, 'গ'. রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক, 'ঘ'. সংস্কৃতিবিষয়ক 'ঙ'. দর্শনবিষয়ক, 'চ'. সাধারণ বিষয়, 'ছ'. সমাজবিষয়ক ইত্যাদি। এখানে বস্তু-বিষয় অনুযায়ী তৎসম, তদ্ভব শব্দের পার্থক্য কম বেশী হয়েছে। যেমন—

'ক'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ৫% (তৎসম কম)

'খ'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ৪% (তৎসম বেশী)

'গ'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ২% (তৎসম বেশী)

'ঘ'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ৩৪% (তৎসম কম)

'ঙ'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ১৫% (তৎসম বেশী)

'চ'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ৫০% (তৎসম কম)

'ছ'-এর ক্ষেত্রে তৎসম এবং তদ্ভব পার্থক্য = ৪৫% (তৎসম কম)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে—'খ', 'গ', 'ঙ'-তে তৎসম শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের গাম্ভীর্য্যতার জন্যই তৎসম শব্দের আধিক্য। তৎসম শব্দ ব্যবহারের এই ওঠানামা, দর্শন বিষয়ক অর্থাৎ 'ঙ' অংশে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। অন্যান্য রচনাংশে তদ্ভব শব্দের সংখ্যা বেশী। এখানে লক্ষণীয় 'চ' অংশে অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ে তদ্ভব শব্দ সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি রচনাংশেই দেশী, বিদেশী শব্দ কম-বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশী, বিদেশী শব্দের এই প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁর ভাষাকে মুখের ভাষার নিকটস্থ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিষয়ের দাবি তাঁর ভাষারীতিকে পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব বাড়লে তার ভাষার গুরুত্ব বেড়েছে। আবার বিষয়ের গুরুত্ব কমলে রীতির গুরুত্ব কমেছে। এই দ্বন্দ্বের চরিত্র হল—উল্লম্ব বা পরিমাপ দণ্ডের সবচেয়ে ওপরে আছে তৎসম শব্দ এবং নীচে আছে কথ্য বাংলা। এই বিষয়টি ছকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

বিষয় ও ভাষার গুরুত্বের ক্ষেত্র

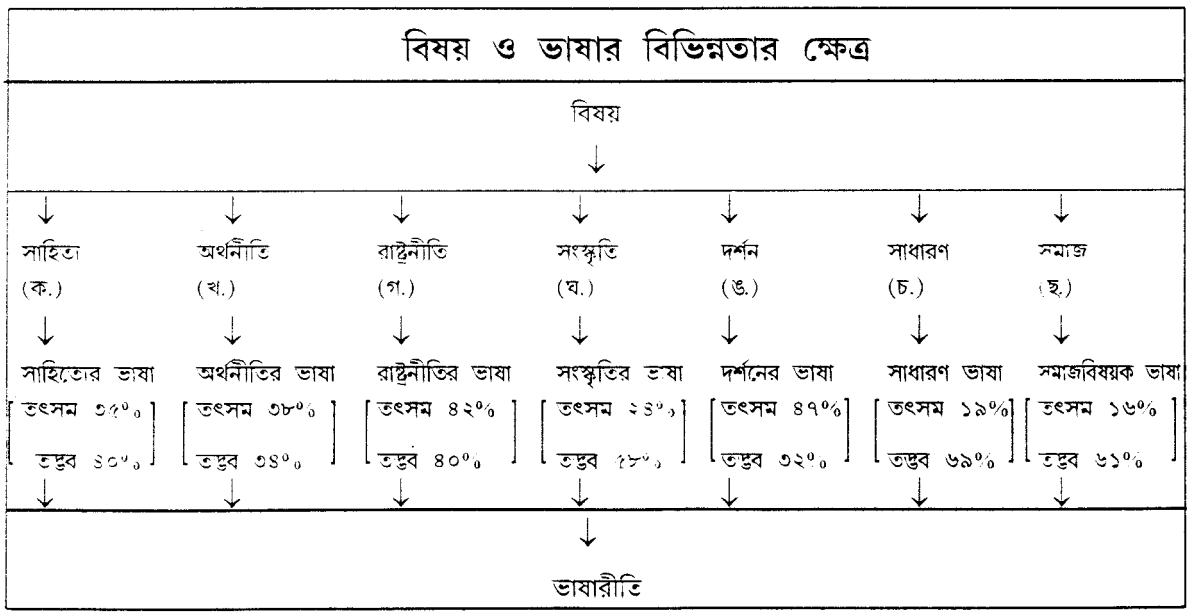
বিষয় :			ভাষা :	
গাম্ভীর্যপূর্ণ	['ঙ'. দর্শন]	→	গাম্ভীর্যপূর্ণ	[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ১৫% বেশী]
↑				
মাঝারি	['খ'. অর্থনীতি]	→	মাঝারি	[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ৪% বেশী]
↑	[গ. রাষ্ট্রনীতি]			[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ২% বেশী]
সাধারণ	['ক'. সাহিত্য]	→	সাধারণ	[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ৫% কম]
↑				
হাল্কা	['ঘ'. সংস্কৃতি]	→	হাল্কা	[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ৩৪% কম]
↑				
অতি হাল্কা	['ছ'. সমাজবিজ্ঞান]	→	অতি হাল্কা	[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ৪৫% কম]
	['চ'. সাধারণ বিষয়]			[তদ্ভব শব্দের তুলনায় তৎসম ৫০% কম]

এখানে বিষয়ের অন্তর্গত 'অতি হাল্কা', 'হাল্কা', 'সাধারণ', 'মাঝারি', 'গাম্ভীর্যপূর্ণ' ইত্যাদি শব্দগুলি উল্লম্ব গতির সূচক। ভাষা অন্তর্গত তদনুরূপ শব্দগুলিও একই ভাবে উল্লম্ব গতির সূচক। অর্থাৎ বিষয়ানুসারী গদ্যের ছাঁদ বদলেছে। কিন্তু এমন কোন কোন বিষয় আছে—যেখানে 'উঁচু', 'নীচু', 'মাঝারি' ইত্যাদি যে কোন রীতির একটিতে লেখা চলে। একে নিরপেক্ষ বা Neutral বিষয় বলা যায়। যেমন সাহিত্যের বিষয়ে একাধিক রীতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১ম খন্ড) গ্রন্থ থেকে একটি সাহিত্যের অংশ তুলে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে।

"সীমায় আর অসীমে লড়াই বা দ্বন্দ্ব হ'চ্ছে, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব আর রবীন্দ্র-কাব্যের খুব মোটা কথা। অন্য এক তরফ হ'তে এই দ্বন্দ্ব হ'চ্ছে মানবিকতা আর ভগবদ্ভক্তির লুকোচুরি খেলা। রবীন্দ্র-চিত্তে যদি কিছু সমন্বয় থাকে, তবে তা ঢুঁড়তে হবে তাঁর প্রকৃতি-নিষ্ঠায়। রবি একমাত্র আনন্দের বেপারী নন। রবীন্দ্র-কাব্য 'আশান্ত' রসও বেঁটেছে দেদার।"

এখানে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশী শব্দ প্রয়োগের শতকরা হিসাব যথাক্রমে ৫০%, ৩০%, ১১%, ৯%। অর্থাৎ গুরুগম্ভীর রীতির দ্বারা এখানে গাম্ভীর্য রক্ষা করা হয়েছে। আবার উপরের ব্যাখ্যায় দেখা গেছে যে, সাহিত্যের বিষয়ের আলোচনায় সাধারণ রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব বিনয় সরকার 'সাহিত্য' বিষয়ক আলোচনায় বিশেষ কোন রীতির আশ্রয় নেননি। বিষয় এখানে রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি।

আবার বিষয়ের বিভিন্নতার জন্য—ভাষারীতিকেও বিভিন্ন হতে হয়। অর্থাৎ অনুভূমিক (Horizontal) পার্থক্যের হিসাব করা যেতে পারে। আচার্য সরকারের রচনায় অনুভূমিকভাবে ভাষারীতির ক্ষেত্র বন্টিত হয়েছে। এই বিষয়টিকে ছকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।



বিষয়ভেদে ভাষারীতির ভেদ—এই বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করলেও, তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাতের ছাপ সূক্ষ্মভাবে মুদ্রিত হয়েছে। দ্রুত প্রকাশক্ষম কথ্য শব্দে কার্যোদ্ধার হলে, তিনি তৎসম শব্দের ওপর নির্ভর করতেন না। তাই তাঁর রচনায় দেশী, বিদেশী শব্দের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর রচনায় তৎসম বা তদ্ভব, কোন শব্দ প্রাধান্য পাবে—তা রচনাকারের শিল্পরুচির ওপর নির্ভর করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি সম্বন্ধে নারায়ণ চৌধুরী অভিযোগ করেন— **"চলতি ভাষারীতির অন্যতম প্রধান প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শক্তিশালী গদ্যলেখক, তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে তাঁর ভাষারীতিও অতিমাত্রায়**

ভঙ্গিসর্ব্বস্ব। ভঙ্গি বাদ দিলে বীরবলী গদ্যের বিশেষ কিছু থাকে না। বীরবলী গদ্যের উপর গভীর বিষয়ের ভর কোনদিন সয়নি এবং দেখা গেছে প্রথম চৌধুরী মহাশয়কে আদর্শ ধরে নিয়ে পরবর্ত্তীকালে যে সব লেখক আমাদের দেশে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের কেউ চিন্তাগাম্ভীর্য আয়ত্ত করতে পারেনি।" [১২] প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতি সম্পর্কে এই উক্তি যথার্থ বলেই মনে হয়। বিনয় সরকারের গদ্যরীতি সম্পর্কে যাঁদের অভিযোগ আছে তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, সরকারী গদ্যে গম্ভীর বিষয়ের ভর সয়। তিনি তাঁর নতুন স্টাইল সংক্রান্ত পরীক্ষায় যে সফল হয়েছেন, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই গদ্যে 'হাল্কা', 'মাঝারি', 'সাধারণ', 'গম্ভীর' ইত্যাদি সব ধরণের বিষয়েরই ভর সয়।

বিনয় সরকারের স্টাইলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল, তিনি বাংলা ভাষার জাত মেরেছেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেনের ভাষায়—"যাঁরা বাংলা আভিজাত্য রক্ষার পক্ষপাতী, তাঁরা বলেছেন বিনয়বাবু বাংলা ভাষার জাত মেরে চরম অবিনয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। বিনয়বাবুর তরফ থেকে এ কথার বিনীত উত্তর হচ্ছে এই যে, বাংলা ভাষার জাত এত ঠুনকো নয় যে, এত সহজে তা ভেঙ্গে যাবে। আমি বাংলা ভাষার জাত মারিনি, বরঞ্চ তার ভেতর নতুন রক্তকণিকার সঞ্চার করে তাকে সুস্থতর ও সবলতর করতে চেয়েছি।" [১৩]

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড), ১৯৫৭, 'আমার কথা', পৃঃ ৩০৩।

২. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক', ১৯৭২, পৃঃ ৯৬-৯৮।

৩. নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 'ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ', ১৯৮৩ (১ম প্রকাশ), পৃঃ ১

৪. তদেব, পৃঃ ৬২।

৫. তদেব, পৃঃ ৬৪।

৬. Leonard Bloomfield : Language. Indian Edition of 1963, Motilal Banarandass Delhi, pp. 444 - 495 (first published, 1933).

৭. U. Weirich. Langnages in Contact. New York. 1953.

৮. Leonard Bloomfield. op. cit. Page-444.

৯. নচিকেতা ভরদ্বাজ, 'আমার প্রথম দেখা বিনয় সরকার' (প্রবন্ধ)/ আচার্য বিনয়কুমার সরকার— তঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ ৩২।

১০. পবিত্র সরকার, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', ১৯৮৫, পৃঃ ১০৩।

১১. তদেব, পৃঃ ৭৭।

১২. নারায়ণ চৌধুরী, 'বাংলার সংস্কৃতি', ১৯৫৬, পৃঃ ৪৮-৪৯।

১৩. ত্রিপুরাশংকর সেন, 'সোনার বাংলা', ১৯৪৯, পৃঃ ৫০।

— ঃ —

—ঃ দশম অধ্যায় ঃ—

বিনয় সরকারী বিশিষ্ট শব্দচয়ন



* * * * *

বিনয় সরকারী বিশিষ্ট শব্দচয়ন

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
১	মতলব	আরবী	মত্‌লব্‌	উদ্দেশ্য
২	দুনিয়া	আরবী	দুন্‌যা	জগৎ
৩	এক-দামড়ি	দেশী	সংস্কৃত-(দ্রম্ম+ড়ি)	এক কানাকড়ি
৪	সমঝা	তদ্ভব	সংস্কৃত-(সম্‌)+√বুধ্‌ (প্রাকৃত –√বুঝঝা) >বাংলা-(√সম্‌বুজ্‌ঝা)>সমঝা	ভাল করে বুঝা
৫	নয়া-নয়া	হিন্দী	নয়া-নয়া	নূতন-নূতন
৬	ধুরন্ধর	তৎসম	ধুরা+√ধৃ +অ (খচ্‌)-ক, হ্রস্ব, ম্‌ (মুম্‌); উ.তং স্ত্রী-রা	শ্রেষ্ঠ
৭	বাঙালীর-বাচ্চা	তদ্ভব	সংস্কৃত্র বাঙালা)+সংস্কৃত (ঈয়)>বাঙ্গালা+ ই >বাঙালী; সংস্কৃত (রৎস)>প্রাকৃত (বচ্ছ)> বাংলা (বাচ্চা)	বাঙালীর বীর সন্তান
৮	বাপকা-বেটা	তদ্ভব	সংস্কৃত (রপ্র)>প্রাকৃত (রপ্প)> বাংলা (বাপ্‌)+কা > বাপকা সংস্কৃত (পুত্র)>প্রাকৃত (রিট)>বাংলা (বিটা)>বেটা	ক্ষমতাবান পুরুষ
৯	মোতায়েন	আরবী	মুতাআ'য়ন্‌	নিযুক্ত
১০	জবরদস্ত	আরবী	জ.বর্‌দস্‌ত্‌	জোরালো
১১	গন্ডা-গন্ডা	দেশী	সংস্কৃত (গন্ডক)>প্রাকৃত (গংডঅ)>বাংলা (গন্ডা)	অনেক
১২	কাপে-কাপে-মিল	দেশী	সংস্কৃত(কাপট্য)>বাংলা(কাপ)+এ>কাপে সংস্কৃত (√মিল্‌)>প্রাকৃত(মিল)>বাংলা (মিল)	মাপসই
১৩	হরদম্‌	ফারসী	হ.র্‌দম্‌	সর্ব্বদা
১৪	মাফিক	আরবী	মরাফি.ক্‌	অনুযায়ী
১৫	চিহ্নোৎ	তদ্ভব	সংস্কৃত (চিহ্নয়তি)>বাংলা (চিহ্ন)+ৎ>চিহ্নোৎ	লক্ষণ
১৬	মাল	আরবী	মাল্‌	জিনিষ
১৭	তলব	আরবী	ত.লব্‌	ডেকে পাঠান
১৮	কম্‌-সে-কম্‌	ফারসী/ (কম)	কম্‌-সে-কম্‌	কমপক্ষে
১৯	বেআড়া	ফারসী	বেরাহ্‌	দুষ্ট
২০	বে-আক্কেল	ফারসী/ (বে) আরবী/ (অক্‌.ল)	বে-অক্‌.ল	বুদ্ধিহীন

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
২১	অ-সুর	তদ্ভব	উপসর্গ (অ)+সংস্কৃত (√সুর্) +অ> বাংলা (সুর)	সুরহীন
২২	কিম্মৎ	আরবী	কী.মত	মূল্য
২৩	ম্যাড়াকান্ত	দেশী/ (ম্যাড়া) তৎসম/ (কান্ত)	সংস্কৃত (মেঢ়)>প্রাকৃত(মেড়্ঢ, মেংঢ) >বাংলা ০ঢ়া,-ড়া √কম্ + ত (ক্ত)-ন্ম	বোকা
২৪	ইজ্জৎ	আরবী	ই'জ্.জ.ত্	সম্ভ্রম
২৫	দস্তুর	ফারসী	দস্তূর	রীতি
২৬	পাঁতি	তদ্ভব	সংস্কৃত (পঙতি)>প্রাকৃত (পন্তি, ০তি)> বাংলা (পংতি)	শ্রেণী
২৭	চেলা	হিন্দী	চেলা	দাস
২৮	বুখ্নি	হিন্দী	বু ক নী	কথার ফোড়ন
২৯	তোবা-তোবা	আরবী	তঊবহ্	পাপ কথা শ্রবনে অনুতাপ সূচক শব্দ
৩০	ঘুঁটে দেখা	দেশী	সংস্কৃত (ঘুট্)+অ>(বাংলা (ঘুট)+এ> বাংলা (ঘুটে) সংস্কৃত (√ দৃশ্)>প্রাকৃত (√দেক্খ)> বাংলা(দেখ)+ আ>বাংলা (দেখা)	তলিয়ে দেখা
৩১	গুলজার	ফারসী	গুলজার্	কোলাহলপূর্ণ
৩২	মুড়োর-ঘি	দেশী	সংস্কৃত (মুণ্ড)>প্রাকৃত (মুংড)>বাংলা (মুড়ো) সংস্কৃত (ঘৃত)>প্রাকৃত (ঘি অ)>বাংলা (ঘি)	মাথার বুদ্ধি
৩৩	কুদরত	আরবী	কু.দ্রত্	ক্ষমতা
৩৪	মগজ	ফারসী	মগজ্	মস্তিষ্ক
৩৫	তারিফ্	আরবী	ত'রীফ্	প্রশংসা
৩৬	টক্কর	হিন্দী	টককর	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
৩৭	বেড়ে	হিন্দী	বঢ়িয়া	উত্তম
৩৮	মুদ্দা	আরবী	মুদ্দা'আ	অভিপ্রায়
৩৯	বিলকুল	হিন্দী	বিলকুল	অনুরূপ
৪০	ছিকেয়	দেশী	সংস্কৃত(শিক্যা)>প্রাকৃত(সিক্কা)>বাংলা (শিক্যা)> স্বরাগমে (শিকিয়া)>(ছিকে)	প্রসঙ্গহীন করে রাখা

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
৪১	কোঠে	দেশী	কোথা+এ>কোথে>কোঠে	স্থানে
৪২	বুজরুক	ফারসী	বুজ্.রগ	সাধুবেশী ধূর্ত্ত
৪৩	ঢুঁঢ়তে	দেশী	সংস্কৃত(√ঢুন্ঢ)>প্রাকৃত (√ঢুন্ঢুল্ল)> বাংলা(√ঢুঁঢ)>ড়	খুঁজতে
৪৪	জরীপ	আরবী	জরীব্	জমি মাপা
৪৫	বয়েৎ	আরবী	বয.ত্	বয়ান করা
৪৬	মোলাকাৎ	আরবী	মুলক.াত	সাক্ষাৎকার
৪৭	দস্তুল	দেশী	(√দন্ভ্) +অ (ঘঞ্)-ভা+(ল)	অযথার্থ ব্যবহার
৪৮	তথ্য-নিষ্ঠ	তৎসম	সংস্কৃত(তথ্য+অ)>সংস্কৃত (তথ্য) সংস্কৃত(নি+স্থা+অ)>সংস্কৃত (নিষ্ঠ)	তথ্যপূর্ণ
৪৯	চিজ	পারসী	চীজ্	বস্তু
৫০	বস্তু-নিষ্ঠ	তৎসম	সংস্কৃত (√বস্+তু)>সংস্কৃত (বস্তু) সংস্কৃত (নি+√স্থা+অ)>সংস্কৃত (নিষ্ঠ)	বস্তুর
৫১	কট্টর	দেশী	সংস্কৃত(কৃত্ত)>প্রাকৃত (কট্ট)+র>বাংলা (কট্টর)	গোঁড়া
৫২	পাকড়াও	দেশী	সংস্কৃত (প্র)+√কৃষ্ (কর্ষ)> প্রাকৃত (√পকড়্ঢ) >বাংলা (পকড়)	ধরা
৫৩	ঠারে-ঠোরে	দেশী	সংস্কৃত (স্তব্ধ)>প্রাকৃত (ঠড়্ঢ)> বাংলা (ঠার)+এ>ঠারে হিন্দী (ঠৌর)> বাংলা-(ঠোর)+এ>ঠোরে	মোটামুটি
৫৪	তরফ্	আরবী	ত.রফ্	পক্ষ
৫৫	গরুমি	তদ্ভব	সংস্কৃত(গো)>প্রাকৃত (গোণ)> বাংলা (গরু)+মি -প্রত্যয়>গরুমি	বোকামি
৫৬	কপচান	তদ্ভব	সংস্কৃত (√কৃন্ত) (হিংসা)>কপ্প (প্রা.ম)>বাংলা (√কপ)√কপচা	বিরক্তিকর কথা বলা
৫৭	মালুম	আরবী	মরলূম্	জ্ঞাত
৫৮	নকড়া-ছকড়া	হিন্দী	নকড়া-ছকড়া	নষ্ট
৫৯	নয়া-পুরাণা	হিন্দী	নয়া-পুরাণা	নূতন-পুরাতন
৬০	সোআদ	দেশী	স্বাদ>(সুআদ>সু আ (য়া) দ) দ; সওয়াদ	স্বাদ
৬১	হদিশ্	আরবী	হুদীস্	সন্ধান
৬২	কায়েম	আরবী	কা.য়ম্	নির্দ্ধারিত

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
৬৩	চাক্‌রে	পারসী	চাকর্+এ>চাক্‌রে	চাকুরী করে যে
৬৪	জবর	আরবী	জ.বর্	উৎকৃষ্টতর
৬৫	খতিয়ান	হিন্দী	খতিয়ৌনী	খতিয়ে দেখা
৬৬	মেহনৎ	আরবী	মহন্‌ত	পরিশ্রম
৬৭	চোপর	তদ্ভব	চৌপ্রহর>চতুষ্প্রহর>চোপর	চারপ্রহর
৬৮	ওয়াকিব-হাল	আরবী	ৱাকি.ফ্.-ই-হাল্	অভিজ্ঞ
৬৯	এক-কাঁচ্চা	হিন্দী	এক-কচ্চা>এক-কাঁচ্চা	এক অংশ
৭০	চুমড়ে	দেশী	(√চম্)+উ+অর (অরচ্)-ক+(এ)	নিংড়ে
৭১	কোস্তাকুস্তি	ফারসী	কোশ্‌তা-কুশ্‌তী	কুস্তি করা
৭২	ফারাক	আরবী	ফ.র্‌ক	প্রভেদ
৭৩	মোসাফির	আরবী	মৱসাফি.র্	পথিক
৭৪	চেঁড়ে	দেশী	সংস্কৃত (চন্ড)	প্রবল ইচ্ছা
৭৫	দাওয়াই	আরবী	দৱা	ঔষধ
৭৬	দরিয়া	ফারসী	দরয়া	সমুদ্র
৭৭	পানি	তদ্ভব	সংস্কৃত (পানীয়)>পালি (পানীয়), প্রাকৃত (পানিঅ)>বাংলা (পানি)	জল
৭৮	সওদা	ফারসী	সৱদা	বাণিজ্য
৭৯	চোঁথা	মারাঠী	চোঁথা	বাজে
৮০	হাত-মক্‌স	তদ্ভব/ (হাত) আরবী/ (মক্‌স)	সংস্কৃত (হস্ত)>প্রাকৃত (হাথ)>বাংলা (হাত) মশ্‌ক্	হাত-যশ
৮১	পারিত্-পক্ষে	তদ্ভব	পারয়ৎ>°ৎ+পক্ষে	কমপক্ষে
৮২	বাংলামি	তদ্ভব	সংকৃত(বাঙ্গালা)>বাংলা (বাংলা) +মি-প্রত্যয়>বাংলামি	বাংলার মতন
৮৩	কেতাব	আরবী	কিতাব	পুস্তক
৮৪	তাজা	ফারসী	তাজ.	টাটকা
৮৫	একতিয়ার	আরবী	ইখ্‌ত্‌য়ার্	অধিকার
৮৬	পুছে	তদ্ভব	সংস্কৃত(√প্রচ্ছ)>পালি, প্রাকৃত(√পুচ্ছ)> বাংলা (√পুছ) + এ>পুছে	জিজ্ঞাসা করা

com-2 3rd proof

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
৮৭	বাৎলান	হিন্দী	বতলান	বুঝান
৮৮	মজ্‌লিস্‌	আরবী	মজ্‌লিস্‌	আসর
৮৯	চাংগা	হিন্দী	চাংগা	সতেজ
৯০	চ্যাংড়া	হিন্দী	চাঁগলা	বালক
৯১	সাক্‌রেৎ	হিন্দী	সাকরেত	অনুগামী
৯২	তোয়াজ	ফারসী	তরাজ্‌উ'	আদর-অভ্যর্থনা
৯৩	ফেলিতব্য	তদ্ভব	সংস্কৃত (√ক্ষিপ্‌)>প্রাকৃত (ফেল্ল)>বাংলা (০ল+ই)>বাংলা (ফেলি)+তব্য (প্রত্যয়)	ফেলে দেওয়ার যোগ্য
৯৪	হালত্‌	আরবী	হালত্‌	দশা
৯৫	দুস্‌মন	ফারসী	দুশ্‌মন্‌	শত্রু
৯৬	টিট্‌	দেশী	সংস্কৃত (ধৃষ্ট)>প্রাকৃত (ধিট্‌ঠ)>বাংলা (ধীট)>টীট>(টিট)	ঠিক
৯৭	একবগ্‌গা	দেশী	- - -	জেদী
৯৮	পরখ্‌	তদ্ভব	সংস্কৃত (পরি+√ ঈক্ষ্‌)>প্রাকৃত (√পরিক্‌খ)>বাংলা(√পরিখ)>পরখ্‌	পরীক্ষা
৯৯	বোলচাল	মারাঠী	বোলাচাল	কথা ও ব্যবহার
১০০	মস্‌গুল্‌	আরবী	মশ্‌গূল্‌	আবিষ্ট
১০১	সুজ	দেশী	প্রাকৃত (সুজ্‌ঝংত)	দেখা
১০২	বে-মাল	ফারসী/(বে) আরবী/(মাল্‌)	বে-মাল্‌	অনায়াসে
১০৩	হামেশা	ফারসী	হ্‌মেশহ্‌	সর্ব্বদা
১০৪	চাপ্‌রাস্‌	হিন্দী	হিন্দী (চাপড়>চাপ)+হিন্দী (রস্‌সী)	অভিজ্ঞান
১০৫	আদ্‌মি	ফারসী	আদ্‌মী	মানুষ
১০৬	ফতোআ	আরবী	ফ.ত্‌রা	কাজীর রায়
১০৭	ক্যার্দ্দানি	ফারসী	কার্‌দানি	কর্ম্মপটুত
১০৮	সব্‌সে-সেরা	হিন্দী	সব্‌সে-সিরা	সবচেয়ে ভালো
১০৯	কাম	তদ্ভব	সংস্কৃত (কর্ম্ম)>পালি, প্রাকৃত (কম্ম)>বাংলা (কাম)	কাজ

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
১১০	গরীব-গুর্ব্বা	ফারসী/ (গ.রীব্) তৎসম/ (গুর্ব্বা)	গ.রীব্ সংস্কৃত [(গুরু)+অ>]	গরীব লোক
১১১	হিস্যা	আরবী	হিস্‌স	অংশ
১১২	কুছ-পরোআ	হিন্দী/ (কুছ) ফারসী/ (পর্‌রা)	কুছ-পর্‌রা	কিছু চিন্তা
১১৩	বেপারী	হিন্দী	সংস্কৃত(ব্যাপারী)>হিন্দী (বেপারী)	ব্যবসায়ী
১১৪	আলবৎ	আরবী	অল্‌বতহ্	নিশ্চিত
১১৫	চোস্ত	ফারসী	চুসত্	ঠিক মাপ মত
১১৬	খাঁক্‌তি	হিন্দী	হিন্দী(খাঁগ+তি)	অভাব
১১৭	আস্‌মান	ফারসী	আস্‌মান	আকাশ
১১৮	বাম্‌নামি	তদ্ভব	(ব্রহ্মণ+অ)>(ব্রাহ্মণ)>(বামন)+(মি-প্রত্যয়)	ব্রাহ্মণগিরি
১১৯	কেজো	দেশী	(কাজ+উয়া)>কাজুয়া>(কোজো)>কেজো	কর্ম্মদক্ষ
১২০	হাঁসিল	আরবী	হাসিল্	সফল
১২১	মার্কামারা	Portuguese /(Marka) হিন্দী (মারা)	(Marka-মারা)	বিশেষ চিহ্নযুক্ত
১২২	পেটোআ	দেশী	দেশী-(পোট্ট)>প্রাকৃত (পেট)> বাংলা (পেট)+উআ > পেটোআ	অনুগত
১২৩	মহোচ্ছব	প্রাকৃত	মহোচ্ছব	মহোৎসব
১২৪	দিলদেরিয়া	ফারসী	দিল্‌দর্‌যা	উদার
১২৫	মেলমেশ	তদ্ভব	সংস্কৃত(√মিল্)> প্রাকৃত (√মিল>মেল) সংস্কৃত (√মিশ্র)>মিশ্রয়>পালি, প্রাকৃত (মিস্‌স)>মিশ>মেশ	মেলামেশা
১২৬	ইয়ার	ফারসী	যার্	বন্ধু
১২৭	মজুত	আরবী	মৌজদ্	বর্ত্তমান
১২৮	ধান্ধা	দেশী	ধন্দা,-ন্ধা, ধন্ধা	উদ্দেশ্য
১২৯	কোরা	হিন্দী	কোরা	নূতন

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
১৩০	কছরত	আরবী	কস্‌রত্‌	পরিশ্রম
১৩১	ঘোট-মঙ্গল	তদ্ভব/ (ঘোট)	√ঘুঁট্‌ >ঘোঁট > ঘোট	জট পাকানো
		তৎসম/ (মঙ্গল)	[ল+অ (অচ) অস্ত্যর্থে]	
১৩২	শল্লা	আরবী	সলাহ্‌	পরামর্শ
১৩৩	ত্যাঁদড়	দেশী	সংস্কৃত (ছিত্বর)>প্রাচীন বাংলা (আছিদার)>ছেদর>চ্যোঁদর>ত্যোঁদর	বেয়াড়া
১৩৪	খতম	আরবী	খ.তম্‌	শেষ
১৩৫	সুরৎ	আরবী	সূরত্‌	মুখ
১৩৬	পায়দা	ফারসী	পয্‌দা	উৎপাদিত
১৩৭	আগাপাছা	তদ্ভব	সংস্কৃত (অগ্র)>প্রাকৃত (অগ্‌গ)>বাংলা (আগ-গা) সংস্কৃত (পশ্চাৎ) >পচ্ছা >বাংলা (ছা)	আগে-পেছনে
১৩৮	চোআঁড়	হিন্দী	চুহড়া	উগ্র স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি
১৩৯	মোসাবিদা	আরবী	মুসব্‌বদাহ্‌	দলিলের খশড়া
১৪০	দেদার	ফারসী	দীদার্‌	প্রচুর পরিমাণ
১৪১	কসুর	আরবী	ক.সূর্‌	অপরাধ
১৪২	ছেলেমি	দেশী	ছাইলা>ছেল্যে>ছেলে +(মি) প্রত্যয় > ছেলেমি	ছেলেমানুষী
১৪৩	হাম্‌বড়ামি	তদ্ভব/ (হাম্‌)	সংস্কৃত (অস্মদ্‌)>প্রাকৃত (হম) বাংলা (হাম)	অহঙ্কার
		হিন্দী/ (বড়া)	হিন্দী (বড়া)+মি (প্রত্যয়) > বড়ামি	
১৪৪	কর্তামি	তৎসম	সংস্কৃত (√কৃ)+সংস্কৃত (তৃ) + প্রত্যয় (মি)	কর্তাগিরি
১৪৫	ইস্তাফা	আরবী	ইস্‌ত্‌অফা	ক্ষমা প্রার্থনা
১৪৬	জমিন্‌	ফারসী	জ.মীন্‌	মাটি
১৪৭	সমঝৌতা	তদ্ভব	সংস্কৃত (সম্‌)+√বুধ (প্রাকৃত √বুজ্‌ঝ) > বাংলা (√সম্‌বুজ্‌ঝ) সমঝ	ভাল বোঝাপড়া
১৪৮	যুক্তি-নিষ্ঠ	তৎসম	সংস্কৃত (যুজ্‌)+তি> সংস্কৃত(যুক্তি) সংস্কৃত (নি+√স্থা + অ >সংস্কৃত (নিষ্ঠ)	যুক্তিপূর্ণ
১৪৯	চুকলি	ফারসী	চুগলী	পরোক্ষে নিন্দা

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
১৫০	কেঠো	দেশী	কাঠ +উয়া>কাঠুয়া>কাঠো>কেঠো	শুষ্ক
১৫১	আর্য্যামি	তৎসম	সংস্কৃত [√ঋ+য(ণ্যেৎ)] + মি (প্রত্যয়)	কৌলিন্য
১৫২	দোস্ত	ফারসী	দোস্‌ত্‌	বন্ধু
১৫৩	তঙ্খা	ফারসী	তন্‌খ্‌বাহ্‌	বেতন
১৫৪	সমঝদার	তদ্ভব	সংস্কৃত (সম্‌)+√বুধ্‌ (প্রাকৃত√বুজ্‌ঝ) >বাংলা (√সম্‌বুজ্‌ঝ)>সমঝ	যে ভাল করে বুঝতে সক্ষম
১৫৫	বে-আকুব	ফারসী/ (বে) আরবী/ (বকুফ্‌)	বেবকুফ্‌	নির্বোধ
১৫৬	ভাটিয়ে	দেশী	সংস্কৃত (বর্ত্মন্‌)>প্রাকৃত (বট্ট)>হিন্দী (বাট) >বাংলা (ভাট) + ইয়ে > ভাটিয়ে	উজান বেয়ে
১৫৭	মহাল্লা	আরবী	মহল্লহ্‌	বাড়ী
১৫৮	জোআন	ফারসী	জবান্‌	তরুণ
১৫৯	হামদর্দি	হিন্দী/ (হম) ফারসী/ (দর্‌দ্‌)	(হম-দর্‌দ্‌)+ই	সহানুভূতি
১৬০	হাটুআ	তদ্ভব	সংস্কৃত (হট্ট) >হিন্দী (হাট) উহা > (উ আ) উয়া	যারা হাটে কেনা-বেচা করে
১৬১	নদারৎ	হিন্দী	নদারদ	নিষ্ঠুর
১৬২	শরীফ	আরবী	শরীফ্‌	অভিজাত
১৬৩	বুড়োমি	তদ্ভব	সংস্কৃত(বৃদ্ধ) >পালি, প্রাকৃত (বুড্‌ঢ)+মি-প্রত্যয়	বুড়োমানুষী
১৬৪	টেনেবুনে	দেশী	- - -	টেনেটুনে
১৬৫	সাচ্চা	হিন্দী	সচ্চা	সত্য
১৬৬	কলিজাওয়ালা	হিন্দী	কলেজা+ওয়ালা (প্রত্যয়)	হৃদয়বান
১৬৭	ধুমধারাক্কা	হিন্দী	ধূমধড়ক্কা	সমারোহ
১৬৮	আলটপ্‌কা	তদ্ভব/ (আল্‌) হিন্দী/ (টপ্‌কা)	সংস্কৃত(√হেল্‌)>বাংলা (√এল) বাংলা (আল) হিন্দী (টপ) > কা)	ফালতু

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
১৬৯	জোর্‌সে	ফারসী	জে.ার্‌	শক্তিধরভাবে
১৭০	ঢাউস	তদ্ভব	সংস্কৃত (√ধাব্‌)	বৃহৎ
১৭১	নাম-কে-বাস্তে	হিন্দী	নাম-কে-বাস্তে	নামমাত্র
১৭২	দো-আঁশলা	তদ্ভব	সংস্কৃত (দ্বৌ) >প্রাকৃত (দো) দো+আঁশ (অংশ)+আলা	দুই অংশ মিশ্রিত
১৭৩	তামাম	আরবী	তমাম্‌	সমস্ত
১৭৪	সওয়াল	আরবী	সৱাল্‌	প্রশ্ন
১৭৫	আর্ন্তমানুষিক	তৎসম	সংস্কৃত [(অন্তর্‌)+অ (অণ্‌)] [সংস্কৃত (মানুষ) ইক (ঠক্‌)]	পরস্পর মানুষ-সম্পর্কিত
১৭৬	নকরি	ফারসী	নউকরী	চাকরী
১৭৭	নসিব	আরবী	নসীব্‌	ভাগ্য
১৭৮	ফারমান্‌	ফারসী	ফ.র্‌মান্‌	হুকুমনামা
১৭৯	পরেযান্‌	ফারসী	পরেশান্‌	বিব্রত
১৮০	মারফৎ	আরবী	মার.ফত্‌	মাধ্যমে
১৮১	শড়ক	আরবী	শরক্‌	রাস্তা
১৮২	মুল্লুক	আরবী	মুল্‌ক্‌	দেশ
১৮৩	ইস্তামাল	আরবী	ইস্‌ত্‌অ'মাল্‌	অনুশীলন
১৮৪	তদ্‌বির	আরবী	তদ্‌বীর্‌	বন্দোবস্ত
১৮৫	দিল	ফারসী	দিল্‌	হৃদয়
১৮৬	বকেয়া	আরবী	বকীয়া	বাকী
১৮৭	বাড়তি	হিন্দী	বঢ়তী	বৃদ্ধি
১৮৮	জরুরি	আরবী	জ.রূরী	দরকারী
১৮৯	ওস্তাদ	ফারসী	উস্‌তাদ্‌	পাকা লোক
১৯০	মুরুব্বি	আরবী	মুরব্‌বী	পৃষ্ঠপোষক
১৯১	হরেকরকম	ফারসী/ (হ.র্‌) (হ.র্‌)+এক >হরেক ফারসী/ (রক. ম্‌)	(হ.র্‌+এক)-রক.ম্‌	নানা প্রকার

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
১৯২	কাঠখড়	তদ্ভব	প্রাকৃত-(কাঠ) সংস্কৃত-(খড়)	উদ্যোগ
১৯৩	তাঁবে	আরবী	তাবা	অধীনতা
১৯৪	কাবু	তুর্কী	কাব্উ	আয়ত্ব
১৯৫	জুলুম	আরবী	জু.ল্ ম্	অত্যাচার
১৯৬	উড়ু -উড়ু	তৎসম	উদ্+√ঊী+উ (ড়ু)-ক	অস্থির
১৯৭	টনটনে	দেশী	টোন> ন>টন, টনটন+এ	নিখুঁত
১৯৮	বোলচাল	মারাঠী	বোলাচাল	কথা এবং ব্যবহার
১৯৯	বর্দাস্ত	ফারসী	বর্দাশ্ত্	সহ্য
২০০	হিংসাধর্মী	তৎসম	(√হিংস)+আ (√ ধৃ)+ম (মন্)-ক+ই	হিংসা জাতীয়
২০১	শক্তিধর্মী	তৎসম	(√শক্)+তি (ক্তিন্)-ণ+ই (√ ধৃ)+ম (মন্)-ক + ই	শক্তি জাতীয়
২০২	গড়ন	পারসী	গ.রন্	আকার
২০৩	আড্ডা	হিন্দী	অড্ডা	সমবেত হওয়া
২০৪	বাঘাবাঘা	তদ্ভব	বাঘ +অ >বাঘ+আ>বাঘা	দুর্দান্ত
২০৫	প্রাবন্ধিক	তদ্ভব	প্র+অ+√বন্ধ+ইক্	প্রকৃষ্ট বন্ধনকারী
২০৬	গাল্পিক	তদ্ভব	সংস্কৃত (জল্প) >বাংলা (গল্প)+ইক>গাল্পিক	যে গল্প করে
২০৭	লড়াই	তদ্ভব	[সংস্কৃত √নড্ >নড়>লড়]+[সংস্কৃত (ইত) >প্রাকৃত (ইঅ) >বাংলা (ই আ)>আ] +[সংস্কৃত (ঈয়)> বাংলা (ই)]	যুদ্ধ
২০৮	তোয়াক্কা	আরবী	ত্বক্.ক.'	প্রত্যাশা
২০৯	আল্লাহ্	আরবী	আল্লাহ্	পরমেশ্বর
২১০	বে-পরোআ	ফারসী/ (বে) আরবী/ (পরৱা)	বেপরৱা	ভয়হীন
২১১	মোতাবেক	আরবী	মুতাবিক্	অনুযায়ী
২১২	পয়জার	ফারসী	পয্জ.ার	চটিজুতা

ক্রমিক নং	বিশেষ শব্দ	কি জাতীয় শব্দ	মূল শব্দ	বাংলা অর্থ
২১৩	মজবুত	আরবী	মজ্‌বুত	দৃঢ়
২১৪	মুনাফা	আরবী	মুনাফা	লাভ
২১৫	পাঁড়	দেশী	পাণ্ডু	পাকা
২১৬	ঘায়েল	হিন্দী	ঘায়ল	আহত
২১৭	পহেলা	হিন্দী	পহলা	প্রথম
২১৮	ফিরিস্তি	ফারসী	ফি.হ্‌রিস্‌ত্‌	ফর্দ্দ
২১৯	মোস্‌লেম	আরবী	মুস্‌লিম্‌	মুসলমান
২২০	আন্তর্ধার্ম্মিক	তৎসম	সংস্কৃত [(অন্তর্)+অ (অণ্)]	পরস্পর ধর্ম-সম্পর্কিত
			সংস্কৃত [(ধর্ম্ম)+ইক (ঠক্)]	
২২১	চৌড়া	হিন্দী	চৌড়া	প্রশস্ত
২২২	তামাম	আরবী	তমাম্‌	সমস্ত
২২৩	স্যাঙ্গাত	দেশী	সাঙাত> ৎ	বন্ধু
২২৪	গলদ	আরবী	গ.লত্‌	ভুল
২২৫	গলিঘোঁচি	হিন্দী/ (গলী) তদ্ভব/ (ঘুঁজি>ঘোঁচি)	গলী-ঘুঁজি>গলী-ঘোঁচি	বাঁকাচোরা সঙ্কীর্ণ পথ
২২৬	কিচ্ছা	আরবী	কি.সহ্‌	গল্প
২২৭	লেড়কী	হিন্দী	লেড়কী	মেয়ে
২২৮	মুরোদ	ফারসী	মুর্‌দহ্‌	ক্ষমতা
২২৯	লেড়কা	হিন্দী	লড়কা	ছেলে
২৩০	কারবার	ফারসী	কার্‌বার্‌	ব্যবসা
২৩১	জেহাদ্‌	আরবী	জিহাদ্‌	যুদ্ধ
২৩২	ইমারত	আরবী	ই'মারত্‌	অট্টালিকা

— ৪ —

—ঃ একাদশ অধ্যায় ঃ—

উত্তর - কাল



* * * * *

উত্তর-কাল

জন্মের সঙ্গে শুরু হয় মানুষের বিচিত্র কর্মধারা এবং মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় তার সকল আচরণের, ছিন্ন হয় পার্থিব সংযোগ— ইহকাল পরিণত হয় পরকালে। কিন্তু জীবদ্দশায় বিভিন্ন কর্মের সুবাদে কিছু মানুষ মৃত্যুর পরও অমরত্ব লাভ করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক **Marcus Autoninus** এর ভাষায়—**"What springs form earth dissolves to earth again and heaven born things fly to their native seat."** (১)

প্রতিভাধর ব্যক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিভাই মানুষকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। **Willmott** বলেন— **"Genius finds its own road and carries its own lamp."** (২) অধ্যাপক বিনয় সরকার হলেন বিরল প্রতিভা। তিনি তাঁর স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিভিন্ন ভাষাবিদ ও ভুরিস্রষ্টা লেখক বিনয় সরকারের চিন্তা গতানুগতিকতায় বাধ্য নয়। চিন্তার প্রচণ্ড উচ্ছলতা তাঁর বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

"যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা বিবেকানন্দ তাঁর জীবনবেদে উল্লেখ করেছেন— ভাবের সেই উৎসাহ, কর্মোন্মাদনার সেই প্রচণ্ড উত্তাপ অতলান্ত মনীষার সঙ্গে অন্বিত করে বিনয়কুমার দেশ এবং জাতির প্রাণেও মনে বিকিরণ করেছেন বলে শতবর্ষোত্তরেও তিনি নিত্য স্মরণীয় ও প্রয়োজনীয় বলে আমাদের বিশ্বাস। আজকের সমাজ তথা শিক্ষা জগতের অবক্ষয়ের অমানিশীথিনীতে সেই আদর্শ শিক্ষাগুরু, নিঃস্বার্থ, দেশপ্রেমিক, মহামনীষীর নির্দেশিত পথ ও মত বড় বেশী গ্রাহ্য।" (৩)

নিজে বিদগ্ধ বহুভাষী হওয়া সত্ত্বেও, মাতৃভাষা বাংলার সাহায্যে কিভাবে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানার্জন করতে পারে— এ নিয়ে তিনি বহু চিন্তা করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, একটি জাতির সংস্কৃতি পুষ্ট হয় মাতৃভাষার সাহায্যে। পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিভাগে কেবলমাত্র ইংরেজ লেখকদের গ্রন্থ, পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করা হত। প্রধানতঃ বিনয়কুমারের প্রচেষ্টায় ভারতীয় ও দেশীয় লেখকদের গ্রন্থ এম. এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। শুধু ধনবিজ্ঞান নয়— সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়েও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। মাতৃভাষা বাংলার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বহু বছর আগে। বর্তমানকালে বাংলা ভাষায় রচিত উল্লিখিত বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁর এই প্রয়াসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিক্ষাকে বর্তমানকালের উপযোগী করা এবং মানসিক শিক্ষার সঙ্গে আত্মরক্ষার উপযোগী শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের উপযোগী করার ব্যবস্থা করা— এই ছিল তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য। বর্তমানকালে মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রমের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও Work Education আছে আজ থেকে বহু বছর আগে বিনয় সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

বিনয় সরকারী চলিত গদ্যের প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকদের উপর কতখানি— তা নিরূপন করাও এ পর্বের লক্ষ্য। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছে বর্তমানকালের চলিত গদ্যের লেখকদের ওপর। তাঁর ভাষা সাধুলেখকদের আদব কায়দা মেনে চলত না। চিন্তাশীলতা ও বাকপটুত্বের এক অপূর্ব মিশ্রণ ছিলেন তিনি। তাঁর কথার মধ্যে একটা নির্দোষ বীরত্ব ঝলকিত হত। অনর্গল প্রাকৃত বাংলা অর্থাৎ কথ্য বাংলার লক্ষ্যভেদী শব্দ ব্যবহারে তিনি চমকে দিতেন। তাঁর ব্যবহৃত বহু শব্দাবলী আজ আর সাহিত্যের আসরে অপাংক্তেয় নয়। একালের সাম্প্রতিক সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, বিভিন্ন শ্লোগানে বিনয় সরকারী শব্দগুলি নজরে পড়ে। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হবে—

(ক) সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঃ—

(১) "**দুনিয়ায়** কত কী ঘটে যাচ্ছে, খবর রাখবেন তো।" (বেগম মেরী বিশ্বাস (১ম খন্ড), বিমল মিত্র, পৃঃ-৬৩)

(২) "আরে মরদের **পয়দাই** হয়েছে সাদি করবার জন্যে আর মর্দানার **পয়দা** হয়েছে লেড়কা **পয়দা** করবার জন্যে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬২)

(৩) "আবার তোর ওই **বুজরুকী**?" (প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২৮)

(৪) "অল্প খরচে যাতে জনসাধারণ এলেম শিক্ষা করতে পরে, তার জন্য তিনি অনেক মক্তব মাদ্রাসা কায়েম করেছিলেন।" (নবীনদের জীবনসঙ্গিনী, এম আবদুর রহমান, পৃঃ-১৩)

(৫) "তারা তাঁকে আর বিবি সারা খাতুনকে **পাকড়াও** করে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে সরাসরি করলো হাজির।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫)

(৬) "চারিদিকে **দুশমন** ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৫)

(৭) "কেবল, তার চোখ দুটোর ভাবের যেন কোন **হদিশ** পাওয়া যেত না।" (অপরিচিত, সমরেশ বসু, পৃঃ-২৯)

(৮) "ওরা বলে তোমার কথায় আজ ছেড়ে দিচ্ছি, তবে ফের **বেয়াদবি** করলে ওই ট্যাকখালির রাজপুত্তুরকে আর ছাড়বো না।" (আপনজন, শক্তিপদ রাজগুরু, পৃঃ-১৩০)

(৯) "রতিকান্ত তাড়াতাড়ি **তারিফ** করার একটা ভঙ্গী করল, "ফার্স্ট ক্লাস"। (সেই দুটি চোখ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ-১০০)

(১০) "এরপর বিশুবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "অপরের ঘরে **মাল** রয়েছে।" (জন-অরণ্য, শংকর, পৃঃ-৬১)

(১১) "ভিড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে বিশুবাবু বলেছিলেন, "**দুনিয়াতে** যত ব্যবসা আছে তার মধ্যে এই অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা সবচেয়ে সহজ।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬১)

(১২) "সবচেয়ে দুঃখের কথা, গভরমেন্টও এদের কাছে **বে-মালুম** মিথ্যা কথা বলছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪৭)

(১৩) "—তুমি আর ন্যাকা সেজো না দাদা, বলি এই যে বাড়ির বৌরা সব মার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না করে সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছেন, মিটিঙে যাচ্ছেন, এটা কি **দস্তুর** মতো অপমান করা নয়?" (মিত্তির বাড়ি, আশাপূর্ণা দেবী, পৃঃ- ৭১)

(১৪) "আমাদের ওপর কী, **জবরদস্ত** শাসন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬৫)

(১৫) "প্রাচ্যের তোরণ হিসেবে আর দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের বিমান বন্দর হিসেবে করাচী তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে।" (বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন, মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৫৩৬)

(১৬) "**বিলকুল** ফাঁক"। (গল্প বলি গল্প শোনো, শিবরাম চক্রবর্তী, পৃঃ- ১৩)

(১৭) "**পাকড়েছি** তোমার চোরকে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৮)

(১৮) "**বেয়াদবির** চূড়ান্ত যাকে বলে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪৭)

(১৯) "দাঁড়াবার ও দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে দুটো পাও মোটেই যথেষ্ট নয়, **মালুম** হয় তখন সহিসরা ধরে বেঁধে খাড়া করায়, কিন্তু যেমনি না ছাড়ে অমনি আমি সটান।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৬)

(২০) "ওঠার কায়দা দেখেই বুঝতে পারি, এককালে ওই বক্স-অভ্যাস **দস্তুরমতই** ছিল ওঁর।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬১)

(২১) "তাদের ঘাড় ভেঙেও খেয়েছি **বিস্তর**।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১০৪)

(২২) "—**বেয়াদপি** করছ বলে।" (মনে রেখো, গৌতম বসু, পৃঃ- ২২)

(২৩) "সাধারণ লোক নিজের শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে জাহির করতে চায়; এটা হল **হামবড়াই** ভাব।" (কথা প্রসঙ্গে শ্রী মহেন্দ্রনাথ, লক্ষ্মীনারয়ণ ঘটক, পৃঃ- ৪৮)

(২৪) "তাই বলি, **হামবড়াই** কোরো না।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৭২)

(২৫) "কিন্তু জিভের ভালবাসা বা **দুনিয়াদারী** দিয়ে নয়।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৮৪)

(২৬) "দারোগা পুলিশ চব্বিশ ঘন্টা **মোতায়েন** সব।" (বিচিত্ররূপিণী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ- ৫)

(২৭) "পাল-কর্তার **মজলিশে** তখন পক্ষিরাজ ঘোড়া আকাশ পথে উড়িয়াছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯)

(২৮) "ওপারের খেয়াঘাটে যাত্রীর দল, **মাল**-বোঝাই গাড়ির সারি, গরু-মহিষের পাল আবার ভিড় করিয়াছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৯)

(২৯) "জাপান-চীন, বিলাত-মার্কিন **মুল্লুক** ঘুরলম।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৪)

(৩০) "সেই মদ ও মাংসের সহিত **মজলিস** চলিতেছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৮)

(৩১) "জিজ্ঞাসা করে—সত্যি, কি **মতলব** বলো তো?" (দাবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পৃঃ- ৫৭)

(৩২) "এত বড় প্রমাণ কেন সে নির্বোধের মত **মজুত** রেখে দিয়েছিল, কেন সে সময় মত এটা নষ্ট করে ফেলেনি, তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলবো, নষ্ট করবার অবসর তাকে দেওয়া হয়নি।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬৫)

(৩৩) "কাজেই **মাল** বিক্রি করে যে টাকা ঘরে আসে, তা নতুন মালে লগ্নী না হয়ে খেয়েই ফুরোতে লাগল।" (অবরোহণ, বনফুল, পৃঃ- ২৩)

(৩৪) "খুঁজছি একটি সাইজ **মাফিক** ইট।" (চতুরঙ্গ, বনফুল, পৃঃ- ২৩)

(৩৫) "আমি হাসিয়া বলিলাম, কি দরকার, **জবরদস্ত** হয়েছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৪)

(৩৬) "পরিচর্যার জন্য দুজন দাসী সর্বদা **মোতায়েন**।" (কত অজানারে, শংকর, পৃঃ- ২৯)

(৩৭) "চোখ আর কান দুটিকে একটু সজাগ রেখো, **দুনিয়ার** অনেক বিচিত্র পদার্থের দেখা পাবে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩৩)

(৩৮) "বে-সরকারী কৌঁসুলীদের এবং কিছু **ওয়াকিবহাল** ব্যক্তির তাগিদে ও চাপে, খোসলা সাহেব এগুলি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে।" (নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য, বরুণ সেনগুপ্ত, পৃঃ- ৩)

(৩৯) "তিরিখা ঃ ব্যাংককে নেতাজী সঙ্গে খুব বেশি **মাল** নিলেন না?" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩১)

(৪০) "উকিলের একটি ভ্রূকুটিতেই পাকা খুঁটি তারা কাঁচিয়ে ফেলত, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হলেও একটি ধমক খেয়েই সব কিছু গোলমাল করে ফেলত তারা— খুনী মামলার আসামীও **বে-কসুর খালাস** পেয়ে যেত।" (মন্ত্রমুখর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ২য় খন্ড, পৃঃ- ১২২)

(৪১) "রোহনপুরের হাটে কিছু **মাল** পৌঁছে দিতে হবে।" (দুঃশাসন, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪৯০)

(৪২) "তোমার মত **বেয়াদব** নচ্ছার মাগিকে ধরে চাবকান উচিৎ।" (বৌ, মানিক গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ- ৪১৯)

(৪৩) "ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুঁজিয়া গোঙ্গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্যন্ত যাদের নাই, **একতরফা** তাদের কাঁহাতক পিটানো যায়?" (অহিংসা, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৭৫)

(৪৪) "গদ্য জিনিষটা জন্মাবধি **কেজো** স্বভাবের; কেননা নিত্য দিনের কাজে কর্মেই শুধু তাকে ব্যবহার করা হয়েছে।" (বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ইন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ- ৮৯)

(৪৫) "দুশমনের মহড়া নিতেই তো তারা **পায়দা** হয়েছে। এটা তার **নোকরি** নয়, কৌমের খেদমত।" (পথে প্রান্তরে, বেদুইন, পৃঃ ১৬)

(৪৬) "আপনার শক্তি মতো **দেদার** খরচ করে।" (মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী (১ম খন্ড), পৃঃ- ৬১৫)

(৪৭) "ইংলন্ডের সাধারণ মানুষ শুধু চিত্রশিল্পেরই **সমঝদার** আর ভক্ত।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৫)

(৪৮) "**দুনিয়ার** হাটে **সওদা** বিকোয় না।" (পথে প্রান্তরে, বেদুইন, পৃঃ- ১৭১)

(৪৯) "ছাত্রদেরও তো **ইজ্জদ**-জ্ঞান আছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৪৬)

(৫০) "দয়া করেই তিনি **বাতলিয়ে** ছিলেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৯)

(৫১) "প্রশ্ন করেই **বেকুফ** বনে গেলুম।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২১)

(খ) অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঃ—

(১) "পীরবক্স ঃ এ **মতলব**-ও আছে নাকি।" (উমরাওজান, মির্জা মহম্মদ রুশোয়া, সুনীলকুমার বসু (অনুবাদ), পৃঃ- ৩৯)

(২) "এটি ছিল সেই বাজার যেখানে রয়েছে আমার **ইজ্জত** বিক্রির দোকান, মানে চক।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩৬)

(৩) "তবু পশু শক্তির **মোকাবিলা** পুশুশক্তি দিয়েই করতে না পারার গ্লানি আছে।" (নাইট ইন লিসবন, এরিখ্ মারিয়া রেমার্ক, সুনীতিচরণ ভট্টাচার্য্য (অনুবাদ), পৃঃ- ৯১)

(৪) "বাইরে ভেঙ্গে দুমড়ে যাওয়া **দুনিয়া** কোন রকমে গড়িয়ে চলেছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১১১)

(৫) "**লড়াই** খতম, নরখাদকটা জখম হয়েছে নিশ্চয়ই।" (রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা, জিম করবেট অমনিবাস (১ম খন্ড), মহাশ্বেতা দেবী (অনুবাদ), পৃঃ- ১৩৫)

(৬) "**হামেশাই** এমন ঘটত।" (জাঙ্গললোর, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩২৩)

(৭) "বিরাট **মতলবটা** হল, একটা ভাল্লুকের চামড়ায় ড্যান্সিকে মুড়ে সেলাই করে দিয়ে মেয়েরা নিয়ে যাবে নৈনিতালের পথে দু-মাইল দূরে, যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ অনেকখানি বেঁকে গেছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩২৫)

(৮) "আট বছর আগে, বাঘিনীটি যখন এখনকার চেয়ে তরুণী, একটি শজারুর সঙ্গে **মোলাকাত**-এ ও ভীষণ ভাবে **জখম** হয়।" (মন্দিরের বাঘ এবং কুমায়ুনের আরো মানুষখেকো, জিম করবেট অমনিবাস (২য় খন্ড), মহাশ্বেতা দেবী (অনুবাদ), পৃঃ- ১৪৫)

(৯) "আপনারা যারা আরাম করে বসে এ কাহিনী পড়ছেন, তাঁরা আমার সে-সময়ের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ **তারিফ** করতে পারবেন বলে আশা করতে পারি না।" (কুমায়ুনের নরখাদক, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৮১)

(১০) "পাথরটির কাছে এসে ও বলল, "যখন আমাদের **দুশমনকে** দেখলাম আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম সাহেব, কিন্তু পাগলামি কেটে গেছে এখন, আর আমাদের মাপ করে দিতে বলছি আপনাকে আর তহশীলদার সাহেবকে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৮৭)

(১১) "আমার আতিথ্যদাতাদের অনুরোধে যখন গমের ফসলের বাকিটুকু কাটা হল, আমি পাহারায় **মোতায়েন** থাকলাম।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২০৭)

(১২) "নিশানা অনুসরণ অসম্ভব, আর বাঘগুলিকে দেখার আমার একমাত্র উপায় হল, ওদের আমার প্রতি আকৃষ্ট করা; অথবা ওদের **হদিস** পেতে আরণ্য প্রাণীদের সাহায্য পাওয়া।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২০৭)

(১৩) "চুপি-চুপি ওটিতে পৌঁছতে পারলে হয়তো বাঘগুলিকে অনায়াসে মারতে পারব, তার **পুরোদস্তুর** সম্ভাবনা আছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২০৯)

(১৪) "যদিও মানুষখেকোটির **তরফ** থেকে কোনো প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা নেই, কেননা বাঘেরা কখনো ওদের দরকারের বেশি মারে না— তবু আমার মনের পেছনে এক অস্বস্তির অনুভূতি থেকেই গেল, বাঘিনীটি ফিরে এসেছে এবং আমার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২১০)

(১৫) "আমার বন্ধুটি রোগা হতে পারে কিন্তু দমে কমতি যায় না ও, আর আমি শক্তপোক্ত হলে কি হয়, ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলাম শুধু দৃশ্যাবলীর **তারিফ** করতে ওকে ঘনঘন থামতে বলে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২২২)

(১৬) "গো-পথের ওপরকার রক্ত বুঝিয়ে দিল ভাল্লুকটি **জবর জখম** হয়েছে, তবু ফাঁকা রাইফেল নিয়ে ওর অনুসরণে বিপদ ছিল কেননা সুসময়েও ভাল্লুকরা বদমেজাজী এবং **জখম** হলে পরে **মুকাবিলা** করতে গেলে এরা অতীব বিপজ্জনক।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২২৩)

(১৭) "গলাগুলি ক্রমে স্পষ্ট হল এবং ওরা যখন একটা **বেয়াড়া** বাঁক ঘুরছে, অচিরে ওদের দেখতে পেলাম।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২২৮)

(১৮) "আমার দ্বিতীয়বার আওয়াজ করার কোনো প্রয়োজন হল না, কারণ আমার লোকজন প্রথম মোষটার **তদ্বির** করে ফেরার পথেই আমার ছোঁড়া দুটো গুলির আওয়াজ পায় আর তারা দৌড়ে কুঁড়ে ঘরে ফিরে হাঁক-ডাক করে যত গ্রামের লোক সংগ্রহ করতে পারে তাদের জড়ো করে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৮৯)

(১৯) "**মজদুরদের** এই বিরাট দলটি যখনই কাজ করত, তখনই তারস্বরে চিৎকার করত সাহস রাখার জন্যে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩৪৩)

(২০) "এখানেই আমি বাঘটার ছাল ছাড়াতাম, কিন্তু গ্রামের লোকেরা আমাকে কাতর অনুরোধ জানাল তা না করতে, কারণ কার্তকানৌলা এবং তার আশে পাশের স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েরা ভয়ানক হতাশ হবে বাঘটাকে চোখে না দেখলে এবং আশ্বস্ত না হলে, যে মানুষখেকোর ভয়ে তারা এত বছর কাটিয়েছে আর যে পুরো জেলাটার ওপর একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব **কায়েম** করেছিল— সে সত্যি সত্যিই মৃত।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৮৯)

(২১) "জঙ্গলটার আয়তন বড় নয় আর এর মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটা হরিণ, যেগুলো মধ্যে মধ্যে ডেকে বাঘের গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের **ওয়াকিবহাল** রাখছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩৩৫)

(গ) শ্লোগানের ক্ষেত্রে ঃ—

(১) "কারোর **বুজরুকি** আমরা মানি না, মানব না।"

(২) "**দুনিয়ার** মজদুর এক হও।"

(৩) "**কায়েমী** স্বার্থ নিপাত যাক্, নিপাত যাক্।"

(৪) "দুর্নীতির সাথে **সমঝৌতা** করি না, করব না।"

(৫) "সরকারের **তরফ** থেকে জবাব চাই।"

(৬) "এ সংগ্রাম **মেহনতের** সংগ্রাম, এ সংগ্রাম জীবনের সংগ্রাম।"

(ঘ) শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঃ—

(১) "এই সব অবস্থা **মোকাবিলার** জন্য সাধারণ মানুষকে বিশেষ স্বার্থ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি।" (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সুশীল রায়, পৃঃ- ৫২৫)

(২) "এই সংকটকালীন অবস্থার **মোকাবিলা** করার জন্য, রাষ্ট্রপ্রধান সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৫)

(৩) "এই কারণে জরুরী অবস্থার **মোকাবিলা** করার জন্য নানা দিক্ থেকে প্রচেষ্টা চালাতে হয়।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৮)

(৪) "অর্থাৎ, **মাল**, অর্থ এবং শ্রম বিনিয়োগ করে, যে সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে তাকেই বলা হয় উৎপাদন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৪৪)

(৫) "কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ বা রাষ্ট্র যে অর্থ বিনিয়োগ করছে, তার থেকে প্রত্যক্ষভাবে সে কোন লাভ বা **মুনাফা** পাচ্ছে না।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৪৫)

(৬) "অন্যদিকে, উৎপাদনের শক্তি বলতে তিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হাতিয়ার, **মাল**, দক্ষতা ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬৭০)

(৭) "দেশব্যাপী মহামারী, অর্থনৈতিক সংকট, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি— সব কিছুই শিক্ষার অগ্রগতির পথে **জবরদস্ত** বাধা সৃষ্টি করেছিল।" (যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা (১ম খন্ড), রণজিৎ ঘোষ, পৃঃ ১৯৬)

(৮) "সেই সঙ্গে বণিক কোম্পানী তাদের বাণিজ্যের স্বার্থের কথা ভুলতে পারে নি, তাই এর পরেই বলা হয়েছে, ইংলন্ডের কারখানায় **মালের** যোগান দেওয়া ও ব্রিটেনি উৎপন্ন পণ্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করা সরকারী শিক্ষানীতির আর একটি উদ্দেশ্য।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩)

(৯) "অনুবাদের মধ্য দিয়েও বিশেষ-বিশেষ ভাবে শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহারের **জবরদস্ত** কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করে।" (বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি, সত্যগোপাল মিশ্র, পৃঃ- ১৬৩)

(১০) "অনেক সময় শ্রুতির অনবধানতা, **দস্তুর** মতন বানান ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৩৬)

(১১) "অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে শুদ্ধ ভাষা-প্রয়োগ **বিলকুল** শিখতে পারে না।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১১৩)

(১২) "শিক্ষাদানের সময় **জবরদস্ত** গুরুত্ব সহকারে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগ-রীতি ও পার্থক্যগুলি অনুধাবন করতে পারি; সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্যের ব্যাকরণগত দিক্ শিক্ষার্থীদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হয় না।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩১)

(ঙ) পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে ঃ—

(১) "গতকালের বৈঠকে এ সবের সঙ্গে রাওকে **ইস্তফা** দেওয়ার কথাও উঠেছিল।" ('আজকাল' দৈনিক পত্রিকা, ১১ই জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ ১)

(২) "পোলভল্ট ইভেন্টে ইউক্রেনের সার্গেই বুবকার অবিসংবাদিত্ব শ্রেষ্ঠত্ব দীর্ঘ প্রায় এক যুগের উপর **কায়েম** রয়েছে।" ('বর্তমান' দৈনিক পত্রিকা, ১০ই জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৮)

(৩) "**বেআদব** বাঁদরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে মেমারি শহরের মানুষ মঙ্গলবার সকালে জি. টি. রোড অবরোধ করলেন।" ('আজকাল' দৈনিক পত্রিকা, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(৪) "তাই সার্কুলার রোডে বন্ধু ভি.পি-র আমলে পাওয়া একতলা বাড়িরও অনেকখানি জমির স্বত্ব, এবারের **নয়া** জমানায় আরও কিছু পেলে বড় সড় কমপ্লেক্সের আকার নিতে পারবে।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(৫) "দিল্লী হাইকোর্টে রাও একই আবেদনে, এই নির্দেশের স্থগিতাদেশ ও **খারিজ** করার আর্জি জানান।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(৬) "রাওয়ের পক্ষে **সওয়াল** করেন প্রখ্যাত আইনজীবী কপিল সিবাল।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(৭) "সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, যেহেতু দুর্ঘটনাই মৃত্যুর কারণ, **নিয়ম মাফিক** ময়নাতদন্ত হবে।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(৮) "তিনি বলেছেন, "বুলগেরিয়ার ফুটবল ফেডারেশন এখন অপদার্থদের **আখড়া**।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৭)

(৯) "কিন্তু তাদের চিহ্নিত করবার আইনি পথে তাদের সাধ্যমত শাস্তি দেওয়ার **এক্তিয়ার** তো তাঁর আছে।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৪)

(১০) "গরীব মানুষরা তো একসময় বেধড়ক মার খেয়েছে **একতরফা**।" (প্রাগুক্ত, ২৪ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৪)

(১১) "এরই মধ্যে মমতা আবার প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত রাওয়ের এ. আই. সি. সি. পদ থেকে **ইস্তফা** চেয়ে বসেছেন।" ('বর্তমান' দৈনিক পত্রিকা, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(১২) "মমতা ইদানিং যেসব মন্তব্য করছেন, সেগুলি **ঠারে-ঠোরে** পি ভি-র বিরুদ্ধেই যায়।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(১৩) "সি আই ডি-র গোয়েন্দাদের বক্তব্য, বরানগরে হরিপদ দে-র গন্ধক-গুদামের সামনে যে লরিটিতে ওই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তাতে যে বিস্ফোরকগুলি **মজুদ** ছিল, তা উইমকো ফ্যাকটরি থেকেই তোলা হয়েছিল।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(১৪) "পাঁচ সদস্যের মধ্যে দুজন, চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ এবং অংশুমান গায়কোয়াডের **মেয়াদ** শেষ হয়ে যাচ্ছে।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(১৫) "রাজ্যের কোথাও তাদের **মোতায়েন** না করে তাদের ব্যারাকে ফেরত পাঠনোই সঙ্গত।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৪)

(১৬) "ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ এই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে, গোরাচাঁদের **বুজরুকি** জনসমক্ষে ফাঁস করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৪)

(১৭) "বাজপেয়ি অবশ্য কোন **ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়** না করেই বলেন, এই তো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৯টি রাজ্যে ৮৪টি লোকসভা আসন রয়েছে।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৫)

(১৮) "আর গোটা অনুষ্ঠানে **মগজের** ব্যবহারও উল্লেখ করার মতো।" (প্রাগুক্ত, ২১ শে জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৮)

(১৯) "ন'জনের মধ্যে পাঁচজন দাগী জঙ্গি হিসেবে পরিচিত, ফলে সামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর **তরফ** থেকে একযোগে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।" ('উত্তরবঙ্গ সংবাদ', ৯ই জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ১)

(২০) "সেই **মোতাবেক** পুলিশ কর্তৃপক্ষ ধনতোলায় এক পুলিশ ক্যাম্পের অনুমোদন দেয়।" (প্রাগুক্ত, ৯ই জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ২)

(২১) "কিন্তু বাস্তবে অবস্থাটা কি, তা **মালুম** হলে অনেকেই বিস্মিত হবেন।" (প্রাগুক্ত, ৯ই জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৪)

(২২) "সব কিছু বুঝতে পারছি অথচ নিজেদের জাগিয়ে তুলতে পারছি না, ফুটবলে মাঠে এই ফ্যাক্টরটার জন্য বহু দল ম্যাচ হেরে যায় **হামেশাই**।" (প্রাগুক্ত, ৯ই জুলাই, ১৯৯৬, পৃঃ- ৫)

(২৩) "শ্রী ব্যানার্জী বোধহয় জানে না, রিজেন্ট পার্কসহ ঐ এলাকায় অন্যান্য যেসব নতুন-নতুন পাড়া তৈরী হয়েছে, তা সব হাল আমলে ইংলিশবাজার পুরসভাতে এলেও, এখনও সেইসব **মহল্লার** বাড়ী ঘরের কোন ট্যাক্স ধার্য হয়নি।" ('মালদার যুগবাহ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃঃ- ১)

(২৪) "আজ যদিও পশ্চিমবঙ্গে তা বন্ধ, কিন্তু ভারতের অন্য রাজ্যে **হামেশা** তা হচ্ছে পয়সা দিয়ে।" (প্রাগুক্ত, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃঃ- ২)

(২৫) "আর তার জন্য যদি রোষে-ক্ষোভে সম্পাদকদের শাস্তি দিবার জন্য বা তাঁদের পরিবারের কোনো ক্ষতি করবার **মতলবে** আইন নিজের হাতে তুলে নেন, তবে তার নতিজাও আপনাকেই ভুগতে হবে।" (প্রাগুক্ত, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃঃ- ৪)

(২৬) "আর এইসব মোটরের কারসাজিতে এবং একশ্রেণী কর্মচারীদের সাহায্য, সহযোগিতা ও আনুকূল্যে ঢালাও বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে ও দুর্নীতির রাজত্ব **কায়েম** রয়েছে।" ('গৌড়কণ্ঠ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃঃ- ২)

(২৭) "এবং আইনগত পরামর্শ দিয়ে ও হাইকোর্টে সেই ব্যবসায়ীর পক্ষে মামলা রুজু করিয়ে, সেই মামলার খসড়া **মোসাবিদা** করে দিয়ে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।" (প্রাগুক্ত, ২৫শে জুন, ১৯৯৬, পৃঃ- ৩)

(২৮) "১৮৫৫ সালে সিধু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল মহাবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এবং ১৯৩০-৩২ সালে মালদহ জেলার হবিবপুর গাজোলের আদিবাসী ও **মেহনতি** মানুষের সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন জিতু, তাকে স্মরণ করেই অনুষ্ঠিত হয় সিধু-কানু-জিতু মেলা।" ('গৌড়ভূমি' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬, পৃঃ ১)

(২৯) "কারণ জেলা কংগ্রেস জানে যে, এই **সমঝোতা** না করলে জেতা যাবে না।" (প্রাগুক্ত, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬, পৃঃ-১)

(৩০) "কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ নেতা নকুল ব্যানার্জী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তির **মোকাবিলায়** সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।" (প্রাগুক্ত, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬, পৃঃ-২)

(৩১) "সভার প্রারম্ভে মালদা এগ্রিকালচার ষ্টেট অ্যাণ্ড সীড ফার্ম **মজদুর** ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুবল দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।" (প্রাগুক্ত, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬, পৃঃ-৩)

(৩২) "এবারের নির্বাচনে জ্যোতিবাবুদের মুখে ভোটভিক্ষার জন্যই 'শিল্পায়নের' **বুজরুকি** শোনা যাবে।" ('বর্তমান' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ-৫২)

(৩৩) "সরল আদিবাসীদের হাতে সামান্য অর্থ গুঁজে দিয়ে ওরা লক্ষ টাকা **মুনাফা** করে।" (প্রাগুক্ত, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ-৩৪)

(৩৪) "অনেক হিম্মতদার প্রাণীও ওদের **সমঝে** চলে জঙ্গলে।" (প্রাগুক্ত, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ-৩৪)

(৩৫) "গোনা শেষ হলে প্রিয়বাবু পুনর্গণনার লিখিত আর্জি, আইন **মোতাবেক** পেশ করলেন।" (প্রাগুক্ত, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃঃ-১২)

(৩৬) "জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রেও যে জ্যোতিবাবুর আজ ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেছে, তাও রাজনীতি বিষয়ে **ওয়াকিবহাল** কারও জানতে বাকি নেই।" (প্রাগুক্ত, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃঃ-১৬)

(৩৭) "বাসুকিতাল এবং চোরাবালিতাল দ্বিতীয় বারের জন্য **মজুদ** থাকে।" (প্রাগুক্ত, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃঃ-৩২)

(৩৮) "এছাড়া সরকারের **এক্তিয়ারধীন** কোনও জায়গায় আমাদের ফাণ্ড তোলার অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয় না।" (প্রাগুক্ত, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃঃ-৩৮)

(৩৯) "সে খুব **জবরদস্ত** লোক।" ('ভ্রমণ' মাসিক পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯৯৩, পৃঃ-১৩)

(৪০) "তারপর সে কী সাংঘাতিক **কসরৎ**।" (প্রাগুক্ত, এপ্রিল, ১৯৯৩, পৃঃ-১৫)

(৪১) "এদিকে শিখ উগ্রপন্থীর **মোকাবিলা** করার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।" ('পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১লা আগস্ট, ১৯৮৪, পৃঃ-১১)

(৪২) "তাই সরাসরি কেউ ভিন্দ্রনওয়ালের **মোকাবিলা** করতে চায় না।" (প্রাগুক্ত, ১লা আগষ্ট, ১৯৮৪, পৃঃ-১২)

(৪৩) "উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে ক্ষেত **মজদুরেরা** গিয়ে পাঞ্জাবের বড় বড় খামারে কাজ করে।" (প্রাগুক্ত, ১লা আগষ্ট, ১৯৮৪, পৃঃ-১২)

(৪৪) "অবশ্য মালদার সঙ্গে দেশের অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের **ফারাকটা** কত, তা কিন্তু বরকত সাহেব কখনই বলছেন না।" (প্রাগুক্ত, ১লা আগষ্ট, ১৯৮৪, পৃঃ-২৪)

(৪৫) "দিল্লি দেখ, বোম্বাই দেখ, কাশী দেখ, মথুরা দেখ—এই বলে তামাম্ ভারত, চাই কি গোটা **দুনিয়া** ঘুরিয়ে আসবে।" ('দূরবীণ' মাসিক পত্রিকা, আগষ্ট, ১৯৯৪, পৃঃ-৫)

(৪৬) "**চোপ্পরদিন** কাজ করত।" (প্রাগুক্ত, আগষ্ট, ১৯৯৪, পৃঃ-১৯)

(৪৭) "ওনারা **মাল** নিয়ে ওনাদের কোচে, আমি **মাল** নিয়ে অন্য কোচে।" ('ভ্রমণসাথী' দ্বিমাসিক পত্রিকা, জানুয়ারী-ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৯৫, পৃঃ-৪৯)

(৪৮) "প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিবেকানন্দ এক **দস্তুর-মাফিক** বিপ্লব সাধন করেন।" ('বসুধারা' দ্বিমাসিক পত্রিকা, শরৎ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-১০)

(৪৯) "কলকাতার কফিহাউসে **আড্ডা** দিতে দিতে হঠাৎ এক একদিন মনে হয়— জীবনটা একঘেয়ে হয়ে আসছে।" ('বর্তমান' পত্রিকা, 'ত্রিপুরায় বারবার', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ-২৩)

(৫০) "যাঁরা তরল পনীয়ের **সমঝদার** তাঁদের জন্য সুখবর, ওখানে কোন সরকারী ট্যাক্স নেই।" ('ভ্রমণ' পত্রিকা, 'নানা ভ্রমণের বৃত্তান্ত', আশাপূর্ণা দেবী, পৃঃ- ৭৪)

ভ্রমণ সাহিত্যের ব্যাপ্তিতে তিনি আজও দোসরহীন। তবে তাঁর ভ্রমণকাহিনীর 'টেকনিক' আধুনিক যুগের কিছু লেখকদের রচনাতেও পাওয়া যায়। বিনয় সরকার বাঙালী পাঠকের কাছে বিশ্বশক্তির রস পরিবেশন করেছিলেন তাঁর 'বর্তমান জগৎ' গ্রন্থের সাহায্যে। তিনি যখন যে দেশ ভ্রমণ করেছেন, সেই দেশকে বস্তু-নিষ্ঠ মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন। নিজের দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে সেই সকল দেশের বিবিধ বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি সাহিত্যসংসারে কোন সাধারণ ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ নয়। প্রবীণ সাহিত্যিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ

প্রণালীতে 'পশ্চিমের যাত্রা', 'দ্বীপময় ভারত', 'ইউরোপ ১৯০৮' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মাধ্যমে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করেছেন। আধুনিক যুগের অনেক লেখকও বিনয় সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। অক্ষয় নন্দীর 'বিলাত ভ্রমণ', মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'বিলেতে সাড়ে সাত-শ দিন', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'আমার দেখা রাশিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোচনার সুবিধার্থে কিছু লেখকের রচনাংশ নেওয়া গেল এখানে—

(ক) ''বড়োদিনের বেশ কদিন আগে ও পরে ইংরেজ ছেলেমেয়েরা পথে-পথে গান গেয়ে বেড়ায়। এ গানকে ইংরেজীতে বলে 'Carol'. এতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ও শিশুদের উৎসাহ বেশী। মেয়েদের কণ্ঠনিঃসৃত এ গানের সুর ভারী অদ্ভুত। এদের গানের সুর— মোহ জাগায়। সকল দেশের নারীকণ্ঠের কাকলীই কি এক? আমাদের দেশের গ্রাম অঞ্চলে বিয়ের কনের হলুদ মাখা উপলক্ষে কনের বাড়ীতে মেয়েরা দল বেঁধে গান গায়। আর ধান ভানীর সময়ে ঢেঁকির উঠানামার তালে-তালে তাদের গলার চিকন সুন্দর তান-লয়ও ওঠানামা করে। আত্মীয়হীন প্রবাসে 'Community Carol'– এর বিচিত্র সুর শুনতে-শুনতে মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের সেই গানের কথা।'' (মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী (১ম খণ্ড), ''বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন'', পৃঃ- ৫৫৩)

(খ) ''এদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা শিক্ষা বৎসরে তিনটে টার্ম। অক্টোবর থেকেই বড়োদিনের বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম টার্ম। জানুয়ারীর প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করে মার্চের শেষ কি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দ্বিতীয় টার্ম। মাঝখানে হপ্তা দুয়েকের অবকাশ। আর তৃতীয় বা শেষ টার্ম এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুন পর্যন্ত। এরপরে জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর দীর্ঘ তিনমাস ধরে গ্রীষ্মের বন্ধ। টার্ম চলতে থাকাকালীন আর কোন ছুটি নেই। একটি দিনের জন্যও নয়। ধর্মের জন্যও নয়, কোনো গৌরবজনক কর্মের জন্যও নয়। এমন কি কারুর মৃত্যুর জন্যও নয়। .....এদের কাছে ব্যক্তি নয়, জাতিই যে বড়— পদে-পদে তার প্রমাণ পাচ্ছি। .....একদিনের জন্য বসে থাকতে গেলেও জাতীয় জীবনের শক্তি ও সাধনার যে কী অপচয় হয়, তার হিসেব করলে শুধু তাদের কেন, আমাদেরও চোখ স্থির হয়ে আসবে। কৃষি প্রধান দেশ আমাদের। হিউমিডিটি ভরা আবহাওয়ায় বসে বসে আমরা ঝিমুতে ভালবাসি। বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতির হিসেব করে জীবনকে যাচাই করে দেখি না। সে দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে জীবনকে গড়েও তুলি না।'' (মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী (১ম খণ্ড), ''বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন'', পৃঃ- ৬২৪-৬২৫)

(গ) ''দিগন্তবিস্তীর্ণ উষর স্তেপভূমি হাজার বছর ধরে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল, বার্চ, পাইন ও ওকের অরণ্যবলয় তৈরী করে, তীব্র শুষ্ক বায়ুরোধ করে, সেচ ব্যবস্থায় ক্রমে স্তেপভূমি শস্যশালিনী হয়ে উঠছে। অনুর্বর প্রান্তরকে জয় করার সংগ্রাম চলেছে, প্রধান হাতিয়ার, ওক-গাছের চারাগুলি সবল হয়ে উঠছে। এক একটি অরণ্যবলয় তৈরী হবে, আর শস্যক্ষেত্র এগিয়ে যাবে। উঁচু রাই ক্ষেতে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগলো এরা পারছে, কেন না রাষ্ট্র মাত্র ত্রিশ বছরে আদিম যুগের কৃষি ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের যন্ত্রযুগে এনে ফেলেছে। আর আমাদের দেশের কৃষকের এখনো শ্রীরামচন্দ্রের বা অশোকের যুগের লাঙ্গল বলদ ও দৈবের দয়ায় বৃষ্টিই ভরসা। বিদেশ থেকে আমরা অন্ন কিনি, অন্নসৃষ্টির যন্ত্র কিনিনা।'' (''আমার দেখা রাশিয়া,'' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃঃ- ৫৮)

(ঘ) ''বহু দূর থেকেই মানুষ আসে লাসাতে। তীর্থভ্রমণ ও কেনাবেচা সব কাজই একসঙ্গে সমাধা হয়। পশমের বোঝা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে বাজারে বেচতে আসে দেহাতী মানুষ। বিক্রয়লব্ধ অর্থে কাঁচা বাজার সেরে নস্যির দোকানে। রাস্তার জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণনা। মণিধ্বজার কাপড়ের টুকরো কেনা চাই। প্রচুর মাখন, চা— দিনের শেষে ছঙ গিলে বাড়ি ফেরা। এরা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। ছঙ খাওয়াটুকু বাদ দিলে রাখাল আড্ডি লেনের রসময়বাবুর জগুবাবুর বাজারে সওদা সারার সঙ্গে তুলনা করা চলে। .....ন্যু মার্কেটে স্টাইল আছে কিন্তু এ বাজারে আছে গ্র্যানজার। নকল মুক্তোর জায়গায় আসল মহার্ঘ চুনি, পান্নার ক্রেতার অভাব নেই এখানে। .....অপর্যাপ্ত অর্থ ও প্রচুর বিত্তের অধিকারীদের যথেষ্ট খরচ করবার রাস্তা এখানে সীমিত। সিনেমা হল নেই। মোটর দৌড় বা ঘোড়দৌড় এখানে অজ্ঞাত। স্কেণ্ডিনেভিয়ান ব্যালেরিনার পেছনে অজস্র অর্থ ঢালবার কোন সুযোগ নেই এখানে। তাই ক্ষমতাবান মানুষ ঘর সাজাতে শুরু করেছেন।'' (''নিষিদ্ধ দেশের ঘুম ভাঙ্গছে'', সৌরীন সেন, পৃঃ- ২৪-২৫)

(ঙ) ''দ্বীপটার সরকারি নাম 'ইসলা দা পাসকুয়া' বটে, কিন্তু দ্বীপবাসিরা পুরনো নামটাই ব্যবহার করে 'রাপানুই'। দ্বীপটার আয়তন মাত্র সাতচল্লিশ বর্গমাইল..... দ্বীপের একমাত্র শহর রাজধানী এবং লোকালয়ের নাম হাঙ্গারোয়া। হাঙ্গারোয়ায় লোকসংখ্যা মাত্র দেড় হাজার। ছেলেবুড়ো সব মিলিয়ে। .....দ্বীপে চাষবাস মোটেই সুবিধাজনক নয়। তা

সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে এখানকার মানুষরা চেষ্টা করছে কিছু-কিছু ফসল ফলাবার। মিষ্টি আলু খুব ভাল হয়, আর কিছু-কিছু কলাগাছও আছে, আর সাগরের ধারে বদ্ধ জলে প্রায়ই চোখে পড়ে পাটজাতীয় চাষ। তা থেকে দড়ি হয় আর মোটা কাপড়ও হয়।" ("সুদূরের পিয়াসী" (৬ষ্ঠ খণ্ড), বিমল দে, পৃঃ- ৬৫)

(চ) "মস্ত বড় বেলুচ দেশ আর ছোট্ট তার জনসংখ্যা—তারই আবার চার-পাঁচটা ভাগ। লক্ষণীয় সেখানকার শাসনব্যবস্থা, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে যেমন কালাতের আমীর-ও শাসন করেন, তেমনি করেন ইংরেজ পুঙ্গবরা, বেলুচরাও তাই গোঁ ধরে ছোটে ঢাল তলোয়ার উঁচিয়ে। তখন নরহত্যা আর পশুহত্যায় পার্থক্য থাকে খুবই কম। কিন্তু দারিদ্র্য আর জঙ্গী শাসন এদের চিত করে দেয় নিমেষেই। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর গোঁড়ামি এদের শত্রু।" ("পথে প্রান্তরে", বেদুইন, পৃঃ- ১৫)।

উদ্ধৃত রচনাংশগুলি বিশেষতঃ ভ্রমণ কাহিনীর অন্তর্গত। 'ক' এবং 'খ' রচনাংশটিতে যথাক্রমে লণ্ডনের সংস্কৃতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে কৃষিব্যবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। নিজের দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনাও লেখক করেছেন। 'গ' অংশে রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থার উন্নতির কথা আলোচিত হয়েছে। 'ঘ' অংশে লাসার সামাজিক ব্যবস্থা, 'ঙ' অংশে হাঙ্গারোয়ার কৃষিব্যবস্থা, 'চ' অংশে বেলুচিস্থানের শাসনব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত আলোচনাগুলিই তথ্য-নিষ্ঠ এবং যুক্তি-নিষ্ঠ। 'ঙ' এবং 'চ' অংশের লেখকগণ ছাড়া সব লেখকই নিজের দেশের সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন বহু বছর আগে বিনয় সরকার।

তাঁর ব্যবহৃত অপরিচিত শব্দগুলি যেমন আধুনিক যুগের লেখকগণ সাদরে গ্রহণ করেছেন, তেমনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীর কিছু 'টেকনিক'ও আজকের রচনায় পাওয়া যায়।

বাংলা গদ্যভাষার বাণীরূপ বাকশৈলী দ্বিবিধ— একটা হল পুরাচলিত 'সাধুরীতি', আর একটা হল 'চলিতরীতি'। বিনয় সরকারের অনন্য বৈশিষ্ট্য তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি সাহিত্যের দুই রীতিরই অনুসরণ করেছেন। সাধু ও চলিত— দুই রীতির ভাষাকাঠামোই বাগভঙ্গিভিত্তিক। কারণ দেখা গেছে যে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের সৃষ্ট সাধুভাষাতেই সেই যুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথা বলতেন। আবার বীরবল প্রতিষ্ঠিত চলিত ভাষায়— কৃষ্ণনগরের বাসিন্দারা মনের ভাব প্রকাশ করতেন। এই দুই রীতির লেখ্যভাষায় তফাত কেবল শব্দপ্রয়োগে। সাধুভাষায় যেমন তৎসম শব্দের আধিক্য, তেমনি চলিত ভাষায় তদ্ভব ও অন্যান্য শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশী। বিনয় সরকারের রচনার সিংহভাগ সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু 'বর্তমান জগৎ' -এর গ্রন্থাবলী সাধুভাষায় লেখা হলেও এর মধ্যে কথ্য-চালটি রক্ষিত হয়েছে।

কলকাতার বনেদি পাড়ার মুখের ভাষাকে প্রথম সার্থকতায় লিপিবদ্ধ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। কিন্তু স্ল্যাং-এর আতিশয্য তাঁর সাহিত্যের সুষমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বীরবলী ভাষায় রয়েছে শব্দের বঙ্কিমভঙ্গী। কিন্তু আচার্য সরকার তাঁর ভাষাকে সাহিত্যিক লালিত্যে মন্ডিত করেছেন। সহজ সরল করে সর্বজনবোধগম্য করেছেন। তাঁর গদ্য 'কথ্য ও লেখ্য' ভাষার ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলেনি। বর্তমান গদ্যচিন্তার আসরে তাই ভাববার কথা, তিনি যে সাহিত্যিক কথ্যভাষা গড়ে তুলেছিলেন— তা অন্য কোন লেখকের প্রভাবের ফল নয়। এই "বিনয় সরকারী" গদ্যভাষা, বিশেষতঃ চলিত গদ্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় অবদান।

—ঃ উৎস নির্দেশ ঃ—

১. Tryon Edwards. The New Dictionary of Thoughts. 1966. P-294.

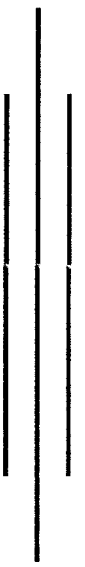
২. Ibid. p-230.

৩. আচার্য বিনয়কুমার সরকার, ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৮, পৃঃ- সম্পাদকীয় মন্তব্য।

— ঃ —

* * * * *

গ্রন্থপঞ্জি



সহায়ক বাংলা এবং ইংরাজী গ্রন্থ-তালিকা

গ্রন্থপঞ্জী

(ক) বাংলা গ্রন্থ

(১) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৩ (বাং)।

(২) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা বানানের নিয়ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।

(৩) ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, ১৯৬৮।

(৪) ডঃ অরুণকুমার বসু (সম্পাদিত)—বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, ১৯৮৭।

(৫) ডঃ অধীর দে—আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, ১৯৬২।

(৬) অমরেন্দ্র গণাই—বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, ১৯৭২।

(৭) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড), ১৯৭২।

(৮) কবিশেখর কালিদাস রায়—শাব্দিক, ১৩৯৮ (বাং)।

(৯) কালিদাস মুখোপাধ্যায়—বিনয় সরকার, ১৯৫১।

(১০) কৃষ্ণপদ গোস্বামী—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ১৯৬৬।

(১১) গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড), ১৩৬৫ (বাং)।

(১২) ত্রিপুরাশংকর সেন—সোনার বাংলা, ১৯৪৯।

(১৩) দেব সেনাপতি—অর্থ জানো, ১৯৯১।

(১৪) দেবপ্রসাদ ঘোষ—বাঙ্গালা ভাষা ও বানান, ১৩৪৬ (বাং)।

(১৫) নীহাররঞ্জন রায় (সম্পাদিত)—বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, সমতট প্রকাশনী।

(১৬) ডঃ নবেন্দু সেন—বাংলা গদ্য ষ্টাইলিস্টিকস্, ১৯৮৮।

(১৭) ডঃ নবেন্দু সেন—গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭১।

(১৮) ডঃ নির্মল দাশ—ভাষা পরিচ্ছেদ, ১৯৯৫।

(১৯) ডঃ নির্মল দাশ—বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, ১৯৮৭।

(২০) নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ১৯৮৩।

(২১) নারায়ণ চৌধুরী—বাংলার সংস্কৃতি, ১৯৫৬।

(২২) নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—স্মরণীয় সান্নিধ্যে।

(২৩) ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত)—আচার্য বিনয় কুমার সরকার, ১৯৮৮।

(২৪) পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, ১৩৯৮ (বাং)।

(২৫) প্রমথনাথ পাল—মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার, ১৩৭৮ (বাং)।

(২৬) প্রমথনাথ পাল—পঞ্চাশ বৎসর, ১৯৫৭।

(২৭) পবিত্র সরকার—গদ্যরীতি পদ্যরীতি, ১৯৮৫।

(২৮) প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত—বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১৯৬০।

(২৯) ডঃ পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য—বাংলা বাগধারা ও তার ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, ১৯৯৫।

(৩০) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—বাগর্থ, ১৯৬৫।

(৩১) বিনয় সরকারের বাংলা রচনাবলী।

(৩২) বিনয় সরকার স্মৃতিরক্ষা কমিটি—বিনয় স্মৃতি তর্পণ।

(৩৩) বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৩৭১ (বাং)।

(৩৪) ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১৩৬১ (বাং)।

(৩৫) মহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪।

(৩৬) মহম্মদ আবদুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ১৯৬৪।

(৩৭) মুরারিমোহন সেন—ভাষার ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৯৯১।

(৩৮) মন্মোহন ঘোষ—বাংলা গদ্যের চারযুগ, ১৯৪২।

(৩৯) রামমোহন রচনাবলী, ১৯৭৩।

(৪০) শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ১৯৬০।

(৪১) শুদ্ধসত্ত্ব বসু—বাংলা ভাষার ভূমিকা, ১৩৭২ (বাং)।

(৪২) শ্যামাপদ চক্রবর্তী—উচ্চতর সরল বাংলা ব্যাকরণ, ১৩৬৪ (বাং)।

(৪৩) ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, ১৩৯৪ (বাং)।

(৪৪) সজনীকান্ত দাস—বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৬৯ (বাং)।

(৪৫) ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ১৩৭৩ (বাং)।

(৪৬) ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৩৭০ (বাং)।

(৪৭) ডঃ সুকুমার সেন—ছাপা বাংলা যতি চিহ্ন, বিশ্বভারতী প্রকাশনী।

(৪৮) ডঃ সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪।

(৪৯) সনৎকুমার মিত্র ও আশিস কুমার দে—লোকভাষা, ১৯৯৩।

(৫০) সবিতা চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, ১৯৭২।

(৫১) হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ব্যাকরণ ও চর্চা, ১৯৭৪।

(৫২) হরিদাস মুখোপাধ্যায়—ইতিহাস চর্চ্চায় বিনয় সরকার, ১৯৫৮।

(৫৩) হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল—বিনয় সরকারের বৈঠকে (১ম খণ্ড, ১৯৪২) এবং (২য় খণ্ড, ১৯৪৫)।

(৫৪) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৯৮৮।

(৫৫) রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯৯৩।

(৫৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী প্রকাশনী।

(৫৭) ডঃ রামেশ্বর শ'—সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খন্ড), ১৯৮৮।

(খ) ইংরাজী গ্রন্থ

(1) A. E. Darbyshire—A Grammar of Style. Andre Deutsch Publication. London. 1971.

(2) A. F. Scott—Meaning by Style. London. 1957.

(3) Alan Warber—A short guide to English Style. London. 1961.

(4) Amalkumar Mukherjee—The Bengali Intellectual Tradition from Rammohun Roy to Dhirendranath Sen. K. P. Bagchi Publication & Co. Calcutta. 1979.

(5) A. Q. Morton—Graphs to detect Identity of Classical Authors. 1965.

(6) Bhakti Prasad Mallick—Language of the Underworld of West Bengal. Calcutta. 1972.

(7) Baneswar Dass—The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar. Chuckervertty-Chatterjee & Co Publication. Calcutta. 1940.

(8) Dr. Bholanath Banerjee—The Political Ideas of Benoy Sarkar. Calcutta. 1984.

(9) C. L. Barber—The Story of Language. London. 1965.

(10) Charles Hockett—A Course of Modern Linguistics. New York. 1948.

(11) C. H. Lockitt (Ed)—The Art and The Essayist. 1954.

(12) Chamber's Twenteeth Century Dictionary. New Edition with Suppliment. 1959.

(13) Donald C. Freeman—Linguistics and Literary Style. New York. 1970.

(14) Dinesh Sen—Bengali Prose Style. 1921.

(15) E. H. Lenneberg—New Direction in the Study of Language. U S A. 1964.

(16) F. L. Lucas—The Harmony of Prose : Style. 1964.

(17) F. H. Pritchard (Ed)—Great Essays of all Nations. 1929.

(18) Graham Hough—Style and Stylistics. Routledge and Kegan Paul Press. London. 1969.

(19) George Lakoff—Irregularity in Syntax. New york.

(20) G. W. Turner—Stylistics. Penguin. London. 1973.

(21) H. A. Gleason—Descriptive Linguistics. New York. 1965.

(22) H. Lebedef—A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects. Calcutta. 1963.

(23) Herbert Read—English Prose Style. Beacon Press. London. 1963.

(24) Haridas Mukherjee—Benoykumar Sarkar : A Study. Shiksha Tirtha Karyalaya. Calcutta. 1953.

(25) I. J. S. Taraporewala—Elements of The Science of Language. Calcutta University Press. 1955.

(26) Ida Sarkar—My Life with Prof. Benoykumar Sarkar. Prabhat Karyalaya. Calcutta. 1953.

(27) J. Middleton Murry—The Problem of Style. 1922.

(28) John Lyons—New Horizons in Linguistics. Penguin. London. 1975.

(29) J. V. Cunnigham (Ed)—The Problem of Style. Fawcett Publication. 1966.

(30) Jennifer Seidl and W. Mc Mordie—English Idioms. Oxford University Press. 1989.

(31) Leo Spitzer—Linguistics and Literary History. Princeton University Press. New Jersey. 1976.

(32) Leonard Bloomfield—Language. Indian Edition. 1963.

(33) Marder—The Craft of Technical Writing. U S A. 1960.

(34) M. A. K. Halliday—System and Fuction in Language. Oxford. London. 1976.

(35) M. A. K. Halliday—Explorations in The Functions of Language. Edward Arnold Press. London. 1973.

(36) M. A. K. Halliday—Language as Social Semiotic. Edward Arnold Press. London. 1978.

(37) Nagendranath Chaudhury—Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology and Economics. Chuckervertty-Chatterjee & Co. Calcutta. 1940.

(38) Nils Erik Enkvist—Linguistics and Style. Oxford University Press. London. 1964.

(39) Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax. M. I. T Press. 1994.

(40) Otto Jespersen—The Philosophy of Grammar. London.

(41) Pankajkumar Mukherjee—The Economic Services of Zamindars to the Peasnts and the Public as analysed by Prof. Benoy Sarkar. Calcutta.

(42) Paul L. Gravin (Translated)—A Prague School Reader on Esthetics. Literary Structure and Style. Georgetown University Press. Washington D. C., 1964.

(43) Raymond Chapman—Linguistics and Literature. Edward Arnold press. London. 1973.

(44) R. A. Sayce—Style in French Prose. London. 1953.

(45) R. James Bennet (Ed)—Prose Style. Chandler Publishing Company. San Francisco. 1971.

(46) Shibchandra Dutta—Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought, Sarkarism in Economics, Calcutta, 1939.

(47) Stephen Ullmann—Language and Style, Oxford University Press, London, 1964.

(48) Stephen Ullmann—Style in French Novel, London, 1957.

(49) S. K. De—Bengali Literature in the 19th Century, 1919.

(50) Sisirkumar Das—Early Bengali Prose, Bookland Pvt. Ltd. Press, 1966.

(51) Shibchandra Dutta—Fundamental Problems and Leading Ideas in the Works of Prof. Benoy Kumar Sarkar, Calcutta, 1932.

(52) Dr. Sunitikumar Chatterjee—Origin and Development of Bengali Language, Rupa and Co. Publication, 1970.

(53) Dr. S. K. Bhattacharya—Indian Sociology : The Role of Benoykumar Sarkar, 1990.

(54) Seymour Chatman—Literary Style, Oxford University Press, London, 1971.

(55) Prof. Subodh Ghosal—Sarkarism/The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Men and His Conquests, Chuckervertty-Chatterjee & Co. Ltd, Calcutta, 1939

(56) S. K. Das—Spoken and Written Bengali : An Instance of Diglossia.

(57) Thomas A. Sebeok—Style in Language, M. I. T. Press, 1960.

(58) The Random House Dictionary (colleged Ed), Indian Publication, Allied Publishers Pvt. Ltd., 1972.

(59) Tryon Edwards—The New Dictionary of Thoughts 1966.

(60) U. Weinreich—Languages in Contact, New york, 1953.

(61) V. Fried (Ed)—The Prague School of Linguistics and Language Teaching, Oxford University Press, London, 1972.

(62) Warburg—Some Aspects of Style in Linguistics, London, 1964.

(63) W. J. Entwistle—Aspects of Language.

(64) Webster Comprehensive Dictionary, International Edition, Volume-2, 1977.

(65) William Hawley Davis—English Essayist, 1916.

(66) Walker Hugh—The English Essay and Essayists, 1915.

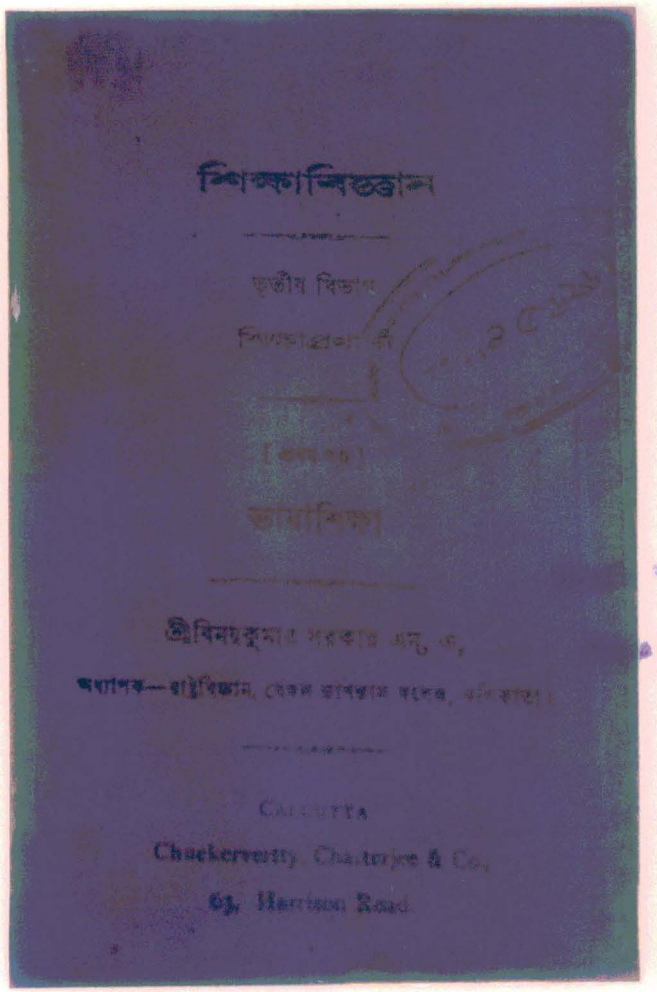
— ঃ —

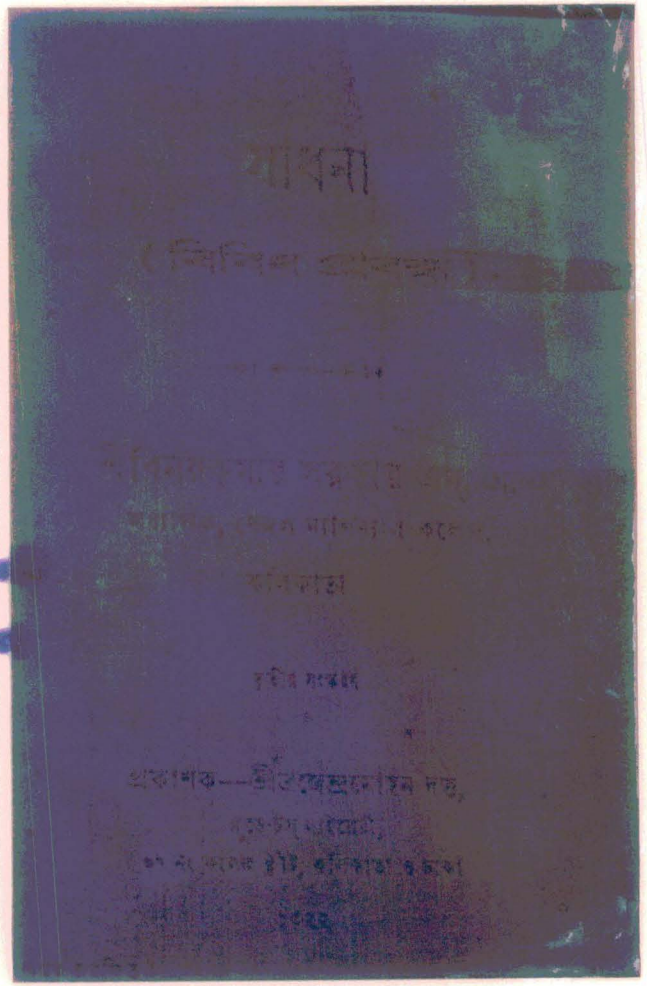
* * * * *

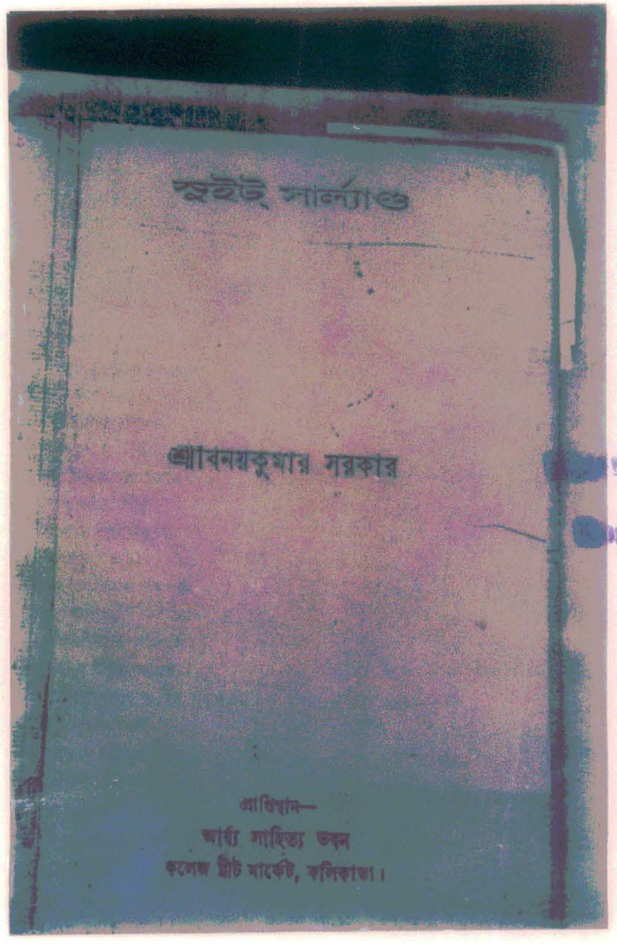
সংযোজন

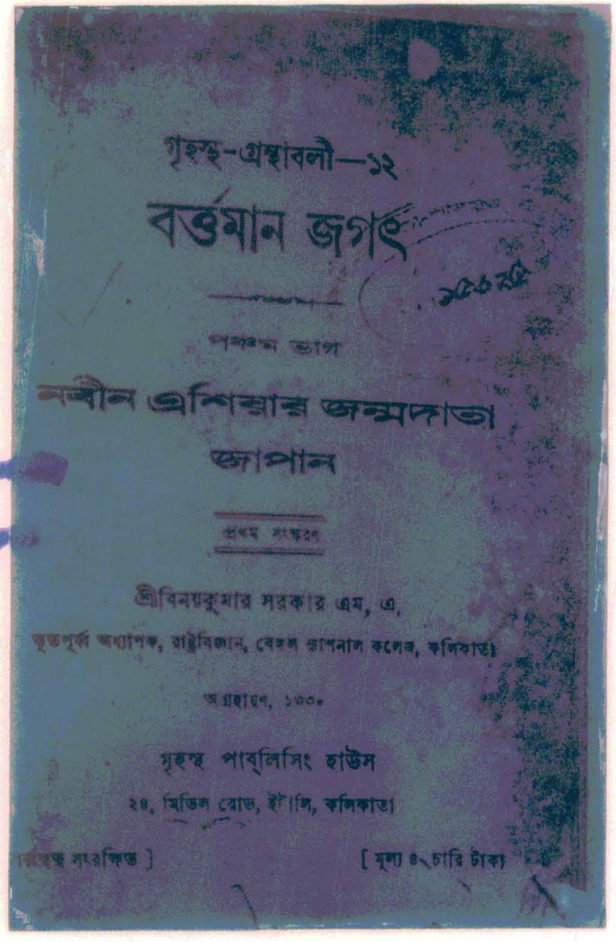


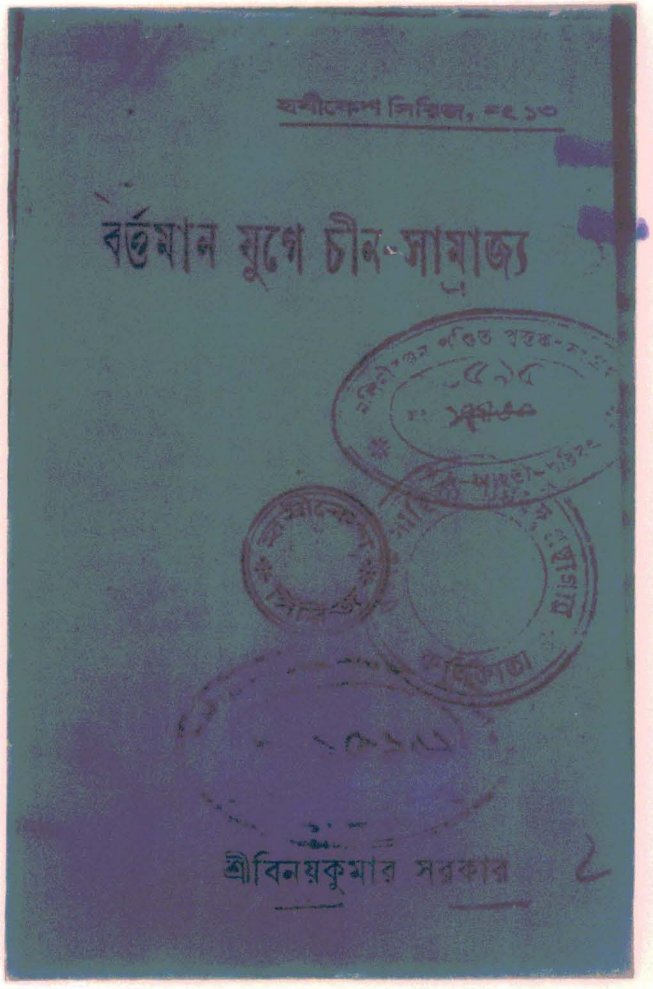
কতিপয় অধুনা দুষ্প্রাপ্য বিনয় সরকারের গ্রন্থের 'টাইটেল' পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

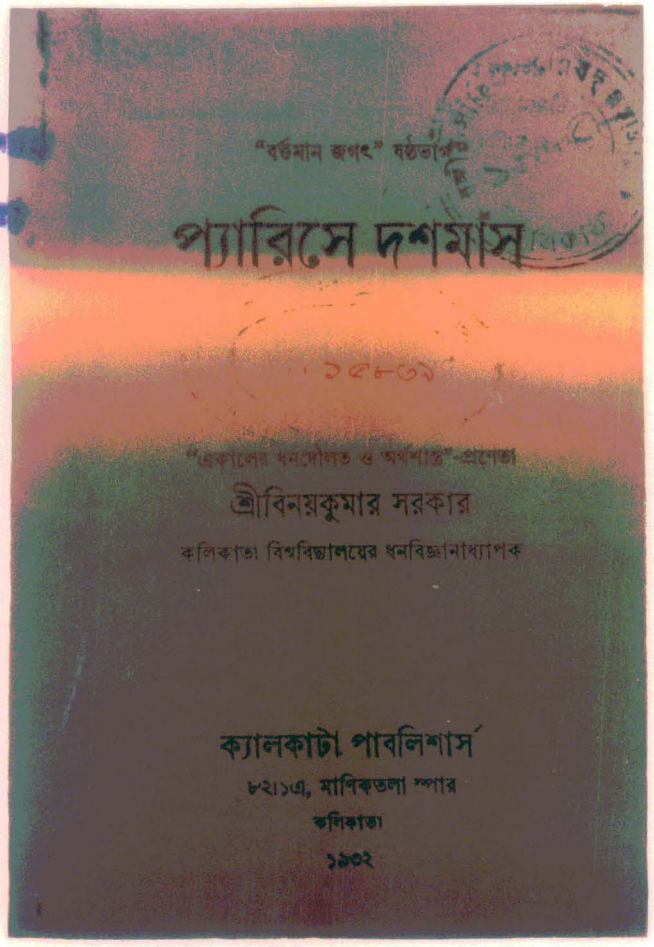

শিক্ষাবিজ্ঞান
তৃতীয় বিভাগ
ভাষাশিক্ষা
Calcutta
Chuckerverty, Chatterjee & Co.
65, Harrison Road

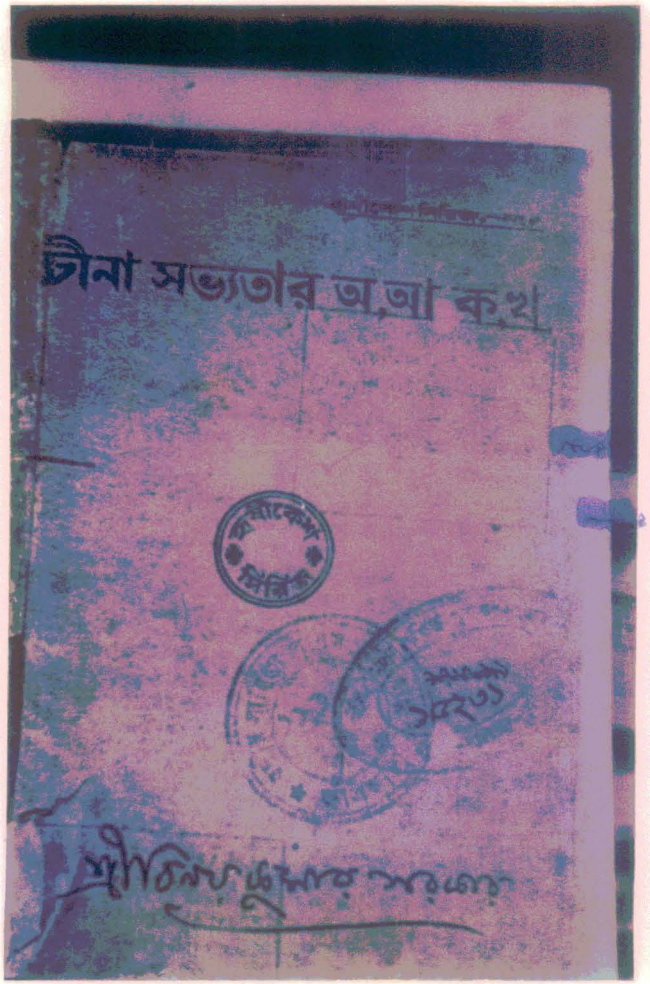

ভাষণী

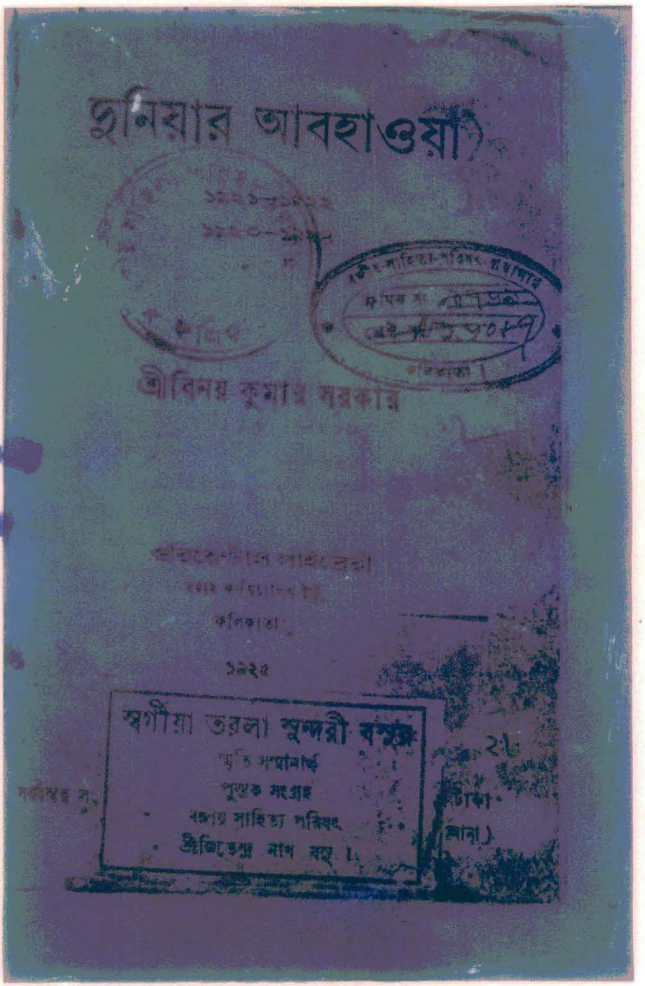

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
প্রাপ্তিস্থান—
আর্য্য সাহিত্য ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

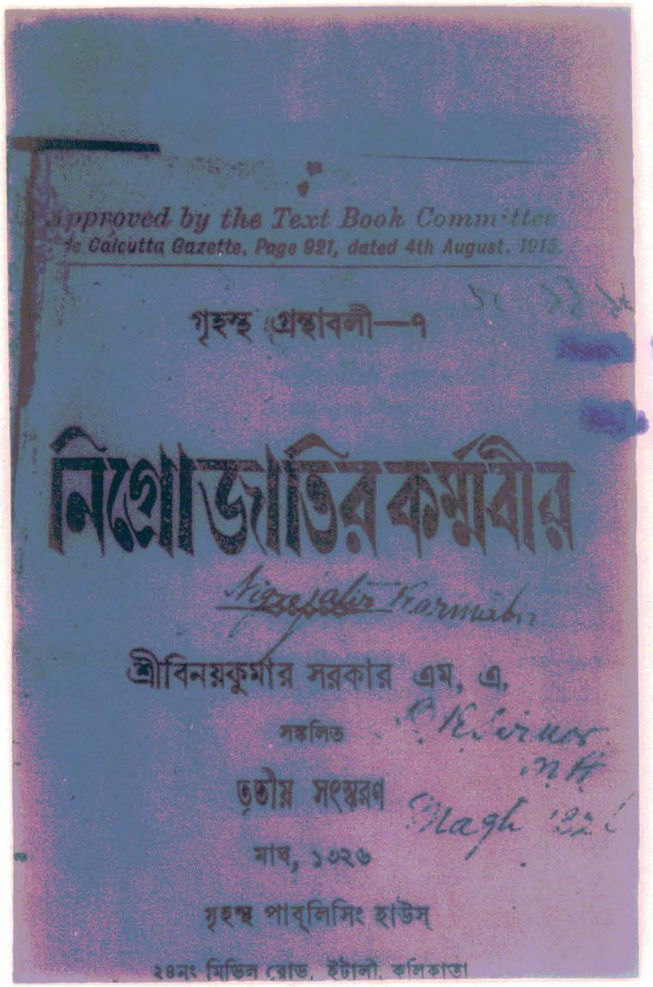

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—১২
বর্ত্তমান জগৎ
পঞ্চম ভাগ
নবীন এশিয়ার জন্মদাতা
জাপান
প্রথম সংস্করণ
শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ,
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা।
অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস
২৪, মিডিল রোড, ইঁটালি, কলিকাতা
[মূল্য ৸৹চারি টাকা


হৃষীকেশ সিরিজ, নং ১৩
বর্ত্তমান যুগে চীন-সাম্রাজ্য
শ্রীবিনয়কুমার সরকার

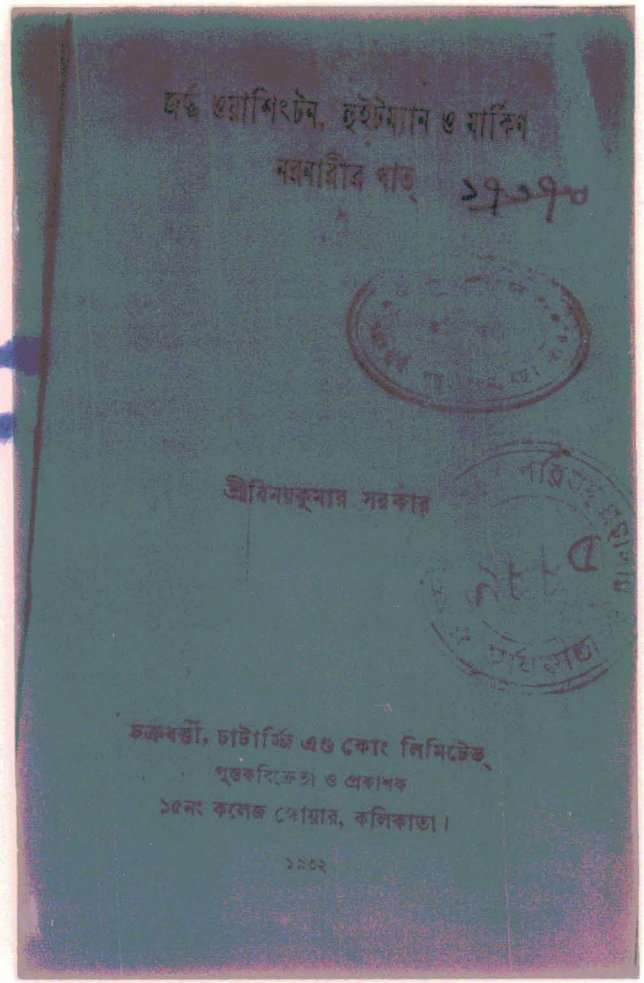

"বর্ত্তমান জগৎ" ষষ্ঠভাগ
প্যারিসে দশমাস
"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"-প্রণেতা
শ্রীবিনয়কুমার সরকার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
৮২।১এ, মাণিকতলা স্পার
কলিকাতা
১৯০২

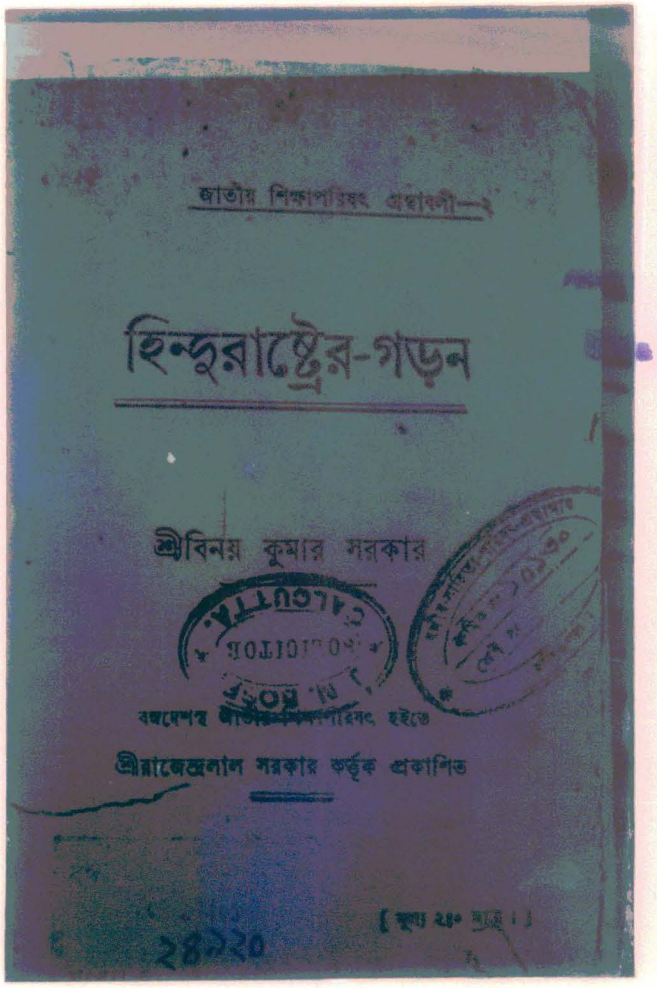

চীনা সভ্যতার অ,আ ক,খ

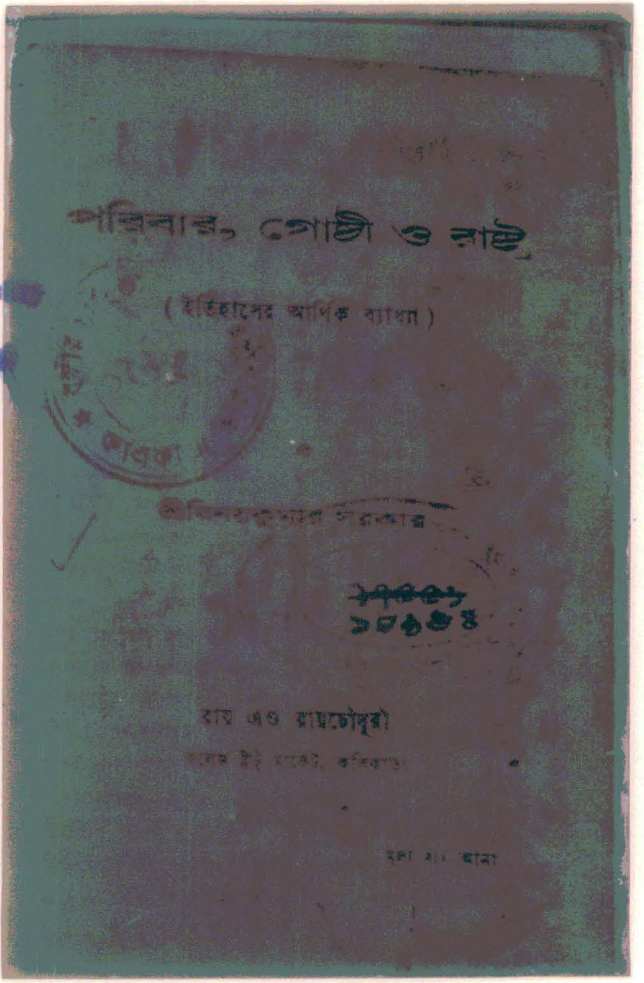

দুনিয়ার আবহাওয়া
শ্রীবিনয় কুমার সরকার
স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর
স্মৃতি সম্মানার্থে
পুস্তক সংগ্রহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু।

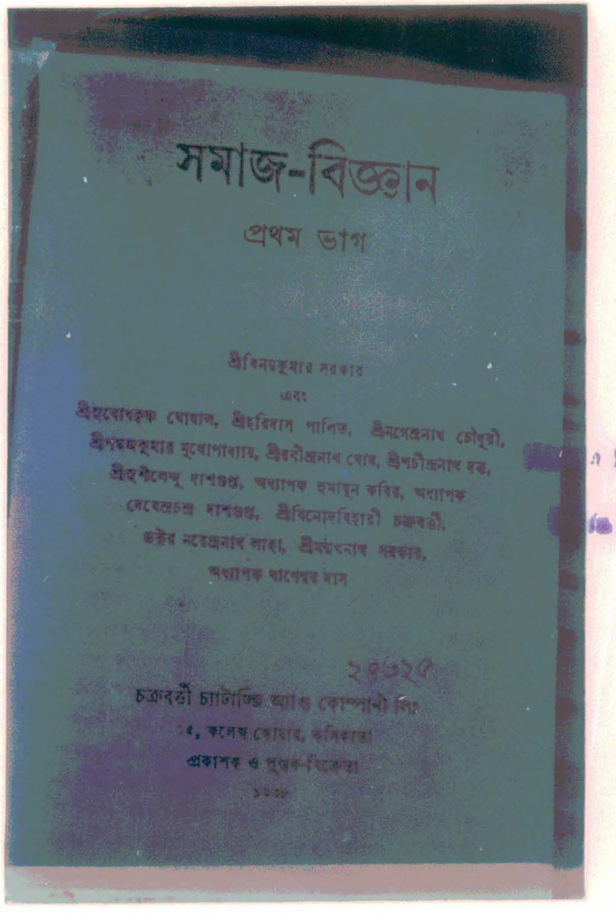


Bengal
Library

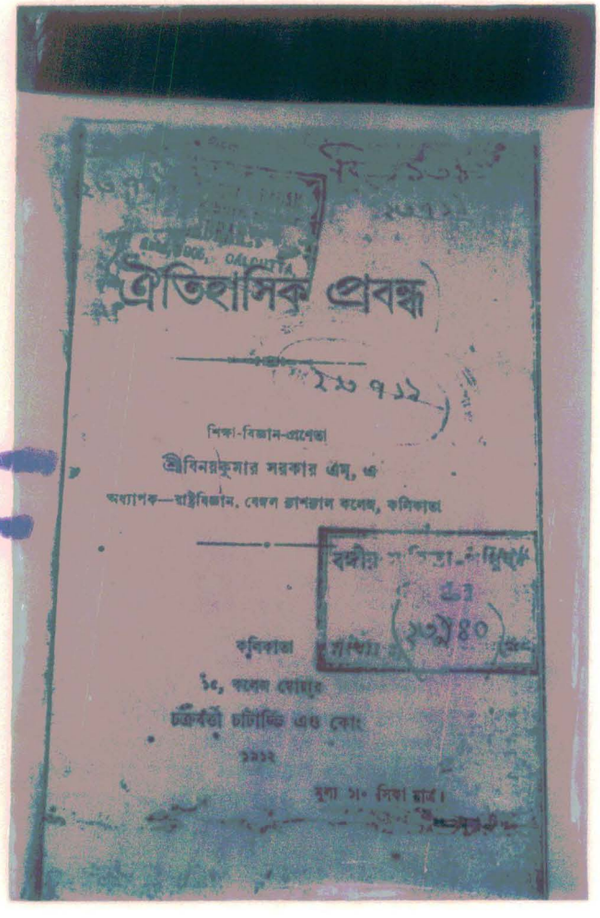


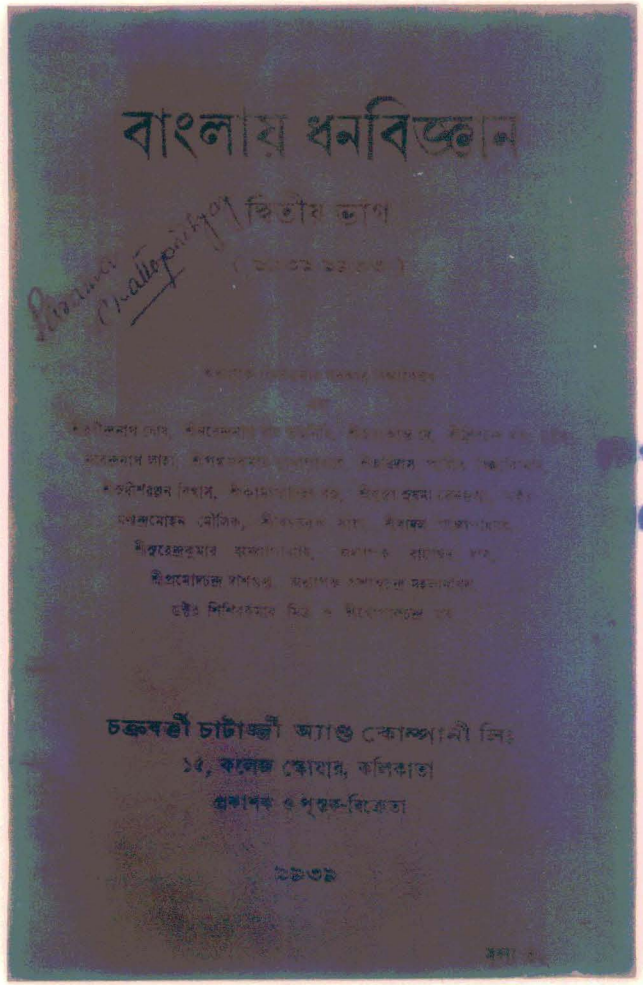

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গ্রন্থাবলী—২
হিন্দুরাষ্ট্রের-গড়ন
শ্রীবিনয় কুমার সরকার
বঙ্গদেশর জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
[মূল্য ২৷৷০ আড়াই]

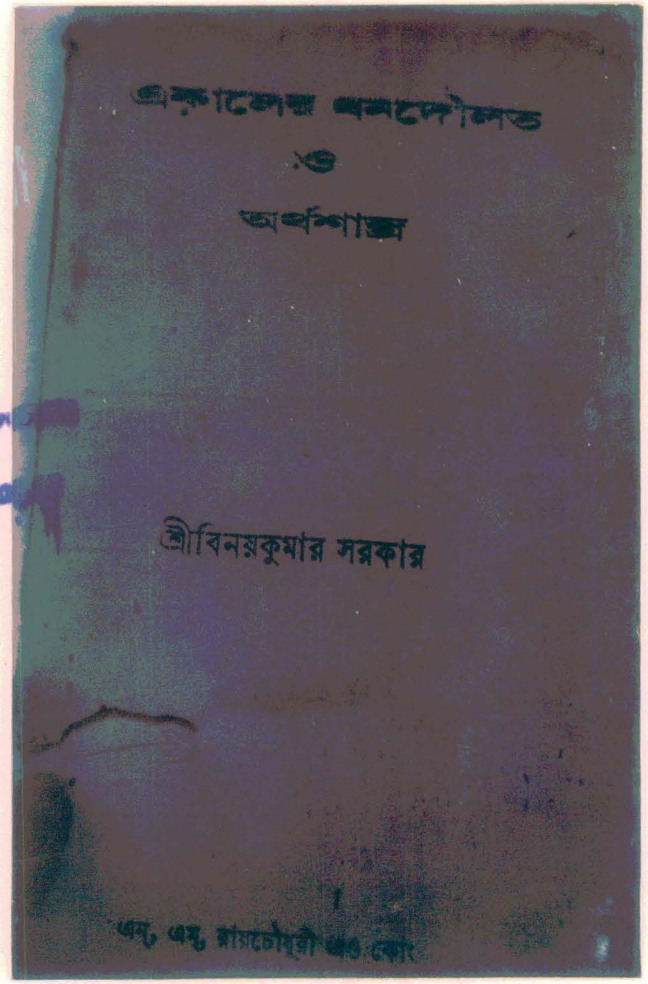

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র
(ইতিহাসের আদিক ব্যাখ্যা)
শ্রীবিনয়কুমার সরকার
রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

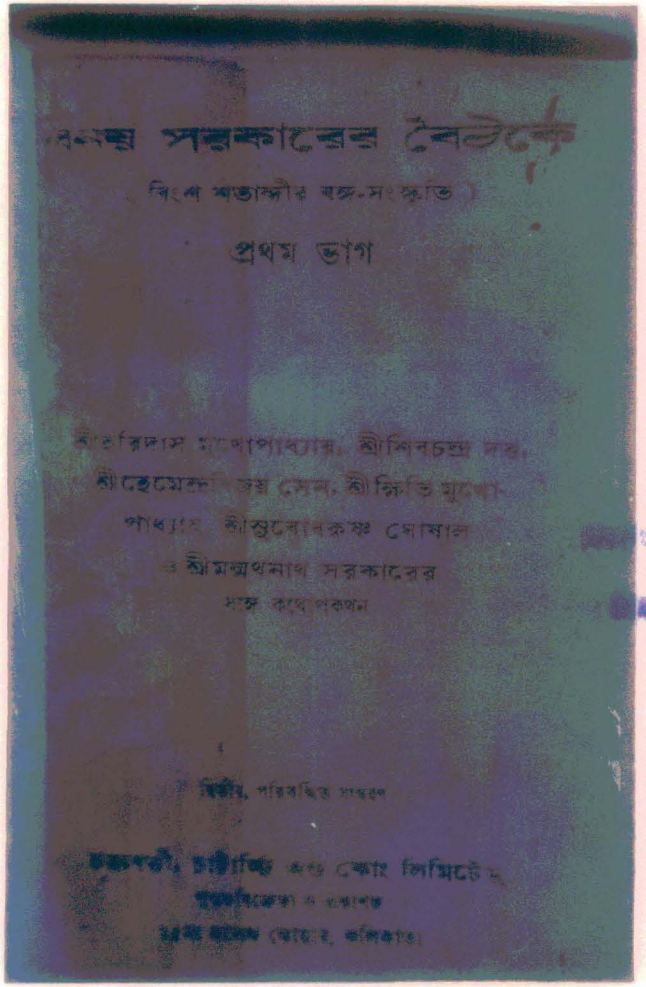


Bengal Library
Ramananda




বাংলায় ধনবিজ্ঞান
দ্বিতীয় ভাগ
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
১৯৩৯


একালের অর্থনীতি
ও
অর্থশাস্ত্র
শ্রীবিনয়কুমার সরকার
এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং



Bengal Vidyo
Library
Raja Rammohanpur

